

কিশোর প্রিলার



তিন গোয়েন্দা
ডলিউম ৫২
রকিব হাসান

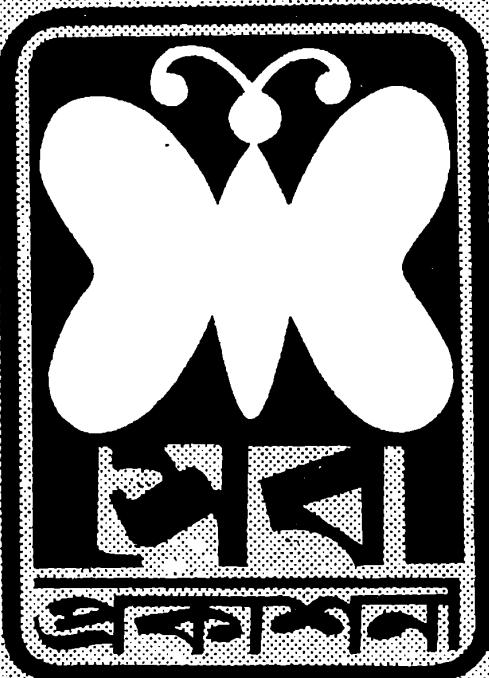
ভলিউম-৫২

তিন গোয়েন্দা

রফিব হাসান



সেবা প্রকাশনী



তেজিশ টাকা

ISBN 984-16-1484-7

একাশক

বাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেন্টেন্স গাঁচা, ঢাকা ১০০০

সর্বমতু একাশকের

২৪ম একাশ ২০০৩

প্রচলন পরিকল্পনা: বনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুক্তি কর্ম

বাজী আনোয়ার হোসেন

সেন্টেন্স গাঁচা প্রেস

২৪/৪ সেন্টেন্স গাঁচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেন্টেন্স গাঁচা, ঢাকা ১০০০

ফোন: ৮৩১ ৪১৮৪

জি.পি.ও.বি: ৮৫০

E-mail: Sebaprok@citechco.net

Web Site: www.ancbooks.com

একাশ পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ সেন্টেন্স গাঁচা, ঢাকা ১০০০

শো-বন

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৬/২৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-52

TIN GOYENDA SERIES

By Rakib Hassan

উড়ো চিঠি	৫-৫৭
স্পাইডারম্যান	৫৮-১০৫
মানুষখেকোর্দেশে	১০৬-১৮৪

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৮৮/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মর্মি, রত্নদানো)	৮৮/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্ষচক্ষু, সাগর সৈকত)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(দ্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তক, ইন্দ্ৰজাল)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শক্র, বোম্বেটে, ভূতড়ে সুড়ঙ্গ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগীরি, কালো জাহাজ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাঞ্ছিটা প্রয়োজন, খৌড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির বিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্য)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪২/-

তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(সৈশ্বরের অঙ্গ, নকল কিশোর, তিমি পিশাচ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪০/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হঞ্চার)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরবদেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কঞ্চিবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাভ্যার প্রতিশোধ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিশাঙ্গ অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২৭	(এতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাকেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নেট)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নেকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিনি বিষা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টকর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রুবিনিয়োসো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাদের ছায়া)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশঙ্গ লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকল্যা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রতুসঙ্কান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উক্তির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভূতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক+প্রেতের অভিশাপ+রক্তমাখা ছোরা)	৩২/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্ত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ন্যাতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।



উড়ো চিঠি

উড়ো চিঠি

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

ফারিহার মন বেজায় খারাপ।

প্রায় সাতদিন হতে চলল স্কুল ছুটি হয়েছে,
অথচ কিশোরের দেখা নেই। সে এখনও আসছে
না।

মুসা আর রবিনেরও ভাল লাগছে না। রোজ
ওরা জমায়েত হয় বাগানের কোণের ছাউনিতে।
আলাপ-আলোচনা করে। কিন্তু কিশোরকে বাদ
দিয়ে কোন কিছুই যেন জমছে না।

রাস্তায় কুকুরের ডাক শোনা গেল। লাফিয়ে
উঠল ফারিহা, ‘ওই এসে গেছে! নিশ্চয় টিটু!’

দৌড়ে গেটের কাছে এল ওরা।

কোথায় টিটু। অন্য একটা কুকুর।

রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। ভ্যান চালিয়ে চলে গেল ঝটিওয়ালা। অলস
ভঙ্গিতে হেঁটে গেল এক মহিলা। তারপর সাইকেলে চেপে এল সেই অতি পরিচিত
মুখটি।

হ্যারিসন ওয়াগনার ফগর্যাম্পারকট, ওরফে ‘ঝামেলা’। উহলে বেরিয়েছে।
ছেলেমেয়েদের দেখেও না দেখার ভাব করে পার হয়ে যেতে চাইল।

ডাক দিল মুসা, ‘কেমন আছেন, মিস্টার ফগ?’

এই সংক্ষিপ্ত নাম সইতে পারে না কনস্টেবল। গেল রেগে। ‘ঝামেলা!’
সাইকেল থেকে নেমে বলল, ‘ফগর্যাম্পারকট!’

‘সরি, ফগর্যাম্পারকট।’

‘ভাল।’ এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল ফগ, ‘স্কুল ছুটি, না?
আরেকজন কোথায়? কোন ঝামেলা-ঝামেলা করছ না তো?’

তার কথার জবাবেই যেন পাগলের মত ঘটি বাজাতে বাজাতে মোড় থেকে
বেরিয়ে এল আরেকটা সাইকেল। তীব্র গতিতে ছুটে এল।

‘মিস্টার ফগ, সরুন, সরে যান!’ চিৎকার করে উঠল মুসা।

টেলিফোন-বয়ের পোশাক পরা একটা ছেলে সাইকেল নিয়ে এসে হড়মুড় করে
পড়ল ফগের গায়ের ওপর।

চেঁচিয়ে উঠল ফগ, ‘অ্যাই, অ্যাই ছেলে! এটা কি হলো!’

‘মাপ করবেন, স্যার! দেখতে পাইনি! খুব কি ব্যথা পেয়েছেন?’

ছেলেটার কোমল ব্যবহারে খানিকটা নরম হলো ফগ। জিজেস করল,
‘টেলিফোন নিয়ে বেরিয়েছ? কোন বাড়ি খুঁজছ?’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

পকেট থেকে একটা খাম বের করে ঠিকানা দেখল ছেলেটা। বলল, ‘মাস্টার মুসা আমানকে খুঁজছি। টেলিগ্রাম আছে তার।’

‘টেলিগ্রাম!’ অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকাল ফারিহা, ‘তোমার নামে টেলিগ্রাম!’

রাস্তার কিনারে উঁচু হয়ে থাকা ফুটপাতের কিনারে সাইকেলের প্যাডাল ঠেকিয়ে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখতে গেল ছেলেটা। ঠিকমত রাখা হলো না। সে ঘুরতে না ঘুরতেই পড়ে গেল ওটা। হ্যাঙ্গেলের বাড়ি লাগল ফগের হাঁটুর নিচে।

‘বাবাগো, মেরে ফেলেছে!’ বলে বিকট চিংকার করে উঠল ফগ।

হেসে উঠেই মুখে হাত চাপা দিল ফারিহা।

‘ইস, কি কাণ্ড! আমার আর আকেল হবে না!’ বলতে লাগল ছেলেটা। ‘দেখি দেখি কতটা লেগেছে! রাগ করবেন না, স্যার, প্লীজ! আমাকে মাপ করে দিন! অফিসে রিপোর্ট করবেন না!’

ফগের লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেছে। ছেলেটার দিকে জুলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, হাঁটুর নিচে ডলতে ডলতে ধমক দিয়ে বলল, ‘যার টেলিগ্রাম তাকে দিয়ে ভাগো এখান থেকে। যত্সব ঝামেলা! পোস্টাফিসের সময় নষ্ট করছ!’

‘হাঁ, স্যার, তাই যাচ্ছি,’ তাড়াতাড়ি বলল ছেলেটা। ‘তাহলে মাস্টার মুসা আমান...’

‘আমি,’ হাত বাড়াল মুসা।

খামটা দেয়া হলো তার হাতে। খামের মুখ ছিঁড়ে ভেতরের কাগজটা বের করল সে। কিশোরের টেলিগ্রাম। জোরে জোরে পড়ল:

এই ছুটিতে তোমাদের সঙ্গে দেখা
হবে না, দুঃখিত। হিংকিটিটিংফিং যাচ্ছি
আমি একটা রহস্যের সমাধান করতে।
শুভেচ্ছা। কিশোর পাশা।

টেলিগ্রামটা দেখার জন্যে দু-দিক থেকে চেপে এল রবিন আর ফারিহা। কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, নিজের চোখে দেখতে চায়।

ফগও বিশ্বাস করতে পারল না। হাত বাড়াল, ‘দেখি?’ প্রায় জোর করেই মুসার হাত থেকে কাগজটা নিল সে।

‘সেই মোটকা ছেলেটা পাঠিয়েছে, না?’ বলেই ঝট করে টেলিগ্রাফ-বয়ের দিকে তাকাল সে, কিছু মনে করল কিনা দেখল, কারণ এই ছেলেটাও মোটা। ‘কিন্তু হিংকি...হিংকি...জীবনেও শুনিনি নামটা!’

‘জায়গাটা চীন দেশে,’ তাকে অবাক করে দিয়ে বলল টেলিগ্রাফ-বয়। ‘আমার এক চাচা থাকে ওখানে। সে-জন্যেই জানি।’

‘কিশোর গেল ওরকম একটা জায়গায়!’ এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন।

কিয়ে উঠল ফারিহা, ‘এই ছুটিতে আর ওর দেখা পাব না!’

‘ভালই হয়েছে,’ সন্তুষ্ট চিত্তে টেলিগ্রামটা মুসাকে ফেরত দিয়ে বলল ফগ, ‘ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে। এসেই তো খালি যন্ত্রণা। এটাতে নাক গলানো, ওটাতে নাক গলানো, ঝামেলা ছাড়া আর কিছু করে না। থাক ওখানেই। হিংকি...হিংকি...কি যেন নাম?’

‘হিংকিটিটিংফিং,’ বলে দিল টেলিগ্রাফ-বয়। ‘যে পাঠিয়েছে তার কথা আমি শুনেছি। মিস্টার পাশা, খুব বুদ্ধিমান লোক।’

‘মিস্টার?’ ভুরু কুঁচকে ফেলল ফগ। ‘ও তো একটা ছেলে, মিস্টার হলো কি করে? মাস্টার বলতে পারো। ঝামেলা!’

‘বার বার ঝামেলা ঝামেলা করেন কেন আপনি, স্যার? মুদ্রাদোষ?’ নিরীহ কঢ়ে জিজ্ঞেস করল টেলিগ্রাফ-বয়।

হেসে ফেলল ফারিহা।

আবার লাল হয়ে গেল ফগের মুখ। কটমট করে তাকাল।

‘সরি, স্যার। খারাপ কিছু বলে ফেললাম? তবে যা-ই বলেন, স্যার, কিশোর পাশা বুদ্ধিমান ছেলে। গত বছর দুর্দান্ত একটা রহস্যের সমাধান করেছিল, পুলিশ কিছু করতে পারার আগেই। তাই না?’

কিশোরের সুখ্যাতি শুনতে ভাল লাগল না ফগের। নাক কুঁচকে ঘোৎ করে উঠল। ‘গল্প করার চেয়ে কাজ করো গে। পোস্টাফিসের সময় নষ্ট করছ।’

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, স্যার। যাচ্ছি। আচ্ছা, স্যার, আপনার কি মনে হয় হিংকিটিটিংফিংে গিয়ে পুলিশের আগেই রহস্যটার সমাধান করতে পারবে কিশোর?’

‘যাও।’

আর দাঁড়ানোর সাহস পেল না টেলিগ্রাফ-বয়। তাড়াতাড়ি সাইকেলে চেপে চলে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে কিশোর গোয়েন্দাদের খোঁচা দিয়ে বলল ফগ, ‘খুব ভাল ছেলে। বড়দের কথা শোনে। যারা এখনও ভাল হতে পারেনি, ওর কাছ থেকে তাদের শিক্ষা নেয়া উচিত।’

সে-ও সাইকেলে চেপে চলে গেল।

টেলিগ্রামটার দিকে তাকিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বলল, ‘কিশোরের ভাগ্যটাই ভাল। তার চাচা-চাচী কিছু বলে না। আমার মা কোনদিনও একা আমাকে চীন দেশে যেতে দেবে না।’

মুখ-চোখ করুণ করে ফারিহা বলল, ‘কিন্তু তাকে ছাড়া যে আমাদের ছুটিটাই মাটি! কোন রহস্যের আর সমাধান করা হলো না এবার!'

‘আরে দূর!’ হাত নেড়ে বলল মুসা, ‘একজন মানুষ না থাকলে কি হলো? রহস্য পেলে তার সমাধান আমরাই করব।’

বলল বটে, কিন্তু রবিন আর ফারিহার মত সে-ও জানে, ওই একজন মানুষ না থাকলেই অনেক কিছু এসে যায়। কিশোরকে বাদ দিয়ে কোন রহস্য ওরা ভেদ করতে পারবে না।

ঢান খাগুপ করে ছাউনিতে ফিরল তিনজনে। কিশোরের হিংকিটিটিংফিং যাওয়া
। আগে আলোচনা করতে লাগল।
এই সময় আবার শোনা গেল কুকুরের ডাক।

দুই

ডাকটা পরিচিত লাগল ফারিহার কাছে।

টিটু মনে করে আবার ছুটে বেরোল সে। গেটের দিকে তাকিয়েই চিন্কার করে
উঠল, ‘মুসা,’ রবিন, দেখে যাও! টিটু!

অন্য দু-জনও বেরিয়ে এল। বন্ধু পান্নার ওপাশে নাচানাচি করছে আরু ‘খাউ!
খাউ!’ করছে টিটু।

একটা মুহূর্ত অবাক বিস্ময়ে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর
দিল দৌড়। বুঝতে পারছে না, কিশোরকে বাদ দিয়ে টিটু এল কি করে?

গেট খুলে দিল মুসা।

ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল টিটু। কোলে তুলে নিল ওকে ফারিহা। সবাই তাকাল
রাস্তার দিকে।

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে টেলিগ্রাফ-
বয় ছেলেটা। এগিয়ে এল।

‘তুমি!’ একসঙ্গে প্রশ্ন করল মুসা আর রবিন।

রবিন জানতে চাইল, ‘টিটুকে পেলে কোথায়?’

মুসা জিজ্ঞেস করল, ‘ওকেও তোমার কাছে টেলিগ্রাম করে পাঠিয়েছে নাকি
কিশোর?’

জবাব দিল না ছেলেটা। ওদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

সবার আগে বুঝে ফেলল ফারিহা। চিন্কার করে রলল, ‘কিশোর, তুমি! ওহ,
কি বোকা আমরা! একেবারে চিনতে পারিনি!’

হাঁ হয়ে গেল মুসা। নিচের চোয়াল এতখানি ঝুলে পড়ল, খসে পড়ে যাবে যেন।

কিশোরের কাঁধে থাবা মেরে রবিন বলল, ‘আচ্ছা বোকা বানিয়েছ আমাদের।
ওই পুলিশটাকেও হাবা বানিয়ে ছেড়েছ। কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস!’

বাগানে চুকল কিশোর। রাস্তার দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল কেউ চোখ
রাখছে কিনা। টান দিয়ে খুলে ফেলল একটা পূরু ভুরু। কপালের ওপর থেকে
পরচুলাটা সামান্য সরাতেই অন্যেরা দেখতে পেল নিচের কালো কোকড়া চুল।

‘দুর্দান্ত ছদ্মবেশ নিয়েছ!’ উচ্ছুসিত প্রশংসা করল মুসা। ‘একটুও চেনা যায়নি।
কিন্তু ঠোটের কোণ বোলানো, চোখ ছোট ছোট করা, কষ্টস্বর বদলে ফেলা, এ সব
করলে কি ভাবে?’

‘ওটা অভিনয়। তোমাদের তো বলেছিই ছোটবেলায় টিভিতে অভিনয় করেছি।

আমি।'

'অভিনয়ও তুমি খুব ভাল পারো,' রবিন বলল। 'কবে এসেছ?'

'আজকেই।'

কথা বলতে বলতে ছাউনির দিকে এগোল ওরা। কিশোরকে পেয়ে সবাই খুশি। বিমর্শ ভাব দূর হয়ে গেছে।

ফগকে কি ভাবে হেনস্টা করেছে সেটা নিয়ে খুব একচোট হাসাহাসি করল ওরা।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'হিংকিটিচিংফিং নামটা জানলে কি করে? ম্যাপ দেখে বের করেছ?'

'নাহ,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'বানিয়ে লিখে দিয়েছি। পোস্ট অফিসের একটা পুরানে খাম জোগাড় করে তাতে ভরে নিয়ে এসেছিলাম টেলিগ্রামটা।'

হাসতে লাগল ফারিহা। 'এ সব উদ্ভট নাম তোমার মাথায় আসে কি করে? ফগ তো উচ্চারণই করতে পারল না।'

ছাউনিতে চুক্ল ওরা।

বাস্কের ওপর বসে কিশোর বলল, 'হ্যাঁ, এবার বলো, কোন রহস্য-টহস্য পেয়েছ নাকি?'

'না, পাইনি,' মুসা বলল। 'ভাবসাব যা দেখছি, এই ছুটিতে পাব বলেও মনে হচ্ছে না।'

'রহস্য কখন এসে হাজির হয়, কেউ বলত্তে পারে না,' উৎসাহ দিল কিশোর। 'চোখকান খোলা রাখতে হবে আমাদের। কিছু একটা পেলেই গপ্প করে ধরব।'

আরও এক হণ্টা পেরিয়ে গেল। আবহাওয়া ভাল না। মেঘলা থাকে আকাশ, যখন তখন ঝুরঝুর করে বৃষ্টি নামে। প্যাচপেচে কাদা। বাইরে বেরিয়ে আরাম নেই। ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে ওদের।

মুসাদের বাড়িতেই সময় কাটায় কিশোর আর রবিন।

একদিন মুসা প্রস্তাব দিল, নাটক করবে। অন্যদেরও আপত্তি নেই। অভিনয় করতে গিয়ে এমনই চিৎকার শুরু করল সে, ছুটে এলেন তার মা।

'এই, কি হয়েছে! এত চেঁচামেচি কিসের?'

'কিছু না, মা,' গায়ে জড়ানো লাল কাপড়টা তাড়াতাড়ি খুলতে খুলতে জবাব দিল মুসা, 'নাটকে অভিনয় করছি। রোম স্মার্ট সেজেছি আমি। গোলামদের কাজ করার আদেশ দিচ্ছি।'

মুসার হাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস আমান, 'এই লাল চাদর পেলি কোথায়? মিসেস বিনেরটা নয় তো?'

'হ্যাঁ, তারই। ভাবলাম, কিছু মনে করবে না...'

কয়েক মাস হলো এসেছে মিসেস বিন। বাড়ির দেখাশোনা আর বাবুর্চির কাজ করে। আগে এ কাজ যে করত সে অসুস্থ, হাসপাতালে। মিসেস বিন খুব ভাল রাখে, কিন্তু ভীষণ বদমেজাজী। ছোটদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তার লেগেই

আঠে।

‘এক্ষুণি গিয়ে রেখে আয় যেখান থেকে এনেছিস,’ ধমক দিয়ে বললেন মিসেস আমান।

মুখ কাঁচুমাচু করে বেরিয়ে গেল মুসা।

খানিক পর ফিরে এসে বসে রইল গুম হয়ে।

ফারিহা বলল, ‘এই মহিলাটার ব্যাপারে কিছু করা দরকার।’

‘কি করবে?’ রবিন বলল। ‘আমি তো কোন দোষ দেখি না। আমরা বিরক্ত করি বলেই রাগ করেন। ওটা সবাই করবে।’

‘কিন্তু লিলি তাকে ভয় পায়।’

লিলি হলো মিসেস বিনের সহকারী। নানা কাজ করে। বললেই করে, কোন কাজে না করে না। খুব লাঞ্জুক।

‘তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মিসেস জারগন,’ মুসা বলল। ‘রান্নাঘরে তুকলে একটা না একটা কিছু হাতে ধরিয়ে দেবেই।’

‘কিন্তু সে তো আসে মাত্র দু-দিন,’ ফারিহা বলল।

‘মিসেস বিনের বদলে মিসেস জারগনকে সব সময়ের জন্যে রেখে দিলে মা ভাল করত।’

এ সব কথায় বিশেষ আগ্রহ নেই কিশোরের। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অলস ভঙ্গিতে হাই তুলে বলল, ‘আবার নেমেছে বৃষ্টি। দূর, আর ভাল্লাগে না।’

‘একটা কিছু করা দরকার,’ রবিন বলল। ‘রহস্য ছাড়া আর চলছে না। আমরা বিরক্ত হচ্ছি, ঝামেলা র্যাম্পারকট ওদিকে খুশি হচ্ছে, আমরা করার কিছু পাচ্ছি না বলে।’

‘সুতরাং তাকে খুশি হতে দেয়া চলবে না,’ মুসা বলল। ‘চলো, বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি।’

ম্যাকিনটিশ গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। রহস্য খুঁজতে গেল একটা পোড়ো বাড়িতে। অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল একজন ভবঘূরে, পিলে চমকে দিল ওদের।

তবে লোকটার মধ্যে, কিংবা বাড়িটাতে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেল না ওরা।

খোজখুঁজি করে হতাশ হয়ে যার যার বাড়ি ফিরে গেল।

মেজাজ খারাপ করে বাড়িতে তুকল মুসা। খেপা হয়ে গেছে যেন। ঠিক করেছে এখন মা কোন কথা বললে তার সঙ্গেও ঝগড়া বাধাবে।

কিন্তু সেটা করতে হলো না। পাশের বাড়িতে চায়ের দাওয়াতে গেছেন মিসেস আমান।

চা খেয়ে একা একা ড্রাইং রুমে এসে বসল মুসা আর ফারিহা।

ফারিহা প্রস্তাব দিল, ‘বসে না থেকে এসো খেলি। লিলিকে ডাকি, কি বলো?’

‘মন্দ হয় না,’ মুসা বলল।

খুশি হয়েই খেলতে এল লিলি। বয়েস উনিশ, কালো চুল, মোটামুটি আকর্ষণীয়

চেহারার গোবেচারা একটা মেয়ে।

অনেকক্ষণ খেলার পর ফারিহাকে বলল, ‘তোমার খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়োগে। বেশি রাত করলে তোমার খালা এসে বকবেন।’
‘বকুক!’

এত তাড়াতাড়ি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই ফারিহার। কিন্তু খালা, অর্থাৎ মুসার আমাকে ভীষণ ভয় পায় সে। বসে থাকার সাহস হলো না আর।

খাওয়ার পর নিজের ঘরে টুকল মুসা। আকাশের ওপর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মেঘ করে আছে এখনও, তবে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে।

তিনি

পরদিন সকালে আর বৃষ্টি নামল না।

মুসাদের বাড়িতে হাজির হলো কিশোর আর রবিন।

রবিন বলল, ‘চলো বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে খাবার নেব। দুপুরে আর ফিরব না। দূরে কোথাও চলে যাব। কি বলো?’

সবাই রাজি। ঘরে থাকতে থাকতে শরীর পচে গেছে যেন।

‘কিন্তু খালা আমাকে দূরে যেতে দিতে রাজি হবে কিমা কে জানে,’ ফারিহা বলল। ‘গত বছর তো দেয়নি। বলে আমি খুব ছোট।’

‘জিজ্ঞেস করে দেখো,’ টিটুর ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বলল কিশোর। ‘মুসা, লিলির কি হয়েছে?’

‘কি আবার হবে? কিছু না।’

‘আসার সময় দেখলাম। মনে হলো কাঁদছে।’

‘কাঁদবে কেন? কাল রাতেও তো ভাল ছিল। আমাদের সঙ্গে খেলেছে। হাসাহাসি করেছে। হয়তো মিসেস বিন বকেছে।’

‘নাহ,’ মাথা নাড়ল কিশোর। ‘বরং দেখলাম বোঝাচ্ছে লিলিকে। নরম গলায় কথা বলছে।’

আর বসে থাকতে পারল না ফারিহা। লিলিকে সে পছন্দ করে। হলঘরে এসে দেখল, মেঝে মুছছে মেয়েটা।

‘কি হয়েছে তোমার?’ জিজ্ঞেস করল ফারিহা। ‘কাঁদছ কেন? কেউ বকেছে?’

‘কই, না তো,’ হাসার চেষ্টা করল লিলি। ‘বকবে কেন?’

সন্দেহ ফুটল ফারিহার চোখে। কিছু একটা ঘটেছে লিলির, চোখ দেখেই বোঝা যায়। কেঁদে কেঁদে লাল করে ফেলেছে।

‘খারাপ খবর-টবর পেয়েছ?’

‘না। তুমি যাও। আমাকে কাজ করতে দাও।’

অন্যদের কাছে ফিরে এল ফারিহা। জানাল, ‘লিলি কেঁদেছে ঠিকই। কেন, বলতে চাইছে না। আমাকে ভাগিয়ে দিল।’

‘কেউ কিছু বলতে না চাইলে জোর করে তো আর বলানো যাবে না,’ রবিন বলল। ‘থাক সে তার মত। আমাদের কাজ আমরা করি। মুসা, তোমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, যেতে দেবেন কিনা।’

সারা দিনের জন্যে বেরিয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা, শুনে যেন খুশিই হলেন মিসেস আমান। মুসাকে বললেন, ‘গেলে যা। আমিই বরং যাওয়ার কথা বলতে যাচ্ছিলাম। খাবার প্যাকেট করে দিচ্ছি, নিয়ে যা। দুপুরেও আসার দরকার নেই। আমার জরুরী কাজ আছে, অসময়ে এসে বিরক্ত করবি না।’

ফারিহাকেও যেতে দিতে রাজি হলেন তিনি।

ফিরে এল মুসা। বন্ধুদের জানাল সব কথা। বলল, ‘মনে হলো আমাদের তাড়াতে চাইছে মা; না যেতে চাইলে জোর করে বের করে দিত, এমনি ভাবসাব। ব্যাপারটা বুঝলাম না। এমন কি জরুরী কাজ?’

‘হয়তো আলমারি ঝাড়া দেবে,’ ফারিহা অনুমান করল। ‘আমরা থাকলে কাজের অসুবিধে করতে পারি, তাই বিনেয় করছে।’

সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। কিশোরের সাইকেলের বাস্কেটে বসে আছে টিটু। পিকনিক তার খুব ভাল লাগে। পিকনিক হলে বনের মধ্যে যাওয়া যায়। আর বন মানেই অগুনতি খরগোশ।

দিনটা সুন্দর। বাতাস উষ্ণ। চমৎকার রোদ। বনে নানা রকম ফুল ফুটেছে। এক ধরনের নীল বুনো ছোট ছোট ফুল যেন বিছিয়ে আছে ঘাসের মধ্যে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় নীল কাপেটি পেতে দেয়া হয়েছে।

হাসি আনন্দে কেটে গেল দিনটা।

এবার বাড়ি ফেরার পালা।

সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। গ্রামের গির্জাটার কাছে এসে বিদায় নিয়ে তার বাড়ির দিকে চলে গেল কিশোর। টিটু সাইকেলের বাস্কেটে বসে আছে চুপচাপ। দিনটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল বলে যেন দুঃখ হচ্ছে তার। আর কিছুদূর এগিয়ে রবিনও চলে গেল। ফারিহাকে নিয়ে মুসা চলল নিজেদের বাড়িতে।

এতদূর সাইকেল চালিয়ে এসে গলা শুকিয়ে গেছে মুসার। বরফ দেয়া এক গেলাস শরবত পেলে মন্দ হয় না। লিলিকে বললে বানিয়ে দেবে। সাইকেল রেখে ঘরে চুকে রান্নাঘরের দিকে এগোল। ফারিহা চলল পেছনে।

রান্নাঘরে নেই লিলি। নিচতলার কোন ঘরেই নেই। ওপরতলায়ও পাওয়া গেল না। শেষে গলা চড়িয়ে ডাক দিল তাকে মুসা।

সাড়া দিলেন মিসেস আমান। মুসাকে ডাকলেন।

‘দিনটা কেমন কাটালি?’ হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

অবাক হলো মুসা। মা সাধারণত এমন ব্যবহার করে না। বিশেষ করে পিকনিক করে এলে। মায়ের কাছে ওটা অকারণ সময় নষ্ট। জবাব দিল, ‘ভাল।’

‘লিলিকে কি দরকার?’

‘শরবত বানিয়ে দিতু’ গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।’

‘শরবত বানানো আৱ কি এমন কঠিন কাজ। নিজেই বানিয়ে নে গে না।’

‘আচ্ছা,’ বলে আবার রান্নাঘরে চলল মুসা। এককোণে বসে আছে মিসেস বিন। সোয়েটার বুনছে। একটু আগে লিলিকে খুঁজতে যখন চুকেছিল, তখন ছিল না। বোধহয় বাথরুম-টাথরুমে গিয়েছিল। মাথা ঘামাল না মুসা। মা যখন ফ্রিজ ধৰার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে, মিসেস বিনকে আৱ কেয়াৰ কৰে না।

‘কি চাই?’ কড়া গলায় জিজ্ঞেস কৰল মুসা।

‘শরবত। না না, আপনাকে বানিয়ে দিতে বলব না। লিলি থাকলে তাকে বলতাম। আমৱাই বানিয়ে নিছি।’

‘থাক, তোমাকে আৱ সব তছনছ কৰতে হবে না। আমি বানিয়ে দিছি।’

‘লিলি কোথায়?’ ফারিহা জানতে চাইল।

‘বাইরে গেছে।’ দুটো গেলাস নামাল মিসেস বিন।

‘আজ তো বাইরে যাওয়াৰ দিন নয়?’ মুসা বলল।

‘কিন্তু গেছে।’ ফ্রিজের ডালা খুলে বৰফেৰ টুকৰো বেৰ কৰতে লাগল মিসেস বিন।

শরবত বানাতে সময় লাগল না। গেলাস দুটো দু-জনেৰ হাতে ধৰিয়ে দিয়ে নীৱবে আবার ঘৰেৰ কোণে ফিরে গেল সে।

মিসেস বিনকে ধন্যবাদ দিয়ে গেলাস দুটো নিয়ে নিজেদেৱ ঘৰে রওনা হলো দু-জনে, আৱাম কৰে খাওয়াৰ জন্যে।

‘লিলিৰ ব্যাপাৰে মুখ খুলল না কেন মিসেস বিন?’ নিজেকেই প্ৰশ্ন কৰল মুসা। ‘এড়িয়ে গেল মনে হলো।’

ফারিহা বলল, ‘মিসেস বিনেৰ অত্যাচাৰে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়নি তো?’

থমকে দাঁড়াল মুসা। ‘ভাল কথা বলেছ। চলো, শরবতটা খেয়ে লিলিৰ ঘৰে গিয়ে দেখি কাপড়-চোপড়গুলো আছে কিলা।’

ওপৰতলায় এসে ঘৰটাৰ দৱজা খোলা পাওয়া গেল। তালা লাগানো নেই। ঠেলা দিতে খুলে গেল।

হাঁ কৰে তাকিয়ে রইল ওৱা। একটা জিনিসও নেই। সব নিয়ে গেছে। তারমানে চলেই গেছে লিলি। আৱ আসবে না।

‘হ্যাঁ, চলে গেছে,’ বিষণ্ণ কৰ্ত্তে বলল ফারিহা। ‘কিন্তু সে যে চলে যাবে আমাদেৱ বলল না কেন? খালাও কিছু বলল না। মিসেস বিনও না। রহস্যটা কি?’

‘অবাকই লাগছে। চুৱি-টুৱি কিছু কৱেনি তো, যাৱ জন্যে মা তাড়িয়ে দিয়েছে?’ নিজেই প্ৰশ্নেৰ জবাব দিল, ‘না, আমাৱ মনে হয় না। ও খুব ভাল। চোৱ হতে পাৱে না।’

‘থালাকে জিজ্ঞেস কৰব, এসো।’

বসাৰ ঘৰে এল দু-জনে। মিসেস আমান নেই সেখানে। স্টাডিতে এল ওৱা। সেখানেও নেই তিনি। বেৱোতে যাবে, হঠাৎ মুসাৰ চোখে পড়ল জিনিসটা।

চেয়ারের ওপর পড়ে আছে বড় একটা কালো উল্লের দস্তানা।

‘কার ওটা?’ ফারিহাও দেখেছে। ‘এ বাড়ির কারও নয়।’

দস্তানার তালুতে লাল সুতো দিয়ে একটা নাম লেখা। নামটা সাংঘাতিক অবাক করল ওদের—

ফগরয়াম্পারকট

‘ফগ! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। ‘ওই লোক এখানে কি করছিল? মা’র জরুরী কাজটা এখন আন্দাজ করতে পারছি কিছুটা। ফগের সঙ্গে কথা বলেছে। কি কথা?’

উজ্জেনায় থরথর করে কাঁপছে ফারিহা। ককিয়ে উঠল, ‘আমি জানি কি কথা! লিলিকে ধরে নিয়ে গেছে! জেলে দেবে!’

‘চুপ! আস্তে! মা শুনতে পাবে!’

চোমেচি শুনে দরজায় উঁকি দিলেন মিসেস আমান। ‘কি হয়েছে? মুসা, ওকে মেরেছিস নাকি?’

‘না, মারব কেন শুধু শুধু। মা, ফগ এসে লিলিকে ধরে নিয়ে গেছে, তাই না? কি করেছিল ও? চুরি করেছিল?’

‘না।’

‘তাহলে ফগ এসেছিল কেন? লিলিই বা বাড়ি নেই কেন?’

‘ফগ এসেছিল জানলি কি করে?’ কিছুটা অবাকই হলেন মিসেস আমান।

দস্তানাটা দেখাল মুসা, ‘এটা দেখে। নিশ্চয় ভুলে ফেলে গেছে।’

লিলিকে নিয়ে যায়নি। এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, মুষড়ে পড়েছিল বেচারী মেয়েটা। তাই ওকে ওর খালার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।’

‘ফগ এসেছিল কেন?’

‘সেটা তোর জানার দরকার নেই,’ বদলে গেল মিসেস আমানের চেহারা, কষ্টস্বর কর্কশ হয়ে উঠল। ‘অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবি না। সব কিছুতে রহস্য খুঁজবি না, গোয়েন্দাগিরির দরকার নেই।’

‘তারমানে রহস্য একটা আছে!’ বলে ফেলল ফারিহা। ‘খালা, ফগ ওটা সমাধানের চেষ্টা করছে, না?’

‘বললাম না, তোদের জানার দরকার নেই। তোর খালু আর আমি আজ একটা ব্যাপার নিয়ে মিস্টার ফগরয়াম্পারকটের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ব্যস। এর বেশি আর জানতে হবে না।’

‘আমাদের বিকুন্দে নালিশ করতে এসেছিল?’ জিজ্ঞেস করল মুসা।

‘তা করবে কেন? কিছু করেছিস নাকি?’

‘না না, কিছু করিনি। আমাদের দেখতে পারে না তো, তাই...’

‘পারবে কি করে? বড়দের কাজে ছোটদের এত নাক গলানো কেউ পছন্দ করে না।’

মিসেস আমান চলে গেলেন।

দস্তানাটায় হাত ঢোকাল মুসা। ‘কতো বড় হাতরে বাবা!’ ফারিহার দিকে আশাল। ‘কেন এসেছিল ও, আন্দাজ করতে পারো?’

‘না। তবে আমার মনে হয় লিলির ব্যাপারেই কিছু। কিশোরকে জানানো
দরকার। কি করতে হবে, সে-ই বলবে আমাদের।’

রাত হয়ে গেছে। যাওয়ার সময় আর নেই। পরদিন সকালের জন্যে অপেক্ষা
করতেই হবে।

চার

পরদিন সকালে রবিনকে তাদের বাড়ি থেকে ঢেকে নিয়ে কিশোরদের ওখানে চলে
এল ফারিহা আর মুসা। সব কথা জানাল।

শুনে নিচের ঠোটে ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল কিশোর। তারপর বলল,
‘রহস্যটা লিলিকে নিয়েই, আমি শিওর। আশ্চর্য! আমাদের নাকের নিচে এ রকম
একটা কাণ ঘটে গেল, আর ঘটার আগে কিছুই জানতে পারলাম না!?’

‘পারলাম না আর কোথায়? জানতে একটু দেরি হলো আরকি,’ রবিন বলল।
‘এখন কাজ শুরু করে দেয়া দরকার। কি করব?’

‘মুসার আম্মার কাছে গিয়ে লাভ হবে না,’ কিশোর বলল। ‘একটা কথাও
বলবেন না তিনি। বরং ফগের কাছে যাব। এমন ভঙ্গি করব, যেন তার চেয়ে বেশি
জানি আমরা। দেখা যাক কিছু বের করতে পারি কিনা?’

‘কিন্তু সে তো জানে তুমি চীন দেশে গেছ,’ মুসা বলল।

‘গিয়েছিলাম,’ মুচকি হাসল কিশোর। ‘রহস্যটার সমাধান করে চলে এসেছি।
আমি একাই যাচ্ছি। তোমরা থাকো। টিটু, আয়।’

ফগের বাড়ি এসে তার দরজায় টোকা দিল সে। মুসাদের বাড়ির মতই
এখানেও ঠিক কাজ করে মিসেস জারগন। কিশোরকে চেনে। দরজা খুলে
দিল।

‘মিস্টার ফগ আছেন?’ জিজেস করল কিশোর। ‘জরুরী দরকার আছে।
ওকে রুলুন একটা জিনিস ফেরত দিতে এসেছি।’

ডেতরে চলে গেল মিসেস জারগন। ছোট বসার ঘরে বসে অপেক্ষা করতে
শোণাল কিশোর।

পেছনের আভিনায় বসে সাইকেলের টিউব মেরামত করছিল ফগ। উঠে এল।
কিশোরকে দেখে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে তার গোল গোল চোখ।

‘গামেলা! তুমি? তোমার তো চীনে থাকার কথা!’

‘ও, চলে এলাম। রহস্যটা সমাধান করতে সময় লাগেনি। হিংকিটিটিংফিঙ্গে
আপনার কথা খুব মনে হয়েছে, মিস্টার ফগ...’

‘ফগরাম্পারকটি!’

‘মিস্টার ফগরাম্পারকট। কাঠি দিয়ে ভাত খেতে দারুণ লাগে। মজা করে
খেতে পারতেন।’

‘ফালতু কথা শোনার আমার সময় নেই। কি বলতে এসেছ তাই বলো।’

‘এই যে, কাল মিসেস আমানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।’

‘ঝামেলা! তুমি জানলে কি করে? কারও তো জানার কথা নয়।’

‘এ রকম একটা খবর চেপে রাখবেন কি করে?’

‘কি রকম খবর?’

‘লিলি। আশা করি খুব শীঘ্র এর একটা বিহিত করে ফেলতে পারবেন।’

অঙ্ককারে টিল ছুঁড়েছে কিশোর। ফগের চোখ বড় বড় হয়ে যেতে দেখেই বুঝে ফেলল টিলটা জায়গামত লেগেছে।

‘চিঠিটার কথা কে বলেছে তোমাকে?’

ও, তাহলে একটা চিঠি নিয়ে গওগোল—ভাবল কিশোর। বলল, ‘আপনি তো বুবেই গেছেন আমরা খারাপ গোয়েন্দা নই। চাইলে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।’

‘ঝামেলা!’ ধৈর্য হারাল ফগ। ‘এই কথা বলতে এসেছ! যাও ভাগো! তোমাদের ছাড়াই আমি সব করতে পারব। মিসেস আমান কথা দিয়েছেন কাউকে বলবেন না, আমার ধারণা তিনি বলেনওনি। তাহলে জানলে কি করে তোমরা?’

মুচকি হাসল কিশোর। দস্তানাটা বের করে দিল, ‘এটা আপনার। কাল মুসাদের বাড়িতে ফেলে এসেছিলেন।’

ফগের মুখ দেখে মনে হলো চোখ উল্টে পড়ে যাবে। ‘ঝামেলা!’

খুশি হলো কিশোর। হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। ‘বাড়ি ফিরে চলল।

তার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। কি খবর জেনে এসেছে জানাল ওদেরকে।

‘আমার বিশ্বাস,’ কিশোর বলল, ‘মিসেস বিন কিছু জানে। ফারিহা, তার কাছ থেকে কথাগুলো আদায় করতে পারবে?’

‘কি করে? জানলেও কিছুই বলবে না। কালই বুঝে গেছি। লিলির ব্যাপারে কোন কথা বলতে চায়নি।’

‘তবু, আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। বোনাবুনি পছন্দ করে সে। মোজা বা টুপি কিছু একটা বোনার ভান করে চলে যাবে তার কাছে। বলবে, বুনতে পারছ না। সাহায্য চাইবে তার কাছে। কি করে বুনতে হয় দেখিয়ে দিতে বলবে তাকে। এই ফাঁকে কায়দা করে লিলির কথাটা জেনে নেবে।’

‘দেখব চেষ্টা করে। সকালে কথাই বলবে না, অনেক কাজ। বিকেলে যাব, যখন অবসর থাকে।’

সুতরাং সেদিন বিকেলে কাঁটা আর উল হাতে রান্নাঘরে রওনা হলো ফারিহা। মিশুক নয় মিসেস বিন। তার সঙ্গে আলাপ জমানোর কথা ভাবতেও অস্বস্তি লাগছে তার।

কিন্তু ভাগ্য খুলে গেল আচমকা, সহজ হয়ে গেল কাজ। রান্নাঘরে চুক্তে হলো না ফারিহাকে। পেছনের আঙ্গিনা থেকে ভেসে এল দু-জন মহিলার কথা। মিসেস জারগন এসেছে। মিসেস বিনের সঙ্গে কথা বলছে।

‘খারাপ লাগবে না তো কি লাগবে,’ মিসেস বিনের গলা। ‘ওর বয়েসী একটা মেয়ে যদি হঠাৎ এমন বাজে একটা চিঠি পায়, তার গোপন কথাগুলো ফাঁস করে দেয়া থাকে চিঠিতে, তব পাবে না? চিঠির নিচে লেখকের নাম নেই। সেটা আরও খারাপ। জঘন্য।’

‘হ্যাঁ, এগুলো এক ধরনের ভীরুতা,’ হাসি হাসি গলায় বলল মিসেস জারগন, আলোচন্তায় মজা পাচ্ছে মনে হলো। ‘আমি বলে দিলাম মিসেস বিন, মনে রাখবেন কথাটা, আরও আসবে এ রকম উড়োচিঠি। যারা এ সব লেখে তারা একবার লিখেই থেমে যায় না। আরও লেখে, আরও লেখে, মানুষকে তব পাওয়ানোটা নেশার মত হয়ে যায় তাদের কাছে। এরপর কে পাবে কে জানে। আপনিও পেতে পারেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই।’

কথাটা এড়িয়ে গিয়ে মিসেস বিন বলল, ‘বেচারী মেয়েটা একেবারে ভেঙে পড়ল। খালি কাঁদছিল, খালি কাঁদছিল। জোর করে তার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়লাম। মিসেস আমানকে সব জানাতে বললাম। জানতাম তিনি সাহায্য করবেন। সে-জন্যেই তাঁর কাছে পাঠালাম।’

‘তিনি কিছু করেছেন?’

‘করেছেন। সাহেবকে দেখিয়েছেন চিঠিটা। সাহেব তখন মিস্টার ফগকে ফোন করলেন। এই কাজটা ঠিক হয়নি। ওই অকর্মা পুলিশটা কিছু করতে পারবে না।’

‘মিস্টার ফগর্যাম্পারকটকে অত বোকা ভাববেন না। অনেক দিন ধরে কাজ করছি তাঁর ওখানে, চিনি তাকে। মানুষ তিনি খারাপ না, তবে কেন জানি ওই ছেলেমেয়েগুলোকে একদম দেখতে পারেন না।’

‘মুসা আর তার বন্ধুদের কথা বলছেন তো? এই আরেকটা ব্যাপার। সাহেব আর বেগম সাহেবের কাছ থেকে কথা আদায় করে ছেড়েছে ফগ, যাতে চিঠির কথাটা ছেলেমেয়েগুলোর কাছে একদম গোপন রাখে।’

হেসে ফেলল মিসেস জারগন। ‘হয়তো ভেবেছে তাঁর আগেই ওরা রহস্যটার সমাধান করে ফেলবে। যাকগে। আচ্ছা, মিসেস বিন, লিলির কাজ এখন কে করবে?’

‘সেইটাই তো ভাবনা। ওর ফিরে আসাটা এখন ঠিক হবে না। আমরা নাহয় চুপ থাকলাম, লোকের মুখ তো আর বন্ধ রাখা যাবে না। নানাজনে নানা কথা বলবে। বাইরে বেরোনোই মুশকিল হয়ে যাবে। আপাতত ভাবছি আমার ভাইয়ের মেয়েটাকে খবর দেব। বেগম সাহেবের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তিনি রাজি হয়েছেন। খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। আগামী হণ্টা নাগাদ আসবে ও।’

‘ঠিক আছে। আজ তাহলে যাই...’

‘সে কি। এখনই যাবেন কি। এক কাপ চা খেয়ে যান।’

আর শোনার প্রয়োজন মনে করল না ফারিহা। মোজা বোনা শেখার জন্যে মিসেস বিনের কাছে যাওয়ারও আর দরকার নেই। যা যা জেনেছে মুসাকে জানানোর জন্যে দৌড় দিল।

বাগানে বসে আছে মুসা। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ফারিহা দেখল,
কিশোর আর রবিনও আসছে। নিচয়ে ও কিছু করতে পেরেছে কিনা জানার জন্যে
আসছে ওরা।

উত্তেজিত ফারিহার মুখ থেকে সব শোনার পর কিশোর হেসে বলল,
‘উড়োচিঠি, না? আমিও এ রকমই আন্দাজ করেছিলাম। যাক, রহস্য একটা পাওয়া
গেল। এখন সূত্র খুঁজে বেড়াতে হবে।’

‘কিন্তু কে লিখেছে কি করে বের করবে?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘সমস্যা যখন পাওয়া গেছে, সমাধানও পেয়ে যাব,’ ভারিকি চালে গাল ফুলিয়ে
বলল কিশোর।

পাঁচ

পরদিন কিশোরদের বাড়িতে কিশোরের ঘরে আড়া বসল। আলোচনার মূল বিষয়
অবশ্যই লিলির উড়োচিঠি।

‘আগের দিনের প্রশ্নটা করল আবার রবিন, ‘কে লিখেছে কি করে বের করব?’

‘যাদেরকে সন্দেহ হয় তাদের একটা তালিকা করে ফেলতে হবে,’ কিশোর
বলল।

‘কাদেরকে সন্দেহ করি আমরা তাই তো জানি না,’ বলল মুসা।

‘জেনে যাব,’ দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। ‘তবে সবার আগে
চিঠিটা দেখতে হবে আমাদের, কি লেখা আছে তাতে জানতে হবে।’

‘কোথায় আছে ওটা?’ ফারিহার প্রশ্ন।

‘হয়তো মা’র কাছে,’ মুসা বলল।

‘কিংবা লিলির কাছে,’ বলল কিশোর। ‘তার কাছে থাকার সন্তানাই বেশি।
তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।’

‘তাহলে চলো,’ উঠে দাঁড়াল মুসা।

‘কোথায়?’

‘লিলির কাছে।’

‘তার ঠিকানা জানো?’

ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ল মুসা। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। মাথা নাড়ল, ‘না!

‘তাহলে কি করে যাবে?’

‘এক কাজ করা যায়। মাকে জিজ্ঞেস করতে পারি।’

‘আমি শিংওর, তিনি বলবেন না। যতভাবে সন্তান আমাদের ঠেকানোর চেষ্টা
করবেন তিনি। পুলিশের কাজে নাক গলাতে দেবেন না। মিসেস বিনকে জিজ্ঞেস
করেও লাভ হবে না।’

‘তাহলে বের করব কি করে?’

‘আমি পারব!’ চেঁচিয়ে উঠল ফারিহা।

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। কিশোরের পায়ের কাছে শয়ে থাকা টিটও উঠে বসে তাকাল ওর দিকে। বলল, ‘ঘাউ !’

‘লিলির একটা বই আছে আমার কাছে। পড়তে নিয়েছিলাম। খালাকে বলব এটা ফেরত পাঠাতে চাই। ঠিকানা দরকার।’

চটাং করে তুড়ি বাজাল কিশোর। ‘দারুণ বুদ্ধি ! ভাল গোয়েন্দা হতে পারবে শুমি !’

কিশোরের প্রশংসায় বুক আধহাত ফুলে গেল ফারিহার। চোখ ঘুরিয়ে তাকাতে পাগল সবার দিকে, বিশেষ করে মুসার দিকে।

মুখ গোমড়া হয়ে গেল মুসার। বলল, ‘একটা বুদ্ধি আমার মাথায়ও এসেছে।’

কিশোর জানতে চাইল, ‘কি ?’

‘একটা খামে সাদা কাগজ ভরে লিলির নাম লিখে আমাদের বাড়ির ঠিকানায় পাঠাতে পারি। মা তখন ওটা লিলির কাছে পাঠাতে চাইবে। নতুন করে ঠিকানা লিখবৈ। কাছে কাছে থাকব আমি। সুযোগ করে দেখে ফেলব।’

‘হ্যাঁ, এই বুদ্ধিটাও ভাল।’

হাসি ফুটল মুসার মুখে। ‘তাহলে করব ?’

‘হ্যাঁ, করো। তুমিও চেষ্টা করো, ফারিহাও করুক। এই নাও, খাম।’
একপাতা সাদা কাগজও বের করে দিল কিশোর।

কাগজটা খামে ভরে মুখ বন্ধ করল মুসা। ঠিকানা লিখতে যাবে, বাধা দিল কিশোর, ‘দাঁড়াও। লিখবে যে, তোমার হাতের লেখা চিনে ফেলতে পারেন আশ্টি।’

‘তাই তো ! কে লিখবে ?’

‘আমার কাছে দাও।’

খামটা নিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে ঠিকানা লিখল কিশোর। দেখলে মনে হবে কোন মেয়ে লিখেছে। মিসেস আমান ভাববেন লিলির কোন বান্ধবী।

‘রবিন বলল, ‘তুমি সত্যি অসাধারণ। এমন কোন কাজ নেই পারো না। এত গুরু করে লেখা নকল করতে কোনদিনই পারব না আমি।’

তাসল কিশোর।

ঠিক হলো, সেদিন বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে চিঠিটা ডাকবাঞ্জে ফেলে যাবে শুণ।

গোয়েন্দাণিরির ব্যাপারে আপাতত আর কিছু করার নেই।

গম্যাটা খেলে কাটাল ওরা।

গুকেলে বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরে ছুটল ফারিহা। বইটা টেবিলেই থাকে। পেটা নিয়ে নেমে এল নিচে।

খালা বসার ঘরে বই পড়ছেন। সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন। ‘কেমন কাটালি ?’

‘গুল। খুব ভাল। কিশোর থাকলে সহজেই সময় কেটে যায়।’

‘ক এই ক্লাসের বই নিশ্চয় নয় ?’

‘ণা। লিলির কাছ থেকে পড়তে নিয়েছিলাম। সে তো চলে গেছে, কবে আসে

ঠিক নেই। ভাবলাম ডাকেই ফেরত পাঠিয়ে দিই।'

'আচ্ছা।'

'ঠিকানাটা বলো, পার্সেল করতে হবে।'

'রেখে যা। আমিই করে দেব।'

'তোমার কষ্ট করার দরকার নেই। ঠিকানাটা বলো, আমিই লিখতে পারব।'

'বললাম তো আমি সব করে দেব। তোর চিন্তা করতে হবে না। রেখে যা। খেয়েছিস?'

'খেয়েছি। ইস্কুল ছুটি, অনেক দিন কিছু লিখি না। আমার এখন খুব লিখতে ইচ্ছে করছে। বলো না ঠিকানাটা।'

'তোর লিখতে ইচ্ছে করছে! তোর! লেখার কথা শুনলেই যার আঙুল ব্যথা শুরু হয়! আজব কথা শোনালি! লিলির ঠিকানা লেখার এত আগ্রহ কেন?'

আর চাপাচাপি করার সাহস হলো না। বইটা খালার কাছে রেখে মুখটাকে বর্ষার মেঘে ঢাকা আকাশের মত ভারি করে ঘরে ফিরে এল ফারিহা।

তার মুখে সব শুনে রাগ করে বলল মুসা, 'মা'টা বড় বেশি বেশি করে!'

কিন্তু সামনে গিয়ে কিছু বলার সাহস হলো না।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই গিয়ে আগে লেটার বক্স খুলল সে। পুলকিত হয়ে দেখল আগের দিন তার পাঠানো চিঠিটা আছে অন্যান্য চিঠির সঙ্গে।

চিঠিগুলো নিয়ে এসে বসার ঘরে পেল মা'কে। আগের দিন ফারিহার রেখে যাওয়া বইটা তখনও টেবিলে আছে। তবে পার্সেল করার কাগজে মোড়া। ঠিকানা লেখা হয়নি।

মুসা বলল, 'বই পাঠাচ্ছ নাকি কোথাও?'

'হ্যা। ফারিহা দিয়েছে, লিলিকে পাঠানোর জন্যে।'

'ঠিকানা তো লেখা হয়নি। লিখে দেব?'

তুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকালেন মিসেস আমান। 'তোদের দু-জনের হলো কি? ঠিকানা লেখার জন্যে এমন উঠে পড়ে লেগেছিস কেন?'

'ইয়ে...এমনি...মনে হলো...'

'আমিই লিখতে পারব। চিঠিগুলো রেখে, যা।'

চিঠিগুলো টেবিলে রেখে মুসা বলল, 'লিলির একটা চিঠি আছে।'

পায়ে পায়ে ফারিহাও এসে দাঁড়িয়েছে।

তার চোখের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে মুসা বলল, 'চিঠিটা কি করবে, মা?'

'কি আবার। লিলির কাছে পাঠিয়ে দেব।'

আশায় দুলে উঠল মুসার বুক। এই বুদ্ধিটা তাহলে কাজে লাগতে যাচ্ছে। আরেকটা বুদ্ধি উদয় হয়েছে তার মাথায়। বলল, 'বাইরে বেরোবে নাকি আজ?'

'কেন?'

'না, এমনি। না বেরোলে এগুলো ডাকে দেবে কে? আমরা অবশ্য বেরোব। ইচ্ছে করলে ওগুলোর সঙ্গে তোমার চিঠিপত্রগুলোও আমাদের কাছে দিতে

পারো।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন মা। বললেন, 'ঠিক আছে নিয়ে যাস। কিন্তু আজ চঠিপত্রের ব্যাপারে অত আগ্রহ কেন সেটাও বুঝতে পারছি না।'

বেফাস কিছু বলে বিপদে পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এল মুসা আর ফারিহা। উভেজনায় দুরুদুরু করছে বুক।

নাস্তা করতে বসেছে সবাই, এই সময় মিসেস বিন এসে বলল, 'আপনার টেলিফোন, ম্যাম।'

ফোন ধরতে গেলেন মিসেস আমান। কয়েক মিনিট পর ফিরে এলেন।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে মুসার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন মা, এটা নজর এড়াল না মুসার। ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হলো তাঁর কাছে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না।

খওয়ার পর মুসা বলল, 'দাও এবার চিঠিগুলো। বেরোব।'

'ওই যে, টেবিলে রাখা আছে,' দেখিয়ে দিলেন মিসেস আমান।

ফারিহা আর মুসা দু-জনেই এগিয়ে গেল।

'বইটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

লিলির চিঠিটাও দেখতে পেল না মুসা।

মিসেস আমান বললেন, 'ওগুলো আর ডাকে পাঠানোর দরকার নেই। একজন শোক আজ তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। তার হাতেই দিয়ে দেব।'

'কে যাচ্ছে?' মুসা জানতে চাইল। আবদার ধরল, 'মা, তার সঙ্গে আমরা ও গাব। লিলিকে বজ্জড দেখতে ইচ্ছে করছে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কড়া দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস আমান। মাথা দোলালেন। 'তার মানে কোন ফন্দি আছে। যা সন্দেহ করেছিলাম। খবরদার বলে দিচ্ছি, লিলির কোন ব্যাপারে নাক গলাবি না। তোর দেখা করা লাগবে না। গা, বেরো। ইচ্ছে করলে চিঠিগুলো নিতে পারিস, না নিলে নেই। আমিই ফেলে আসতে পারব।'

চুপসে গেল দুই গোয়েন্দা। চিঠি না নিলে যদি মা'র আরও সন্দেহ হয় এই ভয়ে 'ওগুলো নিয়ে বিরস বদনে বেরিয়ে এল মুসা। সঙ্গে ফারিহা।

'এত চমৎকার দুটো বুদ্ধি মার খেয়ে গেল!' বেরিয়েই ফুঁসে উঠল মুসা, 'মা'টা গা, এবার মনে হচ্ছে কিছু করতে দেবে না!'

'কিশোরের কাছে যেতে হবে,' ফারিহা বলল। 'উপায় ঠিকই একটা বের করে গোলবে সে।'

শুনে গন্তীর হওয়ার পরিবর্তে খুশি হয়ে উঠল কিশোর। 'কাজটা সহজ করে দিল।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা।

'মানে লিলির সঙ্গে একজন লোকই দেখা করতে যেতে পারে যার নাম বলতে না তোমার আম্মা,' হাসল কিশোর। 'আমেলা ফগর্যাম্পারকট। এখন মামাদের কি করতে হবে জানি। জলদি রবিনকে খবর দাও। সে হয়তো তোমাদের গাঁড়তে গিয়ে বসে আছে।'

‘তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না,’ বিমৃঢ় হয়ে বলল মুসা। ‘কি করতে চাও?’

‘সময় হলেই দেখবে। রবিনকে বলবে, সাইকেল যেন নিয়ে আসে। তোমাদেরগুলো এনেছ তো?’

‘এনেছি।’

‘গুড়।’

১

ছয়

আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে ফগের বাড়ির কাছে এসে পাতাবাহারের-বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে রইল গোয়েন্দারা।

কয়েক মিনিট পর মিসেস জারগনকে আসতে দেখল। হাতে একটা প্যাকেট। কাছে এলে প্যাকেটটা চিনতে পারল মুসা আর ফারিহা। সেই বইটা, লিলি যেটা পড়তে দিয়েছিল। নিশ্চয় মুসার আম্বাৰ কাছ থেকে গিয়ে নিয়ে এসেছে মিসেস জারগন, ফগকে দেয়াৰ জন্যে। ফগ নিয়ে গিয়ে দেবে লিলিকে।

আরও দশ মিনিট পর বেরোল ফগ। সাইকেলে চেপে রওনা হলো।

কিশোর বলল, ‘তোমরা সব পিছে থাকো। সবাই একসঙ্গে পিছু নিলে চোখে পড়ে যেতে পারি।’

‘কিন্তু তুমি কোন দিকে গেলে জানব কি করে?’ রবিনের প্রশ্ন। ‘যদি হারিয়ে ফেলি?’

পকেট থেকে চক বের করে দেখাল কিশোর। ‘গাছের গায়ে তীর চিহ্ন এঁকে রেখে যাব। সেটা দেখে অনুসরণ করতে পারবে।’

মনে মনে আরেকবার কিশোরের প্রশংসা করতে বাধ্য হলো ফারিহা। সব যেন আগে থেকেই ভেবে রাখে কিশোর।

বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ফগকে অনুসরণ করে চলল কিশোর। পেছনে ফিরে তাকাল একবার। তার সহকারীদের দেখা যাচ্ছে না। মোড়ের ওপাশে রয়েছে। রাস্তার দু-পাশে এমন ঘন হয়ে গাছ জমেছে, বেশি দূর চোখে পড়ে না।

বোঢ়ো বাতাস বইছে। খুব দুলছে গাছের মাথা।

পেছনে একসঙ্গে এগোচ্ছে মুসা, রবিন আৱ ফারিহা। সামনে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না ওৱা।

এক জায়গায় এসে দু-ভাগ হয়ে গেল পথ। কোনদিকে যাবে? চকের চিহ্ন খুঁজতে লাগল ওৱা। গাছের গায়ে আঁকা তীরটা রবিনের চোখে পড়ল।

নির্দেশিত দিকে এগোল আবার ওৱা।

‘মনে হয় ডোভারভিল গায়ে থাকে লিলি,’ অনুমান কৱল মুসা।

ফারিহা এদিকে আসেনি আৱ। কোন কিছু চেনে না। সে দেখতে দেখতে

চলল।

পাহাড়ী উঁচুনিচু পথ ধরে গাঁয়ে এসে পৌছল ওরা। সামনে কিশোর বা ফগ, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

রাস্তার দু-ধারে গাছের মাথাগুলো নুয়ে এসে এমন করে লেগে গেছে, মনে হয় সবুজ একটা সুড়ঙ্গ।

সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বেরোতেই চোখে পড়ল কটেজটা। জানালায় লেখা::

এখানে লেমোনেড পাওয়া যায়

‘বাহ, চমৎকার!’ মুসা বলল। ‘এই জিনিসই খুঁজছিলাম। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ।’

‘কিন্তু লেমোনেড খেতে আসিনি আমরা এখানে,’ প্রতিবাদ করল রবিন। ‘কিশোর গেল কোথায় দেখা দরকার।’

তার কথার জবাবেই যেন রাড়ির আঙিনা থেকে ভেসে এল কোলাহল। কুকুর-বেড়ালের ঝাঙড়া, মুরগীর আতঙ্কিত ডাক, আর সেই সঙ্গে ফগের কর্কশ চিৎকার, ‘ঝামেলা! এই তোমার কুভা সরাও!’

বুৰাতে অসুবিধে রইল না কারও; ওই বাড়িতেই ছুকেছে ফগ। পিছে পিছে গেছে কিশোর। অন্য দিকে মনোযোগ ছিল, এই সুযোগে টিটু গিয়ে ঝাঙড়া বাধিয়েছে বাড়ির বেড়ালটার সঙ্গে। তারপর ফগকে দেখে তার পায়ে কামড়ে দিতে গেছে। ওই লোকটাকে দেখলেই পায়ে কামড়ানোর জন্যে খেপে যায় যেন কুকুরটা।

কিশোরের গলা শোনা গেল, ‘এই টিটু, আয়, আয় বলছি! চাবকে ছাল তুলে ফেলব।’

সাইকেল রেখে বেড়ার কাছে এগিয়ে গেল মুসা, রবিন আর ফারিহা।

আঙিনায় দাঁড়িয়ে কঠোর দৃষ্টিতে কিশোর আর টিটুর দিকে তাকিয়ে আছে ফগ। তার কাছে দাঁড়ানো একজন মহিলা, আর একটা মেয়ে। মেয়েটা ওদের পরিচিত, লিলি, ওকেই খুঁজতে এসেছে ওরা।

ছেলেমেয়েদের সবাইকে চোখে পড়ল, ফগের। খেঁকিয়ে উঠল, ‘এখানে কি তোমাদের?’

কঁকড়ে গেল মুসা, জবাব জোগাল না মুখে।

কিন্তু কিশোর ফগের পরোয়া করে না, জবাবও মুখে লেগেই থাকে। বলল, ‘গ্রামটা দেখতে এসেছি। গলা শুকিয়ে গেল। লেমোনেড পাওয়া যায়—লেখা দেখে চুকেছি।’

‘নাকি আমার পেছনে লেগেছ?’

‘আপনার পেছনে লাগতে যাব কেন? কিছু করছেন নাকি?’

‘ঝামেলা! যাও, ভাগো। আমি এখানে জরুরী কাজে এসেছি। এখানে জুলাতন কোরো না।’

‘আপনার কাজ আপনি করুন, জুলাতন করব কেন? আমরা তো লেমোনেড খেতে এসেছি। পয়সা দিয়ে লেমোনেড কিনে খেতে নিশ্চয় পুলিশের অনুমতি লাগে

না?’

এ কথার জবাব খুঁজে পেল না ফগ। বার দুই অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত ঝাঁকিয়ে, ‘ঝামেলা! ঝামেলা!’ করে পাশে দাঁড়ানো মহিলার দিকে ফিরল। বলল, ‘যা বলেছি মনে রাখবেন। এ সব কথা আর কাউকে বলবেন না। নতুন কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন।’

ছেলেমেয়েদের দিকে আরেকবার বিষ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে গটমট করে সাইকেলের দিকে হেঁটে গেল সে।

হাসতে হাসতে ভেতরে চুকল মুসা। কিশোরের কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, ‘সাবধানে থেকো। যে রকম চটান চটাও, কোন্দিন না তোমাকে খুন করে ফেলে ঝামেলা।’

অবাক হয়ে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে আছে লিলি আর তার খালা।

ছুটে গিয়ে লিলির হাত জড়িয়ে ধরল ফারিহা, ‘লিলি, তোমাকে দেখতে এলাম! না বলে তুমি এ ভাবে চলে এলে কেন? তোমার জন্যে খুব খারাপ লাগছিল।’

ফারিহাকেও জড়িয়ে ধরল লিলি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার খালা। বিরক্ত কঢ়ে বলল, ‘যে ঝামেলা শুরু হয়েছে, আজ আর দোকান খুলতে পারব না দেখছি! দেখি, আমি যাই। লিলি, রান্নাটা যেন সময়মত শেষ হয়। আর পুলিশের লোকটা যা বলে গেল যেন মনে থাকে।’

পুরানো একটা হ্যাট মাথায় পরে, শ্বার্ফ গলায় জড়িয়ে কটেজের বাইরের একটা ঘরের দিকে চলে গেল মহিলা। বদমেজাজী মহিলাটা চলে যাওয়ায় স্বত্ত্বার নিঃশ্বাস ফেলল গোয়েন্দারা। শান্তিতে কথা বলতে পারবে লিলির সঙ্গে।

কিশোরকে দেখেনি আর লিলি। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মুসা।

ফারিহা বলল, ‘লিলি, আমরা জেনেছি একটা ঘটনা বিপদে ফেলে দিয়েছে তোমাকে। আমরা সাহায্য করতে এসেছি।’

ওদের আন্তরিকতা মন ছুঁয়ে গেল লিলির। নিয়ে এল বারান্দার কোণের ছোট একটা ঘরে। কোন্দ ড্রিংক এনে দিল।

সমস্যাটার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চোখে প্রায় জল এসে গেল লিলির। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, ‘বাধ্য হয়ে এখানে এসেছি। খালা আমাকে পছন্দ করে না। কিন্তু গ্রীনহিলসে এখন ফেরত যাওয়াও স্বত্ব নয়।’

‘কেন?’ জানতে চাইল কিশোর।

‘বলতে মানা করা হয়েছে আমাকে।’

‘দেখো লিলি, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই। গোপন কথা, যত গোপনই হোক আমাদের বলতে পারো। কাউকে বলব না আমরা।’

‘আমাকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না।’ এক চোখের পান্তি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল তার।

‘কেন? এমন কি হয়েছে?’ কোমল স্বরে বলল রবিন। ‘বলেই দেখো কিছু

করতে পারি কিনা?’

হাত দিয়ে চোখের পানি মুছল লিলি। দ্বিধা করল। তারপর বলল, ‘একটা পাপ করেছিলাম, তার জন্যে এখনও আমার অনুশোচনা হয়। শোধরানোর জন্যে একটা হোমে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল আমাকে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে আর কখনও খারাপ কাজ করব না। হোম থেকে বেরিয়ে তাই গ্রীনহিলসে গিয়ে মুসাদের বাড়িতে চাকরি নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে...আমাকে...’

আবার কেঁদে ফেলল লিলি।

‘তারপর?’ কোমল কণ্ঠে অনুরোধ করল কিশোর, ‘থেমো না, লিলি, বলে যাও।’

‘তারপর...তারপর...’ ফোপাতে শুরু করল লিলি, ‘আমাকে একটা উড়োচিঠি দিল কে জানি! তাতে লেখা: সে নাকি আমার কথা সব জানে। যেখানে চাকরি করছি সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নইলে সব ফাঁস করে দেবে।’

‘কে দিয়েছে কিছুই আন্দাজ করতে পারো না, না?’

‘না। মিসেস বিনের সামনে খুলে ফেলেছিলাম, সে-ও দেখে ফেলল। আমার দুঃখে দুঃখিত হলো। বলল ওটা মুসার আমাকে দেখাতে। তিনি একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন। চিঠিটা দেখালাম তাকে। আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন তিনি। আমাকে বললেন, কয়েক দিন খালার কাছে এসে থাকতে। ইতিমধ্যে পুলিশকে দিয়ে এর একটা বিহিত করাবেন। থাকতে খুব একটা অসুবিধে হত না আমার, খালা যদি এখানে ভাল ব্যবহার করত।’

‘তোমার মা-বাবার কাছে চলে যাও না কেন?’ ফারিহা বলল, ‘ওদের কাছেই তো সবচেয়ে ভাল থাকবে।’

‘যেতে পারব না,’ আরও বিষণ্ণ হয়ে গেল লিলি।

‘কেন? তারা কি বেঁচে নেই?’

‘আছে। জেলখানায়।’ আবার কাঁদতে লাগল লিলি। ‘কোনকালেই ওরা ভাল ছিল না। চুরিদারি নানা রকম অপরাধ করে জেলে গেছে। ওরাই চুরি করা শিখিয়েছিল আমাকে। একদিন একটা দোকানে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লাম। হোমে পাঠিয়ে দেয়া হলো আমাকে। ভাল হতে চাইলাম আমি। হোম থেকে বেরিয়ে একটা খারাপ কাজ করিনি আর। করবও না। আমি ভাল থাকতে চাই। এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চাই।’

‘অবশ্যই পাবে,’ জোর গলায় বলল কিশোর। ‘উড়োচিঠি দিয়ে যে তোমাকে বিপদে ফেলেছে সে সাংঘাতিক খারাপ লোক। তাকে আমরা ছাড়ব না।’

অনেকটা শান্ত হুলো লিলি। ‘শুধু আমাকেই না, গ্রীনহিলসের আরও একটা মেয়েকে এ রকম চিঠি দিয়েছে। মিস কোয়েলারের বাড়িতে চাকরি করে সে। মেয়েটা আমার বন্ধু, নাম নরিনা। ও আমার চেয়ে অনেক সাহসী, ভেঙে পড়েনি। আমাকে বাদে আর কাউকে বলেনি চিঠির কথা।’

‘কবে বলেছে?’

‘আমি মুসাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার প্র।’

‘ফগর্যাম্পারকটকে এ কথা বলে দিয়েছ?’

‘হ্যাঁ। পুলিশের লোক, বলাই উচিত। বলল, আজকেই নরিনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সন্তব পাকড়াও করবে অপরাধীকে।’ দু-হাতে মুখ ঢাকল লিলি। ‘উফ, আমি যে কি করব এখন! গ্রীনহিলসে আর যেতে পারব না। লোকে সব জেনে যাবে। মুখ দেখাব কি করে!’

‘জানার আগেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। তোমার চিঠিটা কোথায়?’

‘মুখ তুলল লিলি। ‘মিস্টার ফগকে দিয়েছি। বলল, নরিনারটাও নিয়ে নেবে। এগুলো নাকি মূল্যবান সূত্র।’

খররুটা আচমকা ধসিয়ে দিল যেন কিশোরকে। হতাশা চাপা দিতে পারল না সে। একটিমাত্র সূত্র, যেটার আশায় এসেছিল, সেটাও গেল!

সাত

কেন এমন হয়ে গেল কিশোর, কি এমন অন্যায় করে ফেলেছে লিলি বুঝতে পারল না।

তাকে বুঝিয়ে বলল কিশোর, কেন হতাশ হয়েছে।

মাথা নাড়তে নাড়তে লিলি বলল, ‘তাহলে তো চিঠিটা দেয়া ঠিক হয়নি। ঠিক আছে, আজ বিকেলে নরিনার সঙ্গে দেখা করতে ঘাওয়ার কথা আছে আমার। ফগের কাছ থেকে চিঠিটা চেয়ে নিয়ে আসব। তোমাদের দেখাব এ কথা বলব না।’

‘খুবই ভাল হয় তাহলে। চিঠিটা আমাদের বাড়িতে দিয়ে এসো। আমি থাকব।’

বাড়ির ঠিকানা দিল কিশোর।

লিলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা।

বিকেল থেকেই বাড়ির গেটের কাছে বসে রইল কিশোর। লিলি আর আসে না। সন্ধ্যা হলো। অস্ত্রি হয়ে গেল কিশোর। তবে কি চিঠিটা দেয়নি ফগ?

অন্ধকার হয়ে গেল। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? ঘরে চোকার কথা ভাবছে কিশোর, এই সময় দেখল হনহন করে হেঁটে আসছে কে যেন। এগিয়ে গেল সে।

লিলিও এসেছে!

‘এত দেরি করলে?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘কি করব। সেই কখন থেকে বসে আছি মিস্টার ফগের বাড়িতে। কোথায় যে বেরিয়েছে, আসার নামই নেই। শেষে তার টেবিল থেকে এগুলো তুলে নিয়ে এসেছি। নাও।’

রবার ব্যান্ডে বাঁধা কয়েকটা খাম বাড়িয়ে দিল লিলি।

নিল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, ‘ফগের বাড়িতে কেউ দেখেনি তোমাকে?’

‘না। দরজা খোলা ছিল। চুকে বসার ঘরে বসেছিলাম অনেকক্ষণ।’

‘বেরোতেও দেখেনি কেউ?’

‘মনে হয় না।’

‘হঁ। এগুলো পাওয়াতে সুবিধে হবে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, লিলি।’

‘আর দেরি করতে পারছি না। খালার ওখানে ফিরে যেতে হবে আমাকে।

চলি। দরকার পড়লে দেখা কোরো।’

‘আচ্ছা।’

অঙ্ককারে মিলিয়ে গেল লিলির পদশব্দ।

চিন্তিত মনে ঘরে ফিরল কিশোর। লিলি যে কাজটা করে এসেছে, মোটেও ঠিক হয়নি। ফগ যদি জানতে পারে চিঠিগুলো তার ঘর থেকে চুরি করেছে লিলি, ত্যানক বিপদে পড়ে যাবে মেয়েটা। এটা তাকে বলেনি কিশোর, আরও বেশি ভয় পেয়ে যাবে বলে।

চিঠিগুলো দেখার পর যে কোন উপায়ে আবার ফগের কাছে ফেরত দিতে হবে, ডাবল সে। কোন ভাবেই ফগকে বুঝতে দেয়া চলবে না যে ওগুলো তার টেবিল থেকে চুরি হয়েছে।

তাড়াতাড়ি করতে হবে।

সোজা নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। মোট পাঁচটা চিঠি। এতগুলো এনেছে কেন লিলি? আনার কথা তো একটা, নরিনারটা ধরলে বড় জোর দুটো। অন্যগুলো কার? হাতের কাছে যা পেয়েছে সবই নিয়ে এসেছে বোধহয় মেয়েটা। বোকামি করেছে। মন্ত বোকামি। ফগ জানতে পারলে... যাতে না জানে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘরে এসে চিঠি পরীক্ষা করতে বসল সে। দেখে অবাক হলো, পাঁচটা চিঠিই উড়োচিঠি। বড় বড় করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লেখা। বিভিন্নজনকে। সত্ত্বর বছরের এক বৃন্দকেও লেখা হয়েছে একটা। তার নাম মিস্টার হ্যারিসন। গ্রীনহিলসেই থাকে।

কয়েকটা মূল্যবান তথ্য জানা গেল চিঠিগুলো থেকে:

*সব ক'টা চিঠি গ্রীনহিলসের লোককে লেখা;

*পোস্ট করা হয়েছে ডিয়ারহিলস থেকে;

*প্রতিটি চিঠি ডাকবাসে ফেলা হয়েছে সোমবারে।

আর কিছু দেখার নেই। তথ্যগুলো নিয়ে গবেষণা পরেও করতে পারবে, আপাতত চিঠিগুলো জায়গামত রেখে আসা দরকার।

ছদ্মবেশ নিতে শুরু করল সে। কাজ সেরে উঁকি দিয়ে দেখে এল মেরিচাচী কি করছেন। বসার ঘরে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছেন।

মুচকি হাসল কিশোর। সারা বছর ইয়ার্ডের কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গাধন একেবারে অলস সময় কাটাচ্ছেন। এখনকার এই মানুষটিকে দেখলে কেউ ক্ষমনাই করতে পারবে না, দিনে রাতে কি পরিমাণ খাটিতে পারেন তিনি। এবং খাটিয়ে মারেন ইয়ার্ডের প্রতিটি লোককে।

রোজ সক্ষ্যায় স্থানীয় সরাইখানায় ডার্ট খেলতে যায় ফগ, জানা আছে কিশোরের। বাড়ি থাকে খালি। সেই সুযোগে চিঠিগুলো রেখে আসার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কিন্তু আসতে দেরি করে ফেলেছে। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে ফগ।

দ্রুত চিন্তা করে নিল কিশোর। সোজা গিয়ে ধাক্কা লাগাল ফগের গায়ে। আরেকটু হলে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল তাকে।

‘অ্যাই, কে, কে!’ বলে চিৎকার করে উঠল ফগ। ‘চোখে দেখতে পাও না!'

‘মাপ করবেন, স্যার,’ হাতজোড় করে বলল টেলিগ্রাফ-বয়ের ছদ্মবেশী কিশোর। ‘মাপ করে দেবেন। ইদানীং কি যে হয়েছে আমার, মানুষের সঙ্গে খালি ধাক্কা লাগে। আমি সত্যি দুঃখিত, স্যার।’

এত কাকুতি-মিনতির পর আর কিছু বলার থাকে না। ফগ বলল, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখে চলবে।’

‘থ্যাংক ইউ, স্যার। এখন থেকে রাতে টর্চ না জ্বলে আর পথ চলব না,’ বলে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর। মাটিতে টর্চের আলো ফেলে দেখছে। ডাক দিয়ে বলল, ‘স্যার, শুনুন, শুনুন। এগুলো বোধহয় আপনার।’

ফিরে তাকাল ফগ। চিঠিগুলো দেখে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ‘এখানে এল কি করে! সঙ্গে নিয়ে তো বেরোইনি!'

‘তাহলে কি অন্য কারও? ঠিক আছে, খোঁজ করতে হবে।’

‘না না, দাঁড়াও,’ থাবা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে নিল ফগ। ‘এগুলো আমারই।’

‘পকেট থেকে পড়ল নাকি?’

‘হবে হয়তো,’ অনিশ্চিত শোনাল ফগের কষ্টস্বর।

আর দাঁড়াল না কিশোর। সরে গেল।

চিঠিগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল ফগ, এখানে এল কি করে? সাথে নিয়ে বেরোয়নি, এটা ঠিক। নাকি বেরিয়েছিল, মনে করতে পারছে না আর এখন? কি জানি! মাথাটাই গুলিয়ে যাচ্ছে না তো! স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

বাড়ি ফিরে বাসের টাইম টেবল, ম্যাপ আর রেফারেন্স বই খুলে বসল কিশোর। জানতে পারল, গ্রীনহিলস থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে একটা গ্রাম আছে, সেটার নাম ডিয়ারহিলস। সোমবারে হাট বসে সেখানে। পাহাড়ী এলাকা। বাস চলাচল আছে, তবে খুব কম। সোমবারে সকাল ১০-১৫ মিনিটে একটা বাস ছাড়ে গ্রীনহিলস থেকে, ডিয়ারহিলসে পৌছায় ১১-০১ মিনিটে। অনুমান করল, গ্রীনহিলস থেকে কেউ গিয়ে যদি ওখানে চিঠি পোস্ট করতে চায়, তাহলে এই বাসেই যায়। এমন হতে পারে, ডিয়ারহিলসে বিশেষ কোন কাজ থাকে তার সোমবারে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যায়—চিঠি পোস্ট করে, কাজও সারা হয়ে যায়।

সুতরাং সোমবার সকালে ডিয়ারহিলসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

আট

পরদিন সকালে উঠেই বন্ধুদের খবরটা জানাতে ছুটল কিশোর। কিন্তু সোমবারের আগে কিছুই করার নেই এ ব্যাপারে। তাই কেবল আলোচনার পর আলোচনা চলল।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মাঝে সোমবার সকাল এল। দল বেঁধে বাস স্টপেজে চলল ওরা।

‘ওই যে, বাস আসছে,’ ফারিহা বলল। ‘অনেকেই তো উঠে বসে আছে।’
‘স্টেশন থেকে উঠেছে,’ বলল রবিন। ‘চলো, উঠি।’

স্টপেজে থামল বাস। হড়াহড়ি করে উঠে পড়ল ছেলেমেয়েরা।

যাত্রী মোট পাঁচজন। একজনের ওপর চোখ পড়তে থমকে গেল ওরা।
লোকটাও গোল চোখ বড় বড় করে ফেলল।

আর কেউ নয়, স্বয়ং ফগর্যাম্পারকট!

‘সর্বনাশ!’ ভাবল কিশোর। ‘এই লোক বাসে কেন? সে-ও কি ডিয়ারহিলসে
চলেছে? ওদের মত একই উদ্দেশে? তারমানে যতটা বোকা ওকে ভাবি, ততটা ও
নয়!'

আগেই কথা হয়েছে, বাসে উঠে যাত্রীদের ওপর কড়া নজর রাখবে
গোয়েন্দারা। কে কোথায় নামে, কি করে দেখবে। সুযোগ থাকলে পাশে বসে
ওদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে।

পুরো বাসই প্রায় খালি। যেখানে ইচ্ছে বসতে পারে ওরা। ফগের পাশে বসার
ইচ্ছে কারও নেই। টিটু তো লোকটাকে দেখেই খেপে গেল। কিশোরের হাত থেকে
ছুটে গিয়ে কামড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল।

মহাবিরক্ত হয়ে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে ফগ বলল, ‘এখানে তোমাদের
কি? যেখানেই যাই এ ভাবে জঁকের মত লেগে থাকো কেন?’

‘আমরা ডিয়ারহিলসের হাট দেখতে যাচ্ছি, মিস্টার ফগ...’

‘ফগর্যাম্পারকট!’

‘ও হ্যাঁ, ফগ। সরি...’

‘ফগর্যাম্পারকট!’

‘পুরোটা বলতে মনে থাকে না। হ্যাঁ, মিস্টার ফগর্যাম্পারকট। আপনার রেগে
যাওয়ার কিছু নেই। বেআইনী কিছু করছি না আমরা। আপনি যাচ্ছেন কেন?’

‘সেটা আমার ব্যাপার!’ রাগে ফুঁসে উঠল ফগ। টিটুর দিকে তাঁকাল, ভয়ে
ওয়ে। যতটা স্বত্ব সরিয়ে নিল পা।

ফগকে বাদ দিয়ে বাসে লোক আছে চারজন। ইচ্ছে করলে প্রত্যেকের পাশে

একজন করে বসতে পারে গোয়েন্দারা।

‘চারজনের তিনজনকেই চেনে ওরা। একজন মুসাদের পাশের বাড়ির লেডি ঝুরগাননের অ্যাসিস্টেন্ট মিস টোমার। নাক থেকে খালি চশমা খুলে খুলে পড়ে তার। সেটা দেখতে খুব ভাল লাগে ফারিহার। কয়বার পড়ল শুণতে আরও ভাল লাগে।

এই মহিলা উড়োচিঠির লেখক হতেই পারে না। তার সঙ্গে পরিচয় আছে ওদের।

দ্বিতীয় মহিলা মিসেস হ্যাগ। মিষ্টির দোকানের মালিক। সুন্দর ব্যবহার। ভাল মানুষ বলেই জানে গোয়েন্দারা। ওকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়।

বাকি দু-জন অবশ্য সন্দেহজনক। একজনের হালকা-পাতলা শরীর, চোয়াল বসা, গভীর হয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। মাঝে মাঝে নাক কুঁচকাচ্ছে। মুদ্রাদোষ। ফারিহার মনে হলো এই লোককে দিয়ে যে কোন খারাপ কাজ সম্ভব।

বাকি রইল একটা মেয়ে। বয়েস আঠারো মত হবে। সুন্দর চেহারা। কোঁকড়া চুল। হাতে ছবি আঁকার সরঞ্জাম। এই বয়েসী মেয়েরা অনেকু সময় বোকার মত কাজ করে বসে। একে সন্দেহ করা যেতে পারে।

তবে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয় গোমড়ামুখো লোকটাকে। তার পাশে বসল কিশোর।

রবিন বসল মিস টোমারের পাশে। ফারিহা বসল মিসেস হ্যাগের পাশে, আর মুসা মেয়েটার।

‘গুড মরনিং, মিস টোমার,’ কথা শুরু করল রবিন। ‘অনেক দিন দেখা হয় না।’ হাটে যাচ্ছেন? ডিয়ারহিলসের নাম শুনেছি অনেক, যাওয়ার সুযোগ হয়নি।’

‘বাজারটা সত্যি সুন্দর, দেখার মত,’ নড়েচড়ে বসতে গিয়ে নাক থেকে চশমা খসে পড়ল মিস টোমারের। তুলে আবার জায়গা মত বসাল। মিসেস হ্যাগের সঙ্গে কথা বলার কথাই ভুলে গেল ফারিহা, তাকিয়ে আছে মিস টোমারের দিকে। সে গুণল, ‘একবার।’

‘আপনি প্রায়ই যান নাকি ওখানে?’ জিজেস করল রবিন।

‘নাহ। মাঝেসাবে। তোমার আম্বা কেমন আছেন?’

‘ভাল। আপনার আম্বা কেমন? আপনার সঙ্গে একবার দেখেছি, মনে আছে।’

‘না, শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।’

‘অসুখ? ও। তিনি ডিয়ারহিলসেই থাকেন?’

‘হ্যাঁ। রোজ তো দেখতে যেতে পারি না। সোমবারে আমার ছুটি থাকে, সেদিন যাই। কিছু দিন ধরে প্রতি সোমবারেই যেতে হচ্ছে।’

‘এই বাসেই?’

‘না, যখন যেটা ধরতে পারি।’

তারমানে মিস টোমার সন্দেহ থেকে বাদ, উড়োচিঠির লেখক নয়। কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে ইশারা করে সেটা বোঝাল রবিন।

ইতিমধ্যে ফারিহার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছে মিসেস হ্যাগ। কথা বেশির
গাগ মহিলাই বলছে, চকলেট আর ক্যান্ডি তৈরির কথা।

এক সময় জিজ্ঞেস করল ফারিহা, ‘ডিয়ারহিলসে বাজার করতে যান আপনি?’

‘হ্যাঁ। মাখন আর ডিম কিনতে। আমার বোনের ফার্ম আছে। তার কাছ থেকে
কিনলে অনেক সুবিধে, গ্রীনহিলসের চেয়ে সন্তোষ অনেক। মাখন মাপে বেশি দেয়,
ডিমও দেয় বড় বড় দেখে। তুমি কিনতে গেলে আমার কথা বোলো, তোমাকেও
বেছে বেছে দেবে।’

‘খুব ভাল মনে হচ্ছে তাকে।’

খুশি হলো মিসেস হ্যাগ। হাসল। ‘আসলেই ভাল।...আমার ব্যাগটা রাখলাম
কোথায়? এই যে, পেয়েছি।’ ব্যাগ হাতড়ে একটা প্যাকেট বের করল মহিলা। সেটা
থেকে ক্যান্ডি বের করে ফারিহাকে দিল, ‘নাও, খাও। পয়সা লাগবে না। এমনি
দিলাম।’

‘এত ভাল একজন মানুষ কখনোই উড়োচিঠি লিখতে পারে না,’ ভাবল
ফারিহা।

পাশে বসা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল মুসা, ‘ছবি আঁকতে যাচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ,’ হেসে জবাব দিল মেয়েটা। ‘ডিয়ারহিলস মার্কেটের ছবি। সকালে
ওখানে খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। হাঁস-মুরগী-ভেড়া, ডিম আর মাখনের দোকান,
আরও কত কিং।’

‘পোস্ট অফিসটা কোথায় চেনেন?’

আবার হাসল মেয়েটা। ‘না। যাই ছবি আঁকতে, পোস্ট অফিস দিয়ে কি
করব? পোস্ট অফিসের ছবি আঁকতে আমার ভাল লাগবে না। ছোট্ট জায়গা। নিচয়
কারও বাড়িতে অফিস বসে। আলাদা কোন পোস্ট অফিস আছে বলে মনে হয়
না।’

সন্তুষ্ট হলো মুসা। যে পোস্ট অফিসই চেনে না সে চিঠি পোস্ট করবে কি
করে? এই মেয়ে উড়োচিঠির লেখক নয়।

তার কাজ শেষ। বাসের অন্যান্য যাত্রীদের দিকে তাকাল মুসা। একটিমাত্র
খোককেই সন্দেহ করা যায় এখন। সে ওই গোমড়ামুখো লোকটা। চকিতের জন্যে
আরেকটা ভাবনা উদয় হলো তার মনে। আচ্ছা, ফগ এই কাজ করছে না তো!
চিঠি লিখে বেড়াচ্ছে না তো মানুষকে? পরক্ষণেই বেড়ে ফেলে দিল ভাবনাটা।
‘সন্তুষ্ট! এ হতে পারে না।’

নয়

খোকটার হাতের পত্রিকার দিকে তাকিয়ে কিশোরের মনে হলো ঘোড়া আর
গুরুরের খবর ছাড়া আর কিছু নেই ওটাতে।

লোকটার গোড়ালির কাছে শুঁকল টিটু। গন্ধটা মোটেও পছন্দ হলো না তার।

খোঁৎ খোঁৎ করে বার দুই নাক ঝেড়ে কয়েক সীটি সামনে বসা ফগের দিকে তাকাল লোলুপ দৃষ্টিতে ।

‘ইয়ে, স্যার,’ শুরু করল কিশোর, ‘আমার কুকুরটা নিশ্চয় আপনাকে বিরক্ত করছে না?’

জবাব দিল না লোকটা ।

কিশোর ভাবল, কানে কম শোনে । কঠম্বর চড়িয়ে বলল, ‘আমার কুকুরটা কি আপনাকে বিরক্ত করছে, স্যার?’

চোখমুখ কুঁচকে তাকাল লোকটা । ‘অত চিংকার করছ কেন? আমি কি কালা?’

কুকুরের কথা নিয়ে আলোচনার আর সাহস পেল না কিশোর । আরও আকর্ষণীয় কোন বিষয় দরকার । ‘ঘোড়া খুব মজার প্রাণী, তাই না?’

চুপ করে আছে লোকটা ।

জোরে জোরে আর বলবে কিনা দ্বিধা করতে লাগল কিশোর । কঠম্বর চড়িয়ে আবার ধমক খেতে চায় না । বলল, ‘ঘোড়া খুব মজার প্রাণী, আপনার কি মনে হয়, স্যার?’

‘হ্যাঁ,’ আবার পড়তে লাগল লোকটা ।

আলোচনা চালানোর সুযোগই দিচ্ছে না লোকটা । বাসের যাত্রীদের মধ্যে একেই অপরাধী বলে মনে হয় । অথচ এর সঙ্গেই কথা বল্য যাচ্ছে না । অপরাধীরা এমনই হয়, চালাক হয় ।

‘ক’টা বাজে, স্যার?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর ।

জবাব নেই ।

‘স্যার, সময়টা বলবেন?’ আবার বলল সে ।

‘না, বলব না । কারণ তোমার হাতেও একটা ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি, এবং সেটা চলছে।’

নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল কিশোরের ।

খানিক পর জানালা দিয়ে দেখিয়ে বলল, ‘দেখুন, দেখুন, একটা নতুন ধরনের এরোপ্লেন।’

‘থাকগে । আমার কি?’ জবাব এল । জানালার দিকে ফিরেও তাকাল না লোকটা ।

‘আমি ডিয়ারহিলসে যাচ্ছি, বাজার দেখতে । আপনিও যাচ্ছেন?’

জবাব নেই ।

কিশোরের ইচ্ছে হতে লাগল, টিউকে বলে লোকটার গোড়ালিতে কামড়ে দিতে, তাতে যদি খানিকটা মুখ খোলে লোকটা । গোফেন্ডাপ্রিতে মেজাজ খারাপ করলে চলে না, ধৈর্য ঠিক রাখতে হয়, নিজেকে বোকাল সে । একটা গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে বাস । জিজ্ঞেস করল, ‘এই গ্রামটার নাম কি?’

‘জানি না! আমি এখানে নতুন । ডিয়ারহিলসের কিছুই চিনি না । ওখানে আমার তাই থাকে । আমি গেলে আমাকে তুলে নেবে । তারপর আরও দূরে একটা জায়গায়

নিয়ে যাবে। তোমার মাথায় যত প্রশ্ন আছে সবগুলোর জবাব পেয়েছি দয়া করে বকবকানিটা বন্ধ করে আমাকে এবার রেহাই দেবে?’

সামনের সীট থেকে ফগের হাসি শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে বলল, ‘তুলে দিন ওখান থেকে, নাহলে রেহাই দেবে না। একেকটা ঝামেলার ডিপো এগুলো।’

‘ওঠো এখান থেকে! কিশোরকে ধমক লাগান লোকটা। কুড়াটাকে সরাও! নইলে লাখি মেরে দেব বাস থেকে ফেলে!’

ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু, যেন বুবো ফেলেছে লোকটাৰ কথা। তার দিকে তাকিয়ে কুঁকড়ে গেল লোকটা।

তার কাছ থেকে কথা আদায়ের আর কোন সন্তাবনা নেই। অহেতুক গওগোল না করে উঠে এসে একেবারে পেছনের সীটে বসল কিশোর। প্রচুর জায়গা আছে। মুসা, রবিন আর ফারিহাও চলে এল তার পাশে।

কে কি জেনেছে কিশোরকে জানাল ওরা।

নিচু স্বরে কিশোর বলল ওদের, ‘আমাদের অপরাধী এই বাসে নেই বলেই মনে হচ্ছে। গোমড়ামুখো লোকটাও নয়। নতুন লোক। গ্রীনহিলসের লোক চেনার কথা নায়। কে কোন বাড়িতে থাকে, অতীতে কি করেছিল, সে-সব জানার তো প্রশ্নই নাই না।’

‘প্রতি সোমবারেই আসে নাকি?’ মুসার প্রশ্ন।

‘ও কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ দেয়নি। আসে বলে মনে হয় না। তাহলে নেক কিছু চিনত।’

সামনের স্টপেজে থামল বাস। আরেকজন যাত্রী উঠল। তার দিকে একবার কায়েই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিল কিশোর। গির্জার পাদ্রী।

আরও কিছুদূর এগোনোর পর প্রায় খাড়া রাস্তা বেয়ে উঠতে লাগল বাস। অন্য পাশে এসে তেমনি খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। এগারোটা প্রায় বাজে। এগারহিলস এসে গেছে।

বড় বড় কয়েকটা গাছের নিচে বাস থামল। কানে এল হাঁস, মুরগী, ভেড়ার মিশ। কার আর মানুষের কথা বলা। হই-হট্টগোল হচ্ছে খুব। হাট বসেছে বোৰা যায়।

সবার আগে তাড়াহড়ো করে নেমে পড়ল গোয়েন্দারা। হাটের দিকে চলেছে নানান লোক। তাকে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিল পোস্ট অফিসটা।

দলবল নিয়ে দ্রুত সেদিকে এগোল কিশোর। নিচু স্বরে বলল, ‘ওধু আমি থেকে নানা দেব। একসঙ্গে সবাই থাকলে ফগের সন্দেহ হবে। তোমরা সব বাজার নানে চলে যাও।’

পোস্ট অফিসের কাছে ওধু ওধু দাঁড়িয়ে থাকলেও ফগের সন্দেহ হবে, তাই নানা খাম কিনে ঠিকানা লিখতে শুরু করল কিশোর। ভান করল কোথাও চিঠি। একটা চোখ রেখেছে বাসের যাত্রীদের দিকে।

মিসেস হ্যাগ চলে গেল বাজারে, তার বোনকে খুঁজতে।

মিসেস টোমার আর ছবি আঁকিয়ে মেয়েটার কেউই চিঠি পোস্ট করতে এল না। নানা পর্ফিসের ধারেকাছেও এল না দু-জনে।

পান্তী চলে গেল তার পথে ।

গোমড়ামুখো লোকটা অস্থির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বাস ফ্টেশনের কাছে ।
মিনিট দুয়েক পরে একটা গাড়ি এসে তুলে নিয়ে গেল তাকে ।

ফগ তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে । চোখে সন্দেহ ।

দেবেও দেখল না কিশোর । ফগ তাকেই উড়োচিঠির লেখক বলে সন্দেহ করছে
না তো? দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল মাথায় । খামটা বাস্তে ফেলতে গিয়ে যেমন চোখ পড়ল
ফগের ওপর, চমকে ওঠার ভান করল । পারলে যেন বাক্স থেকে আবার বের করে
নেয় চিঠিটা । কিন্তু সে-সুযোগ নেই । দ্বিধা করল এক মুহূর্ত । তারপর বারান্দা থেকে
নেমে আরেকবার ফগের দিকে তাকিয়ে রওনা হয়ে গেল বাজারের দিকে, বন্ধুদের
খুঁজতে ।

কোন লাভ হলো না ডিয়ারহিলসে এসে, সুন্দর একটা দিন কাটানো ছাড়া ।
উড়োচিঠির লেখকের কোন হাদিস করতে পারল না ।

শেষ বাসে গ্রীনহিলসে ফিরে চলল ওরা ।

দশ

পরদিন সকালে মুসাদের বাড়িতে জমায়েত হলো সবাই ।

আগের দিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনায় বসল ।

মুসার বাবা-মা বাড়ি নেই । জরুরী কাজে বাইরে গেছেন । একা কেবল মিসেস
বিন আছে । খানিক পর এসে মুসার ঘরে উঁকি দিল সে । বলল, ‘তোমরা থাকো ।
আমি বেরোচ্ছি । কসাই ব্যাটা এখনও মাংস পাঠাল না । রাঁধব কি? আমি যাই,
দেখে আসিগে কি হলো । বাড়ি খালি রেখে বেরোবে না কিন্তু । তোমরা বরং কসার
ঘরে গিয়ে খেলো । ফোনটোন এলে ধরতে পারবে ।’

মিসেস বিন বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই ফোন বাজল । মুসা গিয়ে ধরল ।

ওপাশ থেকে কথা বলল মিসেস জারগন । সাংঘাতিক একটা খবর দিল সে ।
তার বোনকে নাকি উড়োচিঠি দেয়া হয়েছে । অস্থির হয়ে পড়েছে তার বোন :
সেখানে তাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছে মিসেস জারগন । আজ আর মুসাদের বাড়িতে
কাজে আসতে পারছে না । মুসাকে অনুরোধ করল, মিসেস বিনকে যেন খবরটা
দিয়ে দেয় ।

মুসা জানতে চাইল, তার বোন চিঠিটা তাকে দেখতে দেবে কিনা?

মিসেস জারগন বলল, ‘জানি না । এ সব চিঠি তো লোকে দেখাতে চায় না ।
তবে বলে দেখতে পারি । তোমরা তো আবার গোয়েন্দা । লেডি অরগাননের
বেড়ালটা কি সুন্দর বের করে দিয়েছিলে । হয়তো এই উড়োচিঠির লেখককেও
ধরতে পারবে । তাহলে একটা কাজের কাজ হবে ।’

‘যাক, বুঝতে পেরেছেন। সেই জন্যেই তো আপনার সাহায্য চাইছি,’ তেল
দেশার সুরে বলল মুসা। ‘আপনার বোনের ঠিকানাটা বলুন? নাম কি? এখুনি রওনা
কী?’

ঠিকানা বলল মিসেস জারগন। লিখে নিল মুসা। যাকে চিঠি দেয়া হয়েছে তার
মাঝে মিসেস উইলমার।

টেলিফোনে মুসার কথা থেকেই অনেক কিছু আন্দাজ করে ফেলেছে কিশোর।
মাকটা শুনল মুসার মুখে। বলল, ‘তোমরা থাকো, আমি যাচ্ছি।’

‘আমি গেলে ক্ষতি কি?’ মুসা বলল।

‘তোমার বাড়িতে থাকা দরকার, খালি বাড়ি। আন্টি এসে তোমাকে না দেখলে
গান করতে পারেন। সবার একসঙ্গে যাওয়াও উচিত নয়। ফগের চোখে পড়ে যেতে
পারে। সে তো যাবেই ওখানে, জানা কথা।’

বাড়িটা খুঁজে বের করতে কষ্ট হলো না।

দরজা খুলে দিল মিসেস জারগন। ‘ও, তুমি এসেছ। মুসা এল বা?’

‘বাড়ি খালি। ও পাহারা দিচ্ছে।’

‘এসো। ভেতরে এসো।’

মিসেস উইলমার মোটাসোটা মহিলা। সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। চোখ লাল,
চামড়াশ ফুলে আছে। মাথায় হাত দিয়ে মুখ মলিন করে বসে আছে।

কিশোরকে বলল মিসেস জারগন, ‘চিঠিটা দেখতে এসেছে তো? আমি বলেছি
আমার বোনকে। দেখাতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু এ চিঠি বড়দের, তোম্যকে
দেখানো যাবে না।’

খুব হতাশ হলো কিশোর। ‘ঠিক আছে পড়ব না। শুধু হাতের লেখাটা
দেখব।’

মাথা নাড়ল মিসেস উইলমার, ‘না, তা-ও দেখানো যাবে না। সত্যি
গুরুত্ব, দেখানোর মত হলে দেখাতাম। তুমি অনেক ছোট। বড় হলে দেখাতে
শার্শ তাম।’

‘ও। খামটা দেখাতে কোন আপত্তি আছে?’

‘না, তা নেই।’

খামটা বের করে দিল মিসেস উইলমার।

আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে নিল কিশোর। অবাক হলো। ‘কোনো পোস্ট মার্ক
কী? বিড়বিড় করে বলল, ‘ডাকে আসেনি! কে দিয়ে গেল?’

‘জানি না,’ মিসেস উইলমার বলল। ‘সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে দরজার কিংচিৎ^{কিংচিৎ}
কে যেন ফেলে দিয়ে গেছে। টের পেয়েছি ঠিকই, ভেবেছি খবরের
গান্ধাজওয়ালা। তাই বিছানা থেকে উঠলাগ্ন না। সাড়ে আটটার সময় উঠে দেখি
কিংচিৎ। তাড়াতাড়ি আমার বোনকে ফোন করলাম,’ মিসেস জারগনকে দেখাল
নি।

মিসেস জারগনের দিকে তাকাল কিশোর, ‘মিস্টার ফগকে জানিয়েছেন?’
‘নিশ্চয়।’

সৰ্তক হলো কিশোৱ। এখানে আৱ কিছু দেখাৰ নেই। ফগ চলে আসাৱ
আগেই কেটে পড়াৰ তাগিদ অনুভব কৱল। খামেৰ ওপৱেৱ ঠিকানা আৱেকৰাৰ
ভালমত দেখল। আগেৱ পাঁচটা খামে যে হাতেৱ লেখা দেখেছে এটাতেও ঠিক একই
রকম। বড় বড় কৱে লেখা পেঁচানো পেঁচানো অক্ষৰ।

খামটা মিসেস উইলমাৱকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
আমি এখন যাই। চিন্তা কৱবেন না মিসেস উইলমাৱ, এ চিঠি যে লিখেছে তাকে
আমৱা ধৰবই। আমাদেৱ ওপৱ ভৱসা কৱতে পাৱেন।’

‘নিশ্চয় কৱবে,’ মিসেস জারগন বলল। ‘তোমৱা যে খুব ভাল গোয়েন্দা আমি
বলেছি আমাৱ বোনকে। সেবাৰ লেডি অৱগাননেৱ বেড়ালটা যে ভাবে বেৱ কৱে
দিলে সত্যি আশৰ্য্য।’

. মিসেস জারগনকেও ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল কিশোৱ।

সবে দৱজা খুলে বেৱিয়েছে, আৱ অমনি একেবাৱে বাঘেৰ মুখে।

দৱজাৰ বেল বাজাতে হাত বাড়িয়েছিল ফগ। কিশোৱকে দেখে থমকে গেল।
পৰক্ষণেই থাবা দিয়ে চেপে ধৱল হাত, ‘ঝামেলা! এখানে কি?’

কিশোৱও সামলে নিল। ‘ছাড়ুন ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন! ব্যথা লাগছে।’

‘এখানেও এসেছ নাক গলাতে! কেন এসেছ, বলো?’

‘ও নাক গলাতে আসেনি,’ দৱজাৰ কাছ থেকে জবাৰ দিল মিসেস জারগন।
‘চিঠিটাৰ কথা শুনে দেখতে এসেছ। খারাপ কিছু কৱেনি।’

কঠিন দৃষ্টিতে কিশোৱেৱ দিকে তাকাল ফগ। ‘কাল তোমাকে ডিয়াৱহিলসেৱ
পোস্ট অফিস থেকে চিঠি পাঠাতে দেখেছি? কাৱ কাছে পাঠিয়েছি?’

‘সেটা আপনাৰ ব্যাপার নয়। যাব কাছে ইচ্ছে চিঠি পাঠাতে পাৱি আমি।’

‘সাবধানে কথা বলবে।’ থমকে উঠল ফগ। ‘যেখানে ইচ্ছে পাঠাতে তুমি
পাৱো না! মানুষেৱ শাস্তি নষ্ট কৱাৰ কোন অধিকাৱ তোমাৱ নেই! যদি বলি মিসেস
উইলম’বকে উড়োচিঠি তুমিই লিখেছি?’

‘তাহলে হদ্দ বোকা প্ৰমাণিত হবেন…’

‘খবৱদাৱ!’

‘শুধু শুধু ছেলেটাকে ধমকাচ্ছেন কেন?’ মিসেস জারগন বলল। ‘ও এ সব
লিখতে যাবে কেন? তা ছাড়া ডাকে আসেনি ওটা।’

‘ডাকে আসেনি!’

‘না,’ মাথা নাড়ল মিসেস জারগন। ‘কে জানি দৱজাৰ ফাঁক দিয়ে ফেলে
গেছে।’

কিশোৱকে ফাঁসাতে পাৱল না বলে বড়ই হতাশ হলো ফগ। ‘ঝামেলা! তাই
নাকি?’ আপনাআপনি কিশোৱেৱ হাত থেকে আঙুলগুলো খুলে গেল তাৱ। ‘চলুন
তো, দেখি।’

কিশোৱও আৱ দাঁড়াল না ওখানে। হাসিমুখে সাইকেলেৱ দিকে রওনা হলো।
বোকা বানাতে চেয়েছিল ফগকে, সফল হয়েছে। আগেৱ দিন তাকে ডিয়াৱহিলসে
চিঠি পোস্ট কৱতে দেখে ঠিকই সন্দেহ কৱেছে—উড়োচিঠি লেখা কিশোৱেৱ কাজ।
কিন্তু ফগ তো আৱ জানে না, নিজেৱ নামেই গতকাল খামটা পোস্ট কৱেছিল সে।

“...রে চিঠিপত্র কিছু ছিল না।

বাগারো

গোদের বাড়িতে ফিরে এল কিশোর।

ফগের বোকা বনার কাহিনী শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই। অবাক হো। চিঠিটা ডাকে আসেনি শুনে।

রবিন বলল, ‘তারমানে কোনো কারণে গতকাল ডিয়ারহিলসে যায়নি চিঠি যে আছে। কিংবা হয়তো টের পেয়ে গেছে, অথবা কোনো ভাবে জেনে গেছে আমরা যা ফগ সোয়া দশটার বাসে করে যাব। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আর তাই নাহান। আজ সকালে নিজেই গিয়ে চিঠিটা দিয়ে এসেছে মিসেস উইলমারের বাড়তে।’

‘হ্যাঁ, এটা হতে পারে,’ একমত হলো কিশোর।

‘আচ্ছা, একটা কাজ তো করতে পারি আমরা,’ উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। গোয়া দশটার বাসের কভাকটারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি, সোমবারে গোনাহিলস থেকে নিয়মিত কে কে ডিয়ারহিলসে যায়।’

‘না, সেটা উচিত হবে না। হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে তাকে। তা ছাড়া আপনে ভাল উপায় যখন আছে, তার কাছে যাব কেন?’

‘কি? কি উপায়?’ প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, মুসা আর ফারিহা।

হাসল কিশোর। ‘মিস টোমার নিয়মিত ডিয়ারহিলসে যায়। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি সোমবারে আর কেউ যায় কিনা।’

‘ঠিক, ঠিক! আবার একসঙ্গে বলল তিনজনে।

‘চলো, এখুনি,’ তর সহচে না মুসার।

‘কিন্তু বাড়ি খালি...’ বলতে গেল কিশোর।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ফারিহা বলল, ‘ওই যে, মিসেস বিন আপনেছে।’

বেরোতে আর কোন বাধা নেই। টিটুকে ছাউনিতে আটকে রেখে দেয়াল পেকে লেডি অরগাননের বাগানে চলে এল ওরা।

তাগ্য ভাল, মিস টোমারকে বাগানেই পাওয়া গেল। দামী বেড়ালগুলোকে আশোনা করে যে মেয়েটা, আইলিন, তার সঙ্গে কথা বলছে।

ছেলেমেয়েদের সাড়া পেয়ে ঝটকা দিয়ে মাথা ঘোরাতে গিয়ে নাক থেকে চশমা পড়ল মিস টোমারের।

সঙ্গে সঙ্গে গুণল ফারিহা, ‘একরার।’

‘তোমরা?’ মিস টোমার বলল। ‘এসো, এসো। ড্যাফোডিলগুলো যে ফুটেছে

দেখতে এসেছে বুঝি?’

‘না, আমরা...’ বলতে গিয়ে গোড়ালিতে কিশোরের লাথি খেয়ে আঁউ করে উঠল মসা। চুপ হয়ে গেল।

প্রশ্নিয়ে গেল কিশোর, ‘ফুলগুলো নিশ্চয় খুব সুন্দর?’

‘হ্যাঁ, খুব,’ জবাব দিল মিস টোমার। ‘এসো, দেখাব।’

হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, ‘আপনার আম্মা কেমন আছেন?’

‘ভাল না,’ আলতো হেঁচট খেলো মিস টোমার। গেল নাক থেকে চমশা খসে। ফারিহা জোরে জোরে গুণল দুই। তার দিকে তাঁকাল মহিলা। বিরক্ত হলো মনে হলো, তবে কিছু বলল না। ‘তবে আমাকে দেখে আম্মা খুব খুশি হয়েছে।’

‘ডিয়ারহিলস জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর,’ আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল কিশোর। ‘আপনার ভাল লাগে না?’

‘লাগে।’

‘অনেকেরই লাগে মনে হয়। বাসে করে আরও অনেকেই তো যায় দেখলাম। যারা যায় সবাইকে চেনেন নাকি?’

‘না, সবাইকে চিনি না। অনেক অচেনা লোকও যায়। কাল যেমন গিয়েছে একজন।’

কার কথা বলল মিস টোমার বুঝতে পারল কিশোর, গোমড়ামুখো লোকটা।

‘তবে গ্রীনহিলস থেকে যারা যায়, তাদেরকে চিনি। সোমবারে নিয়মিত যায় তিনজন, কাল অবশ্য তাদের একজনও যায়নি।’

‘তারা কারা?’

কিশোরকে অতটী আগ্রহী হতে দেখে থমকে দাঁড়াল মিস টোমার। নাক থেকে চশমা খসে পড়ল। ফারিহা ও গুণল, ‘তিনি! এইবার চটে গেল মিস টোমার। বলল, ‘এত গোগো কেন?’

লজ্জা পেয়ে কুঁকড়ে গেল ফারিহা। মিস টোমার যে এ ভাবে রেগে যাবে ভাবেনি। বলল, ‘সরি! আর গুণব না।’

‘তারা কারা, মিস টোমার?’ আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘আবার কি কোনো নতুন কেস পেয়েছে?’ পালটা প্রশ্ন করল মিস টোমার।

‘না না,’ তাড়াতাড়ি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর, ‘কেস নয়। জানতে চাইছি আমরা তাদের চিনি কিনা?’

‘কি জানি, না-ও চিনতে পারো। একজনের নাম মিস ব্যাটার। দরজি। মেয়েদের পোশাক বানায়। পোশাক বেচতে যায় ডিয়ারহিলসের বাজারে।’

‘ও। আপনার বন্ধু নাকি?’

‘আরে নাহ! ও কারও বন্ধু হতে পারবে না। খালি মানুষের গোপন কথা খুঁজে বেড়ায়, বদনাম ছড়ায়, এর কথা ওর কাছে বলে, ওর কথা তার কাছে। আমার একেবারে ভাল লাগে না এই স্ফুরণ।’

হ্যাঁ, এই মহিলার পক্ষে উড়োচিঠি লেখা স্বত্ব—ভাবল গোয়েন্দারা।

‘ওই দেখো, কি রকম ফুটেছে,’ ড্যাফেডিলগুলো দেখা যেতে বলল মিস

টোমার। 'শুব সুন্দর, না?'

'দাকুণ!' রুবিন বলল। 'সত্যি সুন্দর।'

সবাইকে নিয়ে ঘাসের ওপর বসল মিস টোমার।

কিশোর বলল, 'মিস ব্যাটারের কথা বলুন। আর কি জানেন তার সম্পর্ক?'

'লেডি অরগাননের পোশাক বানানোর প্রয়োজন হলে তাকে খবর দেয়া হয়। আসে; এসেই শুরু করে এর-ওর বদনাম। কথা বলতে গেলেই যন্ত্রণা। এমন সব পর্যাকৃত করবে, জবাব দিতে গেলে মানুষের কুৎসা হয়ে যাবে। এ হণ্ডায় আসার কথা আছে। ও বাড়িতে চোকার আগেই পালাব আমি। কে যায় ফালতু প্যাচাল পাঠতে।'

'ওকে আপনি দেখতে পারেন না,' ফারিহা বলল।

নাক কুঁচকাতে গিয়ে চশমা খসে গেল মিস টোমারের। আড়চোখে চট করে আক্ষবার ফারিহার দিকে তাকিয়ে, সেটা তুলে আবার নাকে বসাতে বসাতে বলল, 'না পারি না। ও রকম মানুষকে কেউই দেখতে পারে না।'

মনে মনে না শুণে থাকতে পারল না ফারিহা, 'চার!'

'যাওয়া দরকার,' বলল কিশোর, কিন্তু ওঠার সামান্যতম লক্ষণ দেখাল না সে। 'এ, আরও দু-জনের কথা যে বললেন তারাও মহিলা নাকি?'

'একজন পুরুষ, বুড়ো নরিস। মাঠের ধারে একটা ক্যারাভানে বৌকে নিয়ে থাকে। নাকটা এত বড় আর বাঁকা, মনে হয় সৈগলের ঠোঁট। ঝোলা গোঁফ। আনমনে কি জানি বিড়াবিড় করতে থাকে সারাক্ষণ। দুনিয়ার সব ব্যাপারেই যেন আগত। দেখা হলেই আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে। আমার কথা জিজ্ঞেস করে, আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে, লেডি অরগাননের কথা জানতে চায়। নানা গদা। ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে। এমনকি মালীকে কত বেতন দেন লেডি অরগানন সেটা নগন্ত জিজ্ঞেস করে।'

চট করে সবার দিকে তাকিয়ে নিল একবার কিশোর। অর্থাৎ, এই লোককেও গণ্ডেহ করা যেতে পারে। লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এত আগ্রহ কেম? এই যার ধূৰ্বাব, সে মজা দেখাব জন্যেও মানুষকে ভয় দেখিয়ে ঢিঠি লিখতে পারে।

'আর অন্যজন?' জানতে চাইল কিশোর।

মুসার দিকে তাকাল মিস টোমার, 'তোমার তো জান্ম থাকার কথা, মুসা। আমাদের মিসেস বিন। সে যে ডিয়ারহিলসে যায় জানো না?'

বীতিমত চমকে গেল গোয়েন্দারা।

মুসা বলল, 'সোমবারে তার ছুটি থাকে। কোথায় যায়, কি করে, জানব কি চাবে?'

'তাহলে কাল যায়নি কেন?'

'আমাদের আরেকজন কাজের মানুষ কয়েক দিনের জন্যে ছুটি নিয়েছে। সে-জন্যেই বোধহয় এই সোমবারে মিসেস বিনকে উভারটাইম করে দিতে অনুরোধ করেছে মা।'

'ও।'

রবিন জিজ্ঞেস করল, ‘এই তিনজন বাদে গ্রীনহিলসের আর কেউ যায় না, না?’

‘না। আর কেউ না।’ সরাসরি রবিনের চোখের দিকে তাকাল মিস টোমার, ‘কিন্তু ওই বাস আর যাত্রীদের ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছ। ব্যাপারটা কি বলো তো?’

‘...এমনি...আরও...’ সাহায্যের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, ‘মুসা, তোমার বেড়াল না খুঁজে বসে আছে কেন? দেখো না, কেথায়?’

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

চোখ টিপল কিশোর।

বুকল মুসা, মিস টোমারের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই চালাকিটা করছে কিশোর। তাড়াতড়ি উঠে পড়ল সে বেড়াল খোঁজার জন্যে। দেখাদেখি রবিনও উঠল।

ফারিহাকে বলল কিশোর, ‘তুমি বসে আছ কেন?’

সবাই উঠে বেড়াল খুঁজতে শুরু করল।

মিছেমিছি কয়েক মিনিট খোঁজাখুঁজি করে বলল মুসা, ‘না, এখানে বোধহয় আসেনি। চলো, বাড়ি যাই।’

মিস টোমারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যত জলদি স্বত্ব স্বীকার থেকে সরে এল ওরা।

দেয়াল টপকে অন্য পাশে নেমেই ফারিহা বলে উঠল, ‘মিসেস বিন হতেই পারে না। লিলির জন্যে কত কিছু করল। না, ও হতে পারে না। কি বলো, কিশোর?’

‘হয়তো,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। ‘মিস ব্যাটার ইওয়ার স্বত্বাবনাই বেশি। বুড়ো নরিসকেও বাদ রাখা উচিত না। যাই হোক, তদন্ত করার জন্যে আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেল। সন্দেহ করার মত তিনজন।’

‘কি তদন্ত করবে?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘জানার চেষ্টা করব আজ সকাল সাড়ে ছ’টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল কোন্জন। কার পক্ষে মিসেস উইলমারের দরজার নিচ দিয়ে চিঠি ঠেলে দেয়া সহজ ছিল?’

বারো

সবাইকে নিয়ে বেরোলে ঝামেলা হতে পারে ভেবে এবারও একাই তদন্ত করতে বেরিয়ে গেল কিশোর।

অপেক্ষা করতে লাগল মুসা, ফারিহা আর রবিন। চিটুও চুপ। ফারিহার পায়ের কাছে চুপ করে শুয়ে আছে। কি করে জানি বুঝে গেছে খেলা করার সময় ময় এটা।

।।।।। এখন খেলবে না কেউ ।

।।।।। ৬টা পেরোল...সোয়া এক...দেড়...

।।।।। থাকতে থাকতে অস্তির হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা । ইঠাঁৎ জানালা দিয়ে
।।।।। মারিহা বলে উঠল, ‘ওই যে, আসছে ।’

।।।।। ৬মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল টিটু । বলল, ‘ঘাট !’

।।।।। ৬ড়ি করে মুসা আর রবিনও জানালার কাছে এসে দাঁড়াল । কিশোরের
।।।।। চেপে আসছে কসাইরের দোকানের একটা ছেলে । সাইকেলটা না চেনা
।।।।। আর ইদানীং কিশোরের ঘন ঘন ছদ্মবেশ নেয়ার কথা জানা না থাকলে
।।।।। ।।।।। পারত না ওরা ।

মুসাৰ ঘৰেৱ নিচে এসে সাইকেল রেখে ওপৱে তাকিয়ে নিচু ঘৰে জিজেস
।।।।। ‘ধৰে আৱ কেউ আছে ?’

মুসা জানাল, ‘নেই । উঠে এসো ।’

।।।।। ১মাই-বালকেৱ ছদ্মবেশ নিয়ে সামনেৱ দৱজা দিয়ে চুকতে চাইল না
।।।।। কেউ দেখে ফেললে চুকতে দেবে না । দেবে নিজেৱ পরিচয় দেয়াৱ পৱ ।
।।।।। দিতে হবে হাজাৰটা কৈফিয়ত । অত ঝামেলায় কে যায় । তাৱ চেয়ে
।।।।। দিয়ে চুকে পড়াটাই নিৱাপদ ।

।।।।। কিশোৱ ঘৰে চুকতেই রবিন জিজেস কৱল, ‘কি জেনে এলে ? ছদ্মবেশ নিয়েছ
।।।।।

‘খাৰে বাবা একটু দম নিতে দাও । অনেক কিছু জেনেছি ।’

।।।।। চেয়াৱে বসল কিশোৱ । মিনিটখানেক চুপ কৱে দম নিল । মুসাৰ মনে হলো,
।।।।। গাৱ একটা শয়তানি । ওদেৱকে অস্তিৰ কৱে তোলাৱ জন্যেই এই আচৱণ
।।।।। কিশোৱ ।

।।।।। ২হোক, অবশেষে বলল কিশোৱ, ‘ছদ্মবেশ নিয়েছি লোকেৱ সঙ্গে সহজে
।।।।। যাওয়াৱ জন্যে । কসাইয়েৱ দোকানেৱ ছেলে যদি গিয়ে লোকেৱ ব্যাপাৱে
।।।।। বাঞ্ছণ্ণৰ নিতে থাকে, কেউ সন্দেহ কৱবে না । ভাববে খদেৱ জোগাড়েৱ চেষ্টা
।।।।।

‘ঝুলাম,’ অধৈৰ্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা । ‘তা জেনে এলে কি ?’

।।।।। ৩কে আৱও অধৈৰ্য কৱে দিয়ে ধীৱে সুস্থে ছদ্মবেশ খুলল কিশোৱ । তাৱপৱ
।।।।। ‘বুড়ো নৱিস সাড়ে ছয়টাৱ আগেই তাৱ কুণ্ডাটাকে নিয়ে হাঁটতে
।।।।। যাগোহল । যে রাস্তা ধৰে গিয়েছিল সেই রাস্তাতেই মিসেস উইলমাৱেৱ বাড়ি ।
।।।।। ৪তে আটটায় ।’

খন হয়ে শুনছে সবাই । পিনপতন নীৱতা ।

।।।।। ৫ম ব্যাটারও বেৱিয়েছে কুণ্ডা নিয়ে, বলতে থাকল কিশোৱ, ‘সাড়ে ছয়টায় ।
।।।।। ৬ষ্ঠা ধৰে গিয়েছে । মিসেস উইলমাৱেৱ বাড়ি থেকে কিছুটা দূৱে পথেৱ
।।।।। ৭াৱ বাড়ি । একটা লাল শাল গায়ে ছিল তাৱ ।

।।।।। ৮মেস বিনও আজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছে । বুড়ো নৱিসেৱ সঙ্গে কথা
।।।।। দেখা গেছে ।’ মুখ তুলে বন্ধুদেৱ দিকে তাকাল কিশোৱ । ‘তাৱপৱ,
।।।।।

গোয়েন্দারা, কি বুঝলে? তিনজনের যে কেউ দরজার ফাঁক দিয়ে চিঠিটা ফেলে আসতে পারে, তাই না?’

‘মি এত সব জানলে কি করে?’ তাঙ্গৰ হয়ে গেছে ফারিহা।

‘সহজ। মিসেস উইলমারের বাড়ির পাশে যে মাঠ আছে সেখানে ভেড়া চরায় বুড়ো হারপিক। তোর পাঁচটায় ঘূম থেকে উঠে ভেড়া চরাতে নিয়ে যায়। বসে বসে তো আর কোনো কাজ নেই, তাকিয়ে ধাকে রাস্তার দিকে। মানুষ দেখে। শকুনের চোখ বুড়োটার। কোনো কিছু এড়ায় না। মাঃস দেয়ার লোভ দেখিয়ে তার কাছ থেকেই আদায় করলাম সমস্ত কথা।’

‘আর কি বলল?’ জানতে চাইল রবিন।

‘বলল, খুব তোরে ওঠে বুড়ো নরিস। কুত্রা নিয়ে বেরোয়। বনে যায়। প্রায়ই শিকার নিয়ে ক্ষেত্রে। ফাঁদ পেতে শিকার ধরে, কখনও কাঠবেড়ালি, কখনও খরগোশ। সে-সব রিঞ্জি করতে যায় ডিয়ারহিলসে। মিস ব্যাটারও রোজ সকালে কুত্রা নিয়ে হাঁটতে বেরোয়। নিয়মিত। তাতে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি হারপিকের। মনে হয়েছে কেবল মিসেস বিনের বেলায়। তাকেই ওখানে প্রথম দেখা গেছে।’

‘তারমানে সে-ই আমাদের আসামী!’ বলে উঠল মুসা।

‘চুপ! সাবধান করল রবিন, ‘আসছে! কি হবে?’

দরজায় উঁকি দিল মিসেস বিন। গোমড়ামুখে বলল, ‘হাতমুখ ধূয়ে এসো। খাবার রেডি।’

ফস করে জিজেস করে বসল মুসা, ‘মিসেস বিন, আজ তোরবেলা নাকি মিসেস উইলমারের বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়েছিলেন?’

থমকে গেল মিসেস বিন। ঘরে চুকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। ‘কে বলেছে?’

বোকাখিটা করে ফেলায় নিজেকে লাঠি মারতে ইচ্ছে হলো মুসার। কিন্তু তীর ফসকে গেছে, আর ফেরানো যাবে না। বলল, ‘বুড়ো হারপিক।’

‘ওই শব্দনটা! খালি লোকের ওপর নজর রেখে বেড়ায়! একদিন ওর মাথাটা ভাঙব আমি! হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, তাতে কি? বুড়ো নরিসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। মা’র সঙ্গে কাল দেখা করতে যেতে পারিনি, কোন খবরও দিতে পারিনি। চিন্তা করবে। নরিস তো প্রায়ই যায় ডিয়ারহিলসে। জিজেস ব্যাটার গিয়েছিলাম আজও যাবে কিনা। গেলে মা’র জন্যে কিছু খাবার পাঠাতাম।’

‘ও।’

‘কেন, আমি কোথায় গেলাম না। গেলাম তার জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?’

‘না না...এত সকালে তো কখনও ওঠেন না...তাই ভাবলাম...’

‘ভাবাভাবি বাদ দিয়ে খেতে এসো। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর গরম করে দিতে পারব না।’

মুসা আর ফারিহা খেতে চলে গেল।

কিশোর আর রবিন বেরিয়ে এল। ওদেরকেও খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করেছে

মুসা, কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। দৃপুরের খাওয়া বাড়িতে খেতে বলে দেয়া হয়েছে। দুর্দেশের জিনিসগুলো সাইকেলের বাস্কেটে রাখল কিশোর। টিটুর তাতে অসুবিধে হয়ে গেল। সাইকেলের পাশে পাশে দৌড়ে যেতে হবে। বেচারাকে কান্দিতে নাইব না বলে হেঁটে চলল কিশোর।

রবিনও চলল পাশাপাশি। বলল, ‘কিশোর, মিসেস বিনই অকাঙ্ক্ষা করছে, কি এখো?’

‘হতে পারে,’ চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ‘শুধু যদি আমাকে লিখত, তাহলে শিওর হতে পারতাম। তাবতাম, ওকে তাড়িয়ে ভাইবিকে খানার জন্যে ফন্দি করেছে। কিন্তু চিঠি তো আরও অনেকে পেয়েছে। তাদেরকে খাচানোর অর্থটা কি?’

‘হ্যাঁ, তা-ও তো বটে!’

এক জায়গায় এসে মোড় নিয়ে আরেক দিকে চলে গেল রবিন, কিশোর চলল বাইরে।

দৃপুরের খাওয়া শেষে, কথামত বেলা আড়াইটায় আবার মুসাদের বাড়িতে গোজর হলো দু-জনে। চুক্তেই দেখা উত্তেজিত মুসা আর ফারিহার সঙ্গে।

ফারিহা বলল, ‘ঘামেলা এসেছে! ঝগড়া করছে মিসেস বিনের সঙ্গে!’

‘কেন?’ জানতে চাইল কিশোর।

‘ফগ জেনে গেছে লিলি যে হোমে ছিল সেটাতে চাকরি করত মিসেস বিন। পাঁচাতিক বদমেজাজী ছিল। প্রায়ই তার নামে নালিশ যেত। লিলিও নাকি একবার “মা নামে নালিশ করেছিল ম্যাট্রিনের কাছে। খোঁজ নিয়ে সেটা জেনে ফেলেছে ফগ। ফেজেস করতে ছুটে এসেছে মিসেস বিনের কাছে।’

রাম্ভাঘরের দিকে দৌড় দিল কিশোর। পেছনে তার দলবল। খোলা জানালার দুটি দাঁড়িয়ে ভেতরের সব কথা শোনা যায়। ওখানেই আড়ি পাতল ওরা।

চিৎকার করছে মিসেস বিন, ‘অহেতুক আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন, মিস্টার গ্রাম্পারকট!’

‘না, করছি না। আপনি ভুল করছেন। আমি কেবল কয়েকটা সাধারণ প্রশ্ন করতে এসেছিলাম। আপনিই অহেতুক চেঁচামেচি করছেন। কাজটা ভাল করছেন।’

‘কী, আমাকে হমকি দিচ্ছেন?’

‘দেয়ার প্রয়োজন পড়লে তাই দেব। এখনও পড়েনি। আপনার এই আচরণের কথা আমার মনে থাকবে। চলি, শুভ বাই।’

একদৌড়ে রাম্ভাঘরের কাছ থেকে সরে গেল গোয়েন্দারা।

বাইরে বেরিয়ে সাইকেলে চড়ল ফগ। ওদের দেখতে পেল না। ঘাড়, মুখ গাঢ়িকে লাল হয়ে গেছে তার। ভীষণ রাগা রেগেছে।

কথা বলার জন্যে ছাউনিতে চলে এল ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাতে কথা শুনতে পেল। একজন মহিলা বলছে, ‘আর গলানেন না, মিসেস বিন। কাপড়ও বানাতে জানে না। বললাম, অত টাইট

পোশাক ভাল ন্য। তা-ও শুনবে, ন্য। বানাবেই। আমি লেডি অরগাননের কথা বলছি।'

বেড়ার ফাঁক দিয়ে উকি দিল গোয়েন্দারা। দেয়ালের ওপাশ থেকে মাথা উচু করে আছে একজন মহিলা। চিনতে পারল কিশোর। মিস ব্যাটার। নিচয় লেডি অরগাননের পোশাকের মাপ নিতে এসেছে। কোনভাবে টের পেয়েছে সজি বাগানে আছে মিসেস বিন, ব্যস, চলে এসেছে কুংসা গাইতে।

ফগের সঙ্গে ঝগড়া করে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে মিসেস বিনের। বলল, 'আমার গাউনটা ও তো ঠিক হয়নি। কতবার বললাম, একটু ঠিক করে দিতে। সেই যে বানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন, আর দেখা নেই। আজকে দেবেন?'

'আজ তো সময় নেই,' উসখুস করতে লাগল মিস ব্যাটার। বুবল আলাপ জমবে না। 'সময় করে আরেকদিন এসে করে দেব। ওই যে, মিস টোমার ডাকছে। চলি।'

গজগজ করে কি বলল মিসেস বিন, বোৰা গেল না। কিছু লেটুস আর গাজর তুলে নিয়ে চলে গেল বাড়ির দিকে।

তেরো

পরদিন সকালে কসাই-বালকের ছদ্মবেশে মুসাদের বাড়িতে এল কিশোর। যদি কোন তদন্তের প্রয়োজন পড়ে, এ জন্যে পোশাকটা পরে তৈরি হয়েই এসেছে।

জানালা দিয়ে তাকে এক বালকের জন্যে চোখে পড়ল মুসার আম্বার। ভাবলেন, ভালই হলো। মিসেস বিনকে আর কষ্ট করে কসাইয়ের দোকানে যেতে হবে না। কসাই তার সহকারীকে দিয়ে মাঃস পাঠিয়ে দিয়েছে।

আসলে তো রান্নাঘরে গেল না কিশোর। জানালা দিয়ে মুসার ঘরে ঢুকল।

সে ঢুকেও সারতে পারল না, প্রচণ্ড হই-চই বেধে গেল। কি ব্যাপার? জানা গেল, মিসেস বিনও একটা উড়োচিঠি পেয়েছে। মহা চেঁচামেচি করে মুসার আম্বাকে জানাচ্ছে সে-কথা।

অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করে ফগকে ফোন করলেন মিসেস আমান।

ভীমণ উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছে গোয়েন্দারা। এ রূকম কিছু ঘটবে কল্পনাই করতে পারেনি ওরা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাইকেলে করে হাজির হলো ফগ। বসার ঘরে ঢুকল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সবই দেখল গোয়েন্দারা।

আরও বিশ্বায় অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। মুসার আম্বাকে জানাল ফগ উড়োচিঠি একটা তাকেও দেয়া হয়েছে। নানা আজেবাজে কথা লেখা হয়েছে তাতে। মাথামোটা আর বলদ বলে গাল দেয়া হয়েছে।

শুনে হেসে ফেলল ফারিহা আর মুসা।

শুনে শুনে ওপর দিকে তাকিয়ে ওদের দেখে ফেললেন মিসেস আমান আর
১১।

ধমক খেয়ে সরে আসতে হলো গোয়েন্দাদের।

সবার পেছনে ছিল কিশোর। তাবতে লাগল, 'আমাকে দেখে ফেলল না তো
মগ! কসাই-বালকের ছদ্মবেশে? তাহলে বেকায়দা হয়ে যাবে!'

বোধহয় দেখেনি ফগ, উড়োচিঠির ব্যাপারটা নিয়ে মশগুল। দেখলে উঠে
থাসত। রান্নাঘরে গেল মিসেস বিনের সঙ্গে কথা বলতে।

কথা বোঝা গেল না পরিষ্কার, তবে ঝগড়া যে বেধে গেছে আবার সেটুকু বোঝা
না। খানিক পর রেগেমেগে গটমট করে বেরোতে দেখা গেল ফগকে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন মিসেস আমান।

'নাহ, কোন রকম সহযোগিতার মনোভাব নেই মিসেস বিনের!
মেলা!... মিসেস আমান, আপনি কোন সাহায্য করতে পারেন? অপরিচিত
জাঁকে আজ বাড়িতে ঢুকতে দেখেছেন?'

'একটা ছেলে এসেছিল একটু আগে, বোধহয় কসাইয়ের দোকান থেকে।
মাসোটা, লাল চুল...'

'লাল চুল?'

'হ্যাঁ, লাল চুল। কেন?'

'না, এমনি। ইদানীং বড় বেশি লাল চুলওয়ালা ছেলেদের দেখা যাচ্ছে এই
যাঁয়ে। টেলিগ্রাফ-বয় ছেলেটার চুল লাল; কসাইয়ের ছেলেটার চুল লাল... নাহ,
খাজ নিতে হচ্ছে দেখছি!'

আরও দু-চারটা টুকটাক কথার পর বেরিয়ে গেল ফগ।

পরদিন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফগ আর কিশোর। দু-জনের দুই কাজ। ফগ
বেরোল লাল চুল ছেলেগুলোকে খুজতে। আর কিশোর বেরোল সন্দেহভাজন
জনের হাতের লেখা জোগাড় করতে।

আজ বেরোল মেসেঞ্জার-বয়ের ছদ্মবেশে। মাথায় লাল পরচুলাই পরল। ফগ
পেলে যাতে আরও দ্বিদ্বায় পড়ে যায়।

পথমে গেল বুড়ো নরিসের কাছে। ক্যারাভানের বাইরে অলস ভঙ্গিতে বসে
যান। পুনরে বুড়ো। সাইকেলের ঘণ্টা শুনে চোখ মেলে তাকাল। 'কি চাই?'

'আপনার নামে একটা পার্সেল আছে।'

'আমার নামে পার্সেল? কে পাঠাল?'

'ও জানি না। নিন। নিয়ে এই কাগজটায় সই করে দিন।'

প্যাকেটটা নিয়ে শুঁকে দেখল নরিস। দামী তামাকের চমৎকার গন্ধে চোখ
করে উঠল তার। খুলতে গেল।

বাধা দিল কিশোর, 'মাল বুবে পেয়েছেন আগে এ কথা লিখুন। নাম-ঠিকানা
নাই সহ করে দিন। কাগজটা আমাকে জমা দিতে হবে অফিসে। নইলে চাকরি
খালবে না।'

‘আমি সই করতে পারব না !’

‘তাহলে আমিও প্যাকেট দিতে পারব না .।’

‘আমার জিনিস আমাকে দেবে না কেন ?’

‘আপনারই বা সই করতে এত আপত্তি কেন ?’

চেঁচামেচিতে ক্যারাভাম থেকে বেরিয়ে এল বুড়োর বউ । জিজ্ঞেস করল, ‘কি হয়েছে ?’

জানাল কিশোর ।

‘বেশ, দাও, আমিই সই করে দিছি ।’

‘আপনার সইতে হবে না । যার নাম আছে ফর্মে, তাকে করতে হবে ।’

‘কেন, আমি দিলে হবে না কেন ? আমরা তো একই পরিবারের মানুষ ।’

‘যার নামে এসেছে তার সই করার নিয়ম ।’

‘আমি করতে পারব না !’ গোঁ ধরে রইল বুড়ো নরিস । ওদিকে প্যাকেটও ফেরত দেবে না ।

কিশোরের হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গেল বুড়ি । ‘আসল কথা শোনো । ও লেখাপড়া জানে না । সই করবে কি করে ?’

এইবার দ্বিতীয় পড়ে গেল কিশোর । তেবে নিয়ে বলল, ‘কি আর করা । দিন তাহলে সই করে ।’

এরপর মিস ব্যাটারের কাছে যাবে । ভাবতে ভাবতে চলল সে, বুড়ো সত্যিই যদি লেখাপড়া না জানে সন্দেহের তালিকা থেকে সে পুরোপুরি বাদ ।

কে তাকে উপহার পাঠাল ভেবে অবাক হলেও মিস ব্যাটার কোন গুগুগুল করল না । রঙিন সুতোর প্যাকেটটা বুঝে নিয়ে সই করে দিল ।

মিসেস বিনের কাছে চলল এরপর কিশোর ।

মহিলার যা স্বভাব, ত্যাদ়ামি খানিকটা করলই । নাম-ঠিকানা লিখে সই করল বটে, তবে উল্টোপাল্টা । প্রতিটি শব্দের মধ্যে কিছু অক্ষর লিখল বড় হাতের, কিছু ছোট হাতের । কেন করল এ কাজ, কিশোর জানতে চাইলে খেঁকিয়ে উঠল, ‘লেখার অভ্যেস নেই আমার ! সেই যে ছোটবেলায় ইঙ্গুলে লিখেছি, তারপর থেকে বাদ । লেখাপড়া অত জানি না ।’

কিন্তু কিশোরের মনে হতে লাগল, এটা স্বেফ শয়তানি । অভ্যাস না থাকলে হাতের লেখা খারাপ হতে পারে; দুই রকমে মিশিয়ে দেবে কেন ?

যাই হোক, লেখা জোগাড় করতে পেরে খুশি হলো সে । রবিনদের বাড়ি চলল ।

মুসাদের বাড়িতে যখন-তখন ফগ এসে হাজির হয়, তাই এখানে আজড়া দেয়া নিরাপদ নয় তেবে আজ রবিনদের বাড়িতে জমায়েত হয়েছে সবাই । মুসা আর ফারিহাও চলে গেছে সেখানে ।

রাস্তায় বেরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শিস দিতে দিতে সাইকেল চালাল কিশোর । সতের থাকলে অবশ্য অঘটনটা ঘটত না । মোড় ঘূরতেই ধাক্কা লাগিয়ে দিল আরেকটা সাইকেলের সঙ্গে । আর সেই সাইকেলের আরোহী স্বয়ং ফগর্যাম্পারকট ।

লাল চুলওয়ালা ছেলের সন্ধানে বেরিয়েছিল সে । পোস্ট অফিসে গিয়ে ওরকম কোন টেলিগ্রাফ বুয়ের দেখা পায়নি । পোস্ট মাস্টার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তেমন

(১০) বাবা কোন কর্মচারী নেই তাদের অফিসে। গ্রামে কসাই আছে দুজন। তাদের মহকারীও আছে। কিন্তু একটা ছেলেরও লাল চুল নেই। ব্যাপারটা বিস্মিত করেছে মগকে। তার ধায়গা হয়েছে, মুসাদের বাড়িতে কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে—যেহেতু মুসার আম্বা কসাই-বালকটাকে দেখেছেন। সূত্ররাং সেদিকেই লেছিল সে, পথের মধ্যে এই সংঘর্ষ।

সাইকেল সোজা করে কিশোরের দিকে তাকাল সে। লাল চুলওয়ালা খসেঝার-বয়কে দেখে চোখ কপালে উঠল। আবার লাল চুল! এবং অপরিচিত ছলে! নিচয় অন্য দুটো ছেলের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে। আর যাবে কাথায়। কিশোরকে ধরে ফেলল সে। কোনমতেই ছুটতে পারল না কিশোর। মাইকেল সহ তাকে পাকড়াও করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল ফগ। ওপরের লেকেঠায় বস্তি করে রাখল। জরুরী টেলিফোন সারতে নিচে নামল। কাজ সেরে যায়ে তারপর ঝাসাবাদ করবে। তেমন বুঝালে কিঞ্চিত ধোলাই দিতেও ছাড়বে। অনেক জুলান জুলাছে তাকে লালচুলো ছেলেগুলো!

চোল্দ

খাদ্য গরম করল না কিশোর। এ ব্রকম বিপদে আরও পড়েছে। প্রথমেই এল জানালার কাছে। এদিক দিয়ে বেরোনো যাবে না, বুঝাতে পারল। রাস্তার ধারে গাঠ। লোক চলাচল আছে। জানালা দিয়ে বেরোতে গেলে কারও না কারও চোখে গাঠ যাবে। চিন্কার-চেঁচামেচি শুরু হবে। আবার ধরা পড়ে যাবে সে।

দরজার তালাটা পরীক্ষা করল। তালা লাগানো, তবে চাবিটা রয়েছে তালার গুটাতে। বিচির হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। পকেটে প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব গঠ। গোয়েন্দাগিরি করে। এ সব বাখতে হয়।

খুঁজেপেতে ঘরের কোণ থেকে একটা খবরের কাগজ নিয়ে এল। দরজার নিচের কাঁক দিয়ে বাইরে ঠেলে দিল সেটা। পকেট থেকে একটুকরো তার বের করে তালার ফুটোতে লাগিয়ে ঠেলা দিতে ওপাশে চাবিটা খসে পড়ল কাগজের ওপর। খাণ্ডে করে কাগজটা ভেতরে টেনে আনতেই চাবিটাও এল তার ওপরে। তালা গুল এখন বেরিয়ে যাওয়াটা কিছুই না। এই চালাকি করে দরজা-বন্ধ ঘর থেকে খাণ্ড বেরিয়েছে সে।

কাগজটা আবার আগের জায়গায় ফেলে রাখল কিশোর। দরজা খুলে বেরিয়ে খাণ্ড আগের মত বন্ধ করে দিল। তালা লাগিয়ে ফুটোতে রেখে দিল চাবিটা। গুঁট বেয়ে নেমে দেখল ফোন করতে ব্যস্ত ফগ। পা টিপে টিপে সরে এল বাথরুমের দুক। দ্রুতহাতে পরচুলা খুলে, ছদ্মবেশ মুছে হয়ে গেল আবার কিশোর পাশা। খণ্ড পাশের দরজা খুলে রাখাঘরে উঁকি দিল। মিসেস জারগন নেই। বোধহয় খণ্ড এখনও। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল।

ফোনে ওপরওয়ালাকে সেন্দিনকার কাজের রিপোর্ট দিচ্ছিল ফগ।

দেয়া শেষ করে উঠে এল চিলেকোঠার কাছে। দরজার তালার চাবিতে মোচড় দিয়ে তালা খুলে ভারিকি ভঙ্গিতে ভেতরে পা রাখল। বরফের মত জমে গেল যেন মুহূর্তে।

মেই ছেলেটা! উধাও! একটা অস্ত্র ব্যাপার মনে হলো তার কাছে। কাঠের ভারি দরজা ভেদ করে যেতে পারে না কোন মানুষ। এমনিতেই টেলিগ্রাফ-বয় আব কসাই-বালকের গায়ের হওয়ার ব্যাপারটা বিস্মিত করে রেখেছে তাকে। এখন ঘর থেকে জলজ্যান্ত একজন মানুষ বাতাসে মিলিয়ে যাওয়াটা হতবাক করে দিল তাকে। ভাবতে লাগল, মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে তার। কিংবা ব্যাপারটার মধ্যে জাদুটাদু কিছু আছে।

বাথরুমে চুকে মাথায় ঠাণ্ডা পানি দিল সে। বেরিয়ে এসে প্রিজে খুলে দেখল কোল্ড ড্রিংক আছে কিনা। মেই। মিসেস জারগনও আসেনি। সুতরাং ড্রিংক কেনা র জন্যে তাকেই বেরোতে হবে।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে তখন চোখ রাখছে কিশোর। সাইকেলটা রয়েছে এমন জায়গায়, যেখান থেকে নেয়ার সাহস হচ্ছে না তার। ফগ দেখে ফেলতে পারে। কি করবে ভাবছে, এই সময় ফগকে বেরোতে দেখল সে। ভাবল, এইবার হয় সাইকেলটা ভেতরে নিয়ে যাবে ফগ, নয়তো তালা দিয়ে রাখবে।

কিন্তু কোনটাই করল না ফগ। ঘোরের মধ্যে যেন হাঁটতে হাঁটতে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল।

কোথায় যাচ্ছে সে, বুঝতে পারল না কিশোর। প্রয়োজনও মনে করল না। সুযোগ পেয়ে মুহূর্ত দেরি করল না আব। উঠে গিয়ে সাইকেলটা স্ট্যান্ড থেকে নামিয়েই চেপে বসল। গেট দিয়ে বেরিয়ে ফগ যেদিকে গেছে তার উল্টোদিকে চালাল পুরোদমে।

ড্রিংক নিয়ে ফিরে আসার পর সাইকেলটার কথা মনে পড়ল ফগের। অন্ত দুঃ। হয়ে গেছে। ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখা উচিত ছিল। গেট খুলে ভেতরে চুকে সাইকেলটা। যেখানে ছিল সেদিকে তাকিয়েই আরেকটা ধাক্কা থেতে হলো তাকে। নেই ওটা!

দিনেদুপুরে এ ভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে মানুষ, সাইকেল... রহস্যটা কি? তবে কি মাথাটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল? অলৌকিক সব কাণ ঘটতে দেখছে সে-জনে। ওপরওয়ালাকে কি রিপোর্ট দেবে ভেবে মাথা আরও গরম হয়ে গেল তার। এগো পড়ল ওখানেই, ঘাসের ওপর।

সেদিন বিকেলে মুসাদের ছাউনিতে জরুরী আলোচনা সভা বসল গোয়েন্দাদে। আলোচনার বিষয়বস্তু অবশাই সেই উড়োচিঠি।

‘রবিন বলল, ‘অন্তত কাণ! সন্দেহ হচ্ছে অনেকের ওপর, তারপর এক গান করে আবার তাদেরকে তালিকা থেকে বাদ দিতে হচ্ছে। সবাই তো সন্দেহে বাইরে চলে গেছে, কিশোরঃ কেউ নেই আর।’

‘হঁ,’ আনমনে নিচের ঠোটে চিমটি কাটল কিশোর। ‘বুড়ো নরিস বাদ, কারণ মে লেখাপড়াই জানে না। মিস ব্যাটারের হাতের লেখার সঙ্গে চিঠির লেখা মেলে না। আর মিসেস বিনের লেখার সঙ্গে তো একেবারেই মেলে না। তা ছাড়া মিসেস বিনকে আরও একটা কারণে সন্দেহ থেকে মুক্তি দেয়া যায়; সে নিজেও একটা ডড়োচিঠি পেয়েছে।’

‘সাংঘাতিক জটিল একটা রহস্য!’ নিরাশ কঢ়ে বলল মুসা। ‘এর কোন তোমাথাই পাচ্ছি না। সমাধান করব কি করে?’

‘সূত্র দরকার,’ বিজের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল ফারিহা। ‘তাই না কিশোর?’

‘হ্যাঁ। সত্যিকারের সূত্র এখনও তেমন কিছু পাইনি আমরা, একমাত্র চিঠিগুলো থাড়া।’

‘চলো, বরং নদীর ধার থেকে ঘুরে আসি,’ প্রস্তাব দিল মুসা। ‘মাথাটা গরম হয়ে গেছে।’

প্রস্তাবটা মন্দ না। বন্ধ ছাউনিতে বসে থাকতে আর ভাল লাগল না কারও। গারিয়ে পড়ল।

বেরিয়েই দেখল সাইকেল ঠেলে ভেতরে চুকছে ফগ। ওরা লুকিয়ে পড়ার খাগেই দেখে ফেলল সে। এগিয়ে এল। গলা লম্বা করে জিজেস করল, ‘লালচুলো বেলেগুলোকে দেখেছ? কোন সম্পর্ক আছে তোমাদের সঙ্গে? থাকলে এখনও নাহো। আমি ধরতে পারলে কিন্তু ভাল হবে না।’

‘বলেন কি! ভয় লাগছে! চোখ বড় বড় করে বলল কিশোর।

‘দেখো ছেলে, ডেঁপোমি করবে না! ঝামেলা! তোমার কুকুটাকে সরাও! এই, গো, সর, সর!'

ফগের প্যান্ট কামড়ে দেয়ার তাল করছে টিটু, পায়ের চারপাশে চক্র দিচ্ছে। কিশোর ডাকল, ‘অ্যাই টিটু, আয়।’

এল না টিটু। একই ভাবে ঘুরে ঘুরে সুযোগ খুঁজতে লাগল কামড় বসানোর।

‘এই মিষ্টি ডাকে কি আর ওই শয়তান কুকু সরবে নাকি? জোরে ডাকো,’ ফগ।

একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল কিশোররা চারজনেই, ‘এই টিটু, আয়!’

এত জোরে শব্দ হলো, ফগ পর্যন্ত চমকে উঠল। লাফ দিয়ে সরে গেল টিটু। একে ধরে রাখল কিশোর।

ছাউনিটার দিকে সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকাল ফগ। ‘ওখানে কি করছিলে?’

‘গল করছিলাম,’ নিরীহ স্বরে জবাব দিল কিশোর।

‘শুধু গল?’

‘তো আর কিছি?’

‘হঁ।’

‘এখন কোথায় যাচ্ছ?’

‘নদীর ধারে।’

আরঁ কিছু না বলে বিষ-দৃষ্টিতে কুকুরটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল ফগ। বোধহয় মিসেস বিনের সঙ্গে কথা বলতে।

নদীর ধারে চলে এল ওরা। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। একটা বড় ঝোপের ধারে গা এলিয়ে বসল সবাই। বড় একটা হাঁস উড়ে এসে ঝপাস করে পড়ল পানিতে। নদীর পাড়ের বড় ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আরও দুটো ছোট আকারের হাঁস। পানিতে পড়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

চমৎকার দৃশ্য। অন্য সময় হলে প্রাণ ভরে উপভোগ করত ওরা। কিন্তু এখন মাথায় রহস্যটার চিন্তা। মুক্ত বাতাসে এসেও জট পাকিয়ে রাইল মাথার মধ্যে। এখানেও সেই আলোচনাই উঠে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু।

মাথা উঁচু করে সবাই দেখল ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ফগ।

অবাক হলো ওরা। ওর এখানে কি?

ছুটে যেতে চাইল টিটু। ধরে রাখল কিশোর।

কাছে এসে হাতের একটা পুঁটুলি ওদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ‘ছাউনিতে এটা লুকিয়ে রেখেছ কেন? আমার জন্যে? মনে করেছ সূত্র ভেবে লুগে নেব আমি?’

পুঁটুলিটার দিকে অবাক হয়ে তাকাল সবাই।

কিশোর বলল, ‘কি বলছেন? আমরা লুকাতে যাব কেন?’

‘হয়েছে, আর অবাক হওয়ার ভান করতে হবে না। এত বোকা ভেবো না আমাকে। এ সব ফালতু সূত্র আর আমার দরকার নেই। আসল অপরাধী কে জেনে ফেলেছি। লাল পরচুলাটা কেবল এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাকে।’ স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল ফগ। ‘তাহলে তুমি জানো না ওই টেলিগ্রাফ-ব্যাকসাই-বালক আর মেসেঞ্জার-বয়টা কে?’

‘না, জানি না।’

‘বেশ, জানবে খানিক পরই। ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে আসতে ফোন করে দিয়েছি। চলে আসবেন। এইবার আর বাঁচতে পারবে না তুমি, কিশোর পাশা। এটা কথাটাই বলতে এলাম। শয়তানির শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। অনেক জুশ। জুলিয়েছ আমাকে।’

বলে বিজয়ীর মত গর্বিত পা ফেলতে ফেলতে ঘাস মাড়িয়ে চলে গেল ফগ।

তার আচরণে অবাক হলো সবাই।

হাত বাড়িয়ে পুঁটুলিটা টেনে নিল কিশোর। সুতো দিয়ে বাঁধা বইপত্র মানে হলো। সুতো খুলে কাপড়ের মোড়ক সরাতেই বেরিয়ে পড়ল কয়েকটা এক প্রথমটা ডিকশনারি। দেখেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, ‘আরি! এটা তো আমার! হাঁণ।’ গিয়েছিল, খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিছুদিন যাবৎ।

পাতা ওল্টাতে শুরু করল কিশোর। মলাটের নিচে প্রথম পাতাটুতেই মুসার নাম লেখা। ভেতরে বেশ কিছু শব্দের নিচে বলপেন দিয়ে দাগ দেখা গেল। মুসা এলাঙ-

॥১॥ শুলো সে দেয়নি ।

একটা কপি বুকও আছে ।

হাসল রবিন । ‘কে জি ক্লাসের কোন ছেলের বই । মুসার ডিকশনারির সঙ্গে
॥২॥ রাখল কে?’

‘আলাই জানে,’ মুসা বলল ।

গন্তীর হয়ে গেছে কিশোর । নিচের ঠোটে চিমটি কাটছে । পাতা ওল্টাল দুটো
॥৩॥ যেরই । কপি বুকের অক্ষরের লাইনগুলো দেবে গেছে, বহুবার তার ওপর পেস্পিল
॥৪॥ এলপেন বোলালে যেমন দাগ হয়, তেমনি । তৃতীয় বইটার দিকে হাত বাড়াল
॥৫॥ একটা পুস্তিকা, বাসের টাইম-টেবল । দেখা গেল, গ্রীনহিলস থেকে
॥৬॥ গ্রীনহিলসের উদ্দেশে ‘ছেড়ে যাওয়া সোমবারের সোয়া দশটার বাসের নিচে দাগ
॥৭॥ আছে ।

‘এগুলো আসল সূত্র!’ বিড়বিড় করে বলল কিশোর । ‘আর ফগটা মনে করেছে
॥৮॥ কে বোকা বানানোর জন্যে আমরা ইচ্ছে করে রেখেছি । তার কাছে এখন বেশি
॥৯॥ লাল পরচুলা । তাহলেই আমাকে পাকড়াও করতে পারে ।’

বইগুলো আবার ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল সে । ডিকশনারির ভেতর থেকে পড়ল
॥১০॥ করো ছেড়া কাগজ । বিচিত্র কিছু শব্দ লেখা তাতে । মনে হয় কাঁচা বাজারের
॥১১॥ করা হয়েছিল, সেটা থেকে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে ।

উত্তেজিত হয়ে পড়ল কিশোর । চকচক করতে লাগল চোখ । প্রায় চেঁচিয়ে
॥১২॥, ‘বুঝে গেছি! ’

‘কী?’ প্রায় একসঙ্গে জানতে চাইল অন্য তিনজন ।

‘আসল অপরাধী কে?’

‘কে?’ আবারও একসঙ্গে প্রশ্ন ।

‘বুঝতে পারছ না?’

‘কসঙ্গে তিনজনের মাথা নাড়ানো ।

‘ঢলো, এখনই গিয়ে মুসার আম্বাকে সব জানাব । ক্যাপ্টেন রবার্টসন এসে
॥১৩॥ আল, নইলে আমরাই তাকে ফোন করব আসার জন্যে ।’

‘কম্তু অপরাধীটা কে?’ জানতে চাইল মুসা ।

‘নলই না যেন কিশোর । উঠে পড়েছে । টিটুকে বলল, ‘আয়, টিটু
॥১৪॥ গাড়ি যেতে হবে!’

শানেরো

॥১৫॥ ভেতরে চুকেই ক্যাপ্টেন রবার্টসনের বড় কালো গাড়িটা দেখতে পেল ওরা
॥১৬॥ এসে গেছেন তিনি ।

‘জার ঘণ্টা বাজাল মুসা ।

গালে দিলেন মিসেস আমান । ছেলেমেয়েদের দেখে বললেন, ‘ভাল হয়েছে এসে

পড়েছে। নইলে মিস্টার ফগকে আনতে যেতে হত তোমাদের। এসো, ভেতরে।

বড় একটা সোফায় বসে আছেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন। কোণের দিকের চেয়ারে মাথা উঁচু করে বসেছে ফগ। ছেলেমেয়েরা ঢুকতেই ঘাড় বাঁকিয়ে এমন ভঙ্গিতে তাকাল, যেন বিশ্ব বিজয় করে এসেছে।

হাসিমুখে তাকালেন ক্যাপ্টেন। তার দিকে ছুটে গেল ফারিহা। হাত মেলাতে মেলাতে বলল, ‘অনেক দিন পর এলেন, ক্যাপ্টেন।’

‘হ্যাঁ। কেমন আছ তোমরা?’

‘ভাল।’

টিটু এসে বসল ক্যাপ্টেনের পায়ের কাছে। আদুরে ভঙ্গিতে কুঁই কুঁই করে লাগল। তার মাথা চাপড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

অভ্যর্থনার পালা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন মিসেস আমান। তারপর বললেন, ‘ছেলেমেয়েরা, শোনো। তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছেন, মিস্টার ফগ। একজনের বিরুদ্ধে তো গুরুতর অভিযোগ।’ কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি।

কেউ কিছু বলল না। চুপ করে রইল চারজনেই।

ফগের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। ‘তোমার যা বলার বলো, ফগর্যাম্পারকট।’

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল ফগ। ‘হ্যাঁ, স্যার, বলছি। আপনার ধারণা এই ছেলেমেয়েগুলো খুব ভাল। মাপ করবেন, স্যার, আপনার ধারণা ভুল। এরা বেশি যন্ত্রণা দেয়। বিশেষ করে এই কিশোর ছেলেটা তো পদে পদে বাধার পুরু করে, পুলিশকে তার কাজ করতে দেয় না ঠিকমত।’

‘অত ভণিতা না করে যা বলার খোলাখুলি বলে ফেলো।’

‘ইয়ে, স্যার, উড়োচিঠি লেখার জন্যে এই ছেলেটাকে দায়ী করছি আমি।’

‘প্রমাণ আছে?’

‘আছে, স্যার। ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর চাটীকে বলেছি, বিশেষ কানুন কিশোরের ঘরটা আমি একবার চেক করতে চাই। তিনি অনুমতি দিলেন। সেখানে খুঁজে পেয়েছি এটা,’ পকেট থেকে লাল পরচুলাটা বের করল ফগ। ‘এটা প্রথমে টেলিগ্রাফ-বয় সেজেছে সে, তারপর কসাই-বালক, এবং সব শেষে মেসেঞ্জার-বয়।’

মুখ দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে ফারিহা। মুসা আর রবিনের মুখও গাঢ় হয়ে গেছে। সে-সব দেখে মুখ আরও উজ্জ্বল হলো ফগের।

কিন্তু কিশোর নির্বিকার। জিজ্ঞেস করল, ‘উড়োচিঠি গুলোর লেখার পাশে আমার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখেছেন আশা করি?’

‘দেখেছি। মেলে না। অনেক খাতা আছে তোমার ঘরে। নানা রকম হস্তান্তর আছে ওগুলোতে। সব তোমার। তারমানে হাতের লেখা নকলে তুমি খুব উড়োচিঠি গুলো তোমারই লেখা, তবে ভিন্ন হস্তান্তরে লিখেছ।’

বৎসনার দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকালেন মিসেস আমান। তিনি

১.১.১০০. ‘পরচুলাটা তোমার?’

‘হ্যাঁ।’

‘ছদ্মবেশ নিতে গেলে কেন?’

‘বড় হয়ে নামকরা গোয়েন্দা হওয়ার ইচ্ছে আমার। গোয়েন্দাদের জন্যে
ছদ্মবেশ জরুরী। তাই এখন থেকেই প্র্যাকটিস করছি। তবে চিঠিগুলো আমি
।১.১.১০১।’

‘কে লিখেছে?’ কড়া গলায় জানতে চাইল ফগ।

‘সুত্রগুলোকে হেলাফেলা না করলে আপনিও এতক্ষণে জেনে ফেলতেন।’

‘সুত্র?’

‘হ্যাঁ, নদীর পাড়ে গিয়ে আমাদের যেগুলো দিয়ে এসেছেন। আমাদের ধর্মকাতে
।১.১.১০২। স্বাসলে একটা মন্ত্র উপকার করে এসেছেন। সুত্রগুলো বয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে
।১.১.১০৩। আমাদের। ছাউনিতে খোজার কথা ভাবতামও না আমরা, পেতামও না।
।১.১.১০৪। আমাদের শয়তানি না ভেবে একটু ভাল করে ভাবলেই রহস্যটার সমাধান করে,
।১.১.১০৫। পারতেন। এই একটি বার আপনার কাছে হেরে যেতাম আমরা।’

১.১.৬। বড় বড় হয়ে গেল ফগের। ‘ঝামেলা! ওই কে. জি. ক্লাসের বই আর,
।১.১.১০৬। একটা ডিকশনারি সূত্র।’

১.১.৭। শাখা ঝাঁকাল কিশোর, ‘হ্যাঁ, সূত্র।’ কাপড়ের মোড়কটা আবার খুলে বইগুলো
।১.১.১০৭। সাজিয়ে রাখল সে।

১.১.৮। আগ্রহ নিয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। ‘উড়োচিঠি কে
।১.১.১০৮। আঁ ওনতে পেরেছে তুমি?’

‘পেরেছি, স্যার।’

১.১.৯। সামনে গলা বাঢ়িয়ে দিল ফগ।

।১.১.১০। সোজা করে বসলেন ক্যাপ্টেন।

১.১.১১। দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছেন মিসেস আমান।

১.১.১২। পিনপতন নীরবতা।

।১.১.১৩। কিশোর জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেনকে, ‘সব কথা আপনাকে বলেছেন, মিস্টার
।১.১.১৪। ক্যাপ্টেন? বাসে করে ডিয়ারহিলসে যাওয়া, তিনজন সন্দেহভাজনের নাম, এ
।১.১.১৫।’

‘গোলেছে।’

১.১.১৬। সময় বেঁচে গেল তাহলে। পুরো গঞ্জটা আর বল্টে হচ্ছে না আমাকে।’
।১.১.১৭। শাখা দিকে তাকাল কিশোর, ‘আন্টি, রান্নাঘরের বেলটা একটু বাজাই?’

।১.১.১৮।’

।১.১.১৯। গিয়ে ঘণ্টার বোতাম টিপল কিশোর।

।১.১.২০। চুক্তি মিসেস বিন। এত লোক দেখে অবাক হলো। মিসেস আমানকে
।১.১.২১। ক্যাপ্টেন, ‘আমাকে ডেকেছেন?’ গলা সামান্য কেঁপে গেল তার।

।১.১.২২। কিশোর ডেকেছে।’

।১.১.২৩। দিকে তাকালও না কিশোর। ক্যাপ্টেনকে বলল, ‘নিন, স্যার,

উড়োচিঠির লেখককে হাজির করে দিলাম।'

স্তন্ধ হয়ে গেলেন মিসেস আমান। ঘোৎ করে উঠল ফগ। চোখ কপালে উঠল
মুসা, রবিন আর ফারিহার। কেবল ক্যাপ্টেনের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল
না।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মিসেস বিনের মুখ। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ফুঁসে
উঠল, 'কি বলছ তুমি!'

'কেন, আপনি এই কথা অস্বীকার করছেন?' চিঠিকার করে উঠল মিসেস বিন।
'হ্যাঁ, করছি!' চিঠিকার করে উঠল মিসেস বিন।

'আস্তে কথা বলন। বসুন চুপ করে। কিশোর কি বলে শুনি।'

'আমি একটা চিঠিও লিখিনি!' আবার চেঁচিয়ে উঠল মিসেস বিন, আস্তে কথা
যেন বলতেই পারে না।

কিশোর বলল, 'হ্যাঁ, আপনি লিখেছেন।'

'তুমি তো একটা দুষ্ট ছেলে...'

'চুপ!' ধমক দিয়ে মিসেস বিনকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। 'কোন কথা
বলবেন না আর। আপনাকে যখন প্রশ্ন করা হবে, শুধু জবাব দেবেন। কিশোর,
বলো তোমার কথা।'

'আপনি তো জেনেছেন, স্যার, প্রতি সোমবারে ডিয়ারহিলস থেকে চিঠি পোর্ট
করা হত। অপরাধীকে ধরার জন্যে সোয়া দশটার বাসে করে সেখানে গেলাম
আমরা। কাউকে চিঠি পোস্ট করতে দেখলাম না। ফিরে এসে আরও খোজ-খন্দা
করলাম। জানতে পারলাম, আরও তিনজন নিয়মিত যায় সেখানে। তারা হলো
বুড়ো নরিস, মিস ব্যাটার আর মিস্ট্রেস বিন।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'জানি। ফগর্যাম্পারকটও এই লাইনেই কাজ
করেছে।'

ঘোৎ জাতীয় একটা শব্দ করে এ কথা মেনে নিল ফগ। কিশোরকে জিজেংস
করল, 'পোস্ট মার্কটা যে ডিয়ারহিলসের জানলে কি করে? নিশ্চয় খামগুলো দেখে
কি করে দেখলে?'

'সেটা বলার দরকার মনে করছি' না, লিলিকে ঝাঁচিয়ে দিতে চাইল কিশোর।
'আপনার না জানলেও চলবে। তাতে অপরাধী ধরতে কোন অসুবিধে হবে না।
আপনার। যাই হোক, পরদিন মঙ্গলবার ঠিকই উড়োচিঠি পেল গ্রীনহিলসের
আরেকজন, মিসেস উইলমার। খামটাতে কোন পোস্ট মার্ক নেই। ডাকে না।
পাঠিয়ে সরাসরি দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে আসা হয়েছে। সন্দেহভাজন সেট
তিনজনের প্রতি নজর দিলাম। সকাল সাড়ে ছয়টায় কে কোথায় ছিল খোঁজ
নিলাম।'

'কি বুঝলে, ফগর্যাম্পারকট?' ক্যাপ্টেন বললেন, 'এই কাজটা করার পথা
একবারও মনে এল না কেন তোমার? তাহলে অনেক এগিয়ে যেতে পারতে। তা
কিশোর, বলে যাও।'

'জানতে পারলাম,' কিশোর বলল, 'তিনজনেই ওই সময় রাস্তায় বেরিয়েছেন।

পড়ে গেলাম বেকায়দায়। একমাত্র হাতের লেখা যাচাই করে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।’

‘ভাল বুদ্ধি,’ স্বীকার করলেন ক্যাপ্টেন, ‘তবে কিছুটা জটিল।’

‘হ্যাঁ। লাল পরচুলা পরে মেসেঞ্জার-বয়ের ছদ্মবেশে তিনটা প্যাকেট নিয়ে বেরোলাম। একটা দিলাম বুড়ো নরিসকে। মাল বুঝে পেয়েছে যে সে-কথা লিখে নই দিতে বললাম। জানলাম, সে লেখাপড়া জানে না। তারপর গেলাম মিস নাটারের কাছে। তার হাতের লেখার সঙ্গে চিঠির লেখার কোন মিলই দেখলাম না। নাক রইল মিসেস বিন। গেলাম তার কাছে। উল্টোপাল্টা করে ছোট হাতের বড় হাতের অক্ষর মিলিয়ে লিখে দিল মিসেস বিন, যাতে আমি ধরতে না পারি।’

‘ইন্টারেস্টিং! তারপর?’

‘খুব বেকায়দায় পড়ে গেলাম। মনে হলো, কেসটার সমাধান বুঝি আর নাতেই পারব না। মিসেস বিনকে সন্দেহ তেমন করিনি, তাহলে হয়তো অন্য নান উপায় পেয়ে যেতাম। তার ওপর নজর রাখলেই কিছু একটা বেরিয়ে যেত। বে সমাধানটা সে নিজেই করে দিল একটা ছোট বোকামি করে, ছাউনিতে লুকিয়ে নাখতে গেল বইপত্রগুলো। সে স্বপ্নেও ভাবেনি, সেখানে খুঁজতে যাবেন মিস্টার নান্যাম্পারকট। আর আমরাও ভাবিনি খুঁজতে গিয়ে আমাদের জন্যে কাজটা এত নাখে করে দেবে।’

আবার ঘোৎ করে উঠল ফগ, ‘যাই হোক, আমাকে চিঠিটা নিশ্চয় তুমিই নাখেছ। মাথামোটা, বলদ বলে গাল দিয়েছ…’

‘না, ওটাও মিসেস বিনই লিখেছে। সেই সঙ্গে নিজেকেও একটা লিখেছে তার নাম থেকে সন্দেহ সরিয়ে নেয়ার জন্যে।’

‘আমি লিখিনি!’ চিৎকার করে উঠল মিসেস বিন। ‘মিথ্যে কথা বলছে দুষ্ট ফেন্টো।’

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। তাতেই চুপ হয়ে গেল নামেস বিন। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কি করে বুঝলে মিসেস বিনই নাখেছে, সেটা বলো।’

‘এখানে একটা ডিকশনারি আছে, স্যার, মুসার ডিকশনারি। এটা দেখে নান্যাজি করলাম পত্রলেখক ওদের বাড়িতেই থাকে। ভেতরে অনেকগুলো শব্দের নাম দেয়া, যে সব শব্দ চিঠিতে দেখেছি। বুঝলাম বানান জানে না, শব্দগুলো নাম নাই নে লেখার জন্যে ডিকশনারির সাহায্য নিয়েছে পত্রলেখক। তারমানে নামাপড়া খুব একটা জানে না সে।’

বিড়বিড় করল ফগ, ‘ঝামেলা! মুখ লাল হয়ে গেছে তার। নিজের হাতে নিয়ে নাম পত্রগুলো শক্ত হাতে তুলে দিয়ে এসেছে সে বোকার মত, এ কথা ভেবে মনে নাম নকশো একটা লাখি মারছে নিজেকে।

‘তারপর আছে একটা কপি বুক,’ বলে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল কিশোর।

‘নাপি বুক কেন?’ জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

‘শেখা নকল করার জন্যে। নিজের হাতের লেখা তো সাংঘাতিক খারাপ।

তাই কপি বুকের অক্ষরের ওপর কাগজ ফেলে একটা একটা করে অক্ষর পাশাপাশি সাজিয়ে লিখে শব্দ তৈরি করেছে। অনেক পরিশ্রম করেছে মিসেস বিন। অক্ষরগুলো বড় হওয়াতে চিঠির কাগজের সাইজও অনেক বড় হয়ে গেছে। চিঠিটা দেখতে হয়েছে বিচ্ছিন্ন। রহস্যময়ই বলা চলে। তবে তাতে অন্য রকম হয়ে গেছে হাতের লেখা। খুব সুন্দর হয়েছে, যদিও খানিকটা অঙ্গুত, কারণ সমস্ত শব্দগুলোই হয়েছে বড় হাতের, আর পেঁচানো। মনে হয়েছে যে লিখেছে অক্ষর সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান। ভুলেও মিসেস বিনকে কেউ সন্দেহ করবে না। ফাঁকিতে পড়েছিলাম আমরাও।

‘এবং রহস্যটা ও জমাট বেঁধেছিল,’ যোগ করলেন ক্যাপ্টেন।

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকাল কিশোর। শেষ বইটা দেখাল সে। ‘এটা বাসের টাইম টেবল। সোয়া দশটার বাসের নিচে দাগ দেয়া আছে। বইগুলো সব পেলেও সন্দেহ থেকে যেত, চট করে অপরাধীকে চিনে নিতে পারতাম না; যদি এই কাগজের টুকরোটা না পেতাম।’

‘কি এটা?’

‘বাজারের লিস্ট। কাগজটা ছিঁড়ে নিশ্চয় বইয়ের পাতায় চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল মিসেস বিন। মুসাদের বাজার-সন্দাই সে করে। লিস্টটা ও তারই লেখা। কয়েকটা অক্ষর খুব পরিচিত লাগল। মনে করতে পারলাম এ ভাবে কে লেখে। সুতরাঃ কাগজটা দেখে বুঝতে আর বাকি থাকল না আমার, পুঁটুলিটা ছাউনিতে কে লুকিয়ে রেখেছে।’

‘নাও এগুলো, ফগর্যাম্পারকট। রেখে দাও। প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে। দেখলে তো, বুদ্ধিটা হলো আসল জিনিস। নইলে যে কাজটা তোমার করার কথা ছিল, তোমাকে টেকা দিয়ে তোমারই বোকামির কারণে এই ছেলেমেয়েগুলো সেটা করে ফেলল। অথচ সূত্রগুলো তুমিই বয়ে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলে ওদের।’

কিশোরের কাছে থেকে বইগুলো নিয়ে গেল ফগ। তার মুখের অবস্থা দেখান মত। বলল, ‘আসলে, স্যার, রাগে মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল আমার।’

‘সেই জন্যেই অহেতুক রাগ করা উচিত না। মাথায় রাগ বাসা বেঁধে থাকলে চিন্তার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।’ মিসেস বিনের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, ‘মিসেস বিন, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে।’

প্রতিবাদ করল না আর মিসেস বিন। অ্যাপ্রনের একটা কোণ মুখে চাপা দিয়ে ফোঁপাতে শুরু করল।

‘এ কাজ কেন করলেন?’ জিজেস করলেন ক্যাপ্টেন।

‘বলতে পারব না,’ কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল মিসেস বিন। ‘দুনিয়ার গুণ মানুষের ওপরই রাগ আমার। ছোটবেলায় মানুষ আমাকে অনেক অত্যাচার করেছে। তারপর থেকেই তাদের ওপর রাগ। সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নিবে। ইচ্ছে করে।’

‘হ্যাঁ! এই প্রথম মহিলার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালেন ক্যাপ্টেন। বুঝলে, পারলেন দীর্ঘদিন মাথায় রাগ পুষে রাখতে রাখতে মানসিক রোগী হয়ে গেছে মিসেস বিন।

মায়ের দিকে তাকাল মুসা, ‘মা, কেস্টা হাতে নিয়েছিলাম বলে আশা করি
॥ গার আমাদের ওপর খুশি হবে তুমি?’

‘না,’ সাফ জবাব দিয়ে দিলেন মিসেস আমান। ‘কাজটা পুলিশের,
ঠাদেরকেই করতে দেয়া উচিত ছিল। তবে কিশোর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, এ কথা
মাকার করতেই হবে।’

কিশোর বলল, ‘আমি একা সমাধান করতে পারতাম না এ কেসের, এরা
সাহায্য না করলে,’ বন্ধুদের দেখাল কিশোর। ‘তবে আপনার সাহায্যটাই ছিল
খাসল, কি বলেন, মিস্টার ফগর্যাম্পারকট?’

লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল ফগের। ঝাঁঝাল স্বরে জবাব দিল, ‘ঝামেলা!’

* * *

স্পাইডারম্যান

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

একদিন স্কুলে ক্লাস করছে তিন গোয়েন্দা। টীচার হিউগ জনসন বায়োলজি পড়াচ্ছেন, ‘প্রকতিতে মাকড়সার জাল হলো একটা অতি বিচ্ছিন্ন জিনিস। বিস্ময়কর তার গঠন...’

কিন্তু বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীরই পড়ায় মন নেই। মাকড়সার জালের বিচ্ছিন্ন কাহিনীর চেয়ে ওদের কাছে ওই মুহূর্তে বড় আকর্ষণ হলো টেরিয়ার ডয়েল ওরফে শুঁটকি টেরি। তিন গোয়েন্দার চিরশক্তি। পাজির পাখাড়।

মাকড়সার জাল আঁকার জন্যে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ঘুরেছেন মিস্টার জনসন। এই সুযোগে নিচু হয়ে হাতের পেনিলটা জানালার দিকে গড়িয়ে দিল টেরি। ক্লাসের পড়ালেখা বাদ দিয়ে এক মহাশয়তানি করার মতলব এঁটেছে সে।

টাকি ও কড়ির দিকে তাকাল টেরি। শক্তি হলো, হেসে না ফেলে ওরা। তাহলে তার প্ল্যান বরবাদ হয়ে যাবে।

দু'জনেই টেরির বন্ধু। টাকির উচ্চতা কম। মোটাসোটা দেহ। লম্বা লম্বা চুল। নাকের ওপর মস্ত এক আঁচিল। আর কড়ির রেশমের মত লাল চুল। দেখলে মনে হবে রঙ উঠে গেছে। দাঁতের সঙ্গে চোখেরও সমস্যা। চশমা পরতে হয়। দাঁতে ব্রেইস লাগানো।

‘বড় একটা মাকড়সার জালে কমপক্ষে তেরো হাজার টুকরো সুতো থাকে,’ পড়াচ্ছেন মিস্টার হিউগ জনসন। চমক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে জাল আকতে শুরু করলেন তিনি। ‘প্রতিটি টুকরোতেই ভালমত লাগানো থাকে এক ধরনের আঠা, শিকার ধরার জন্যে।’

ডেস্ক থেকে নেমে গেল টেরি। পেনিল তোলার ছুতোয় জানালার কাছে চলে গেল সে। উবু হয়ে পেনিলটা তুলে নিল। খাতা দিয়ে পিটিয়ে জানালার কার্নিসে বসা তিনটে মাছি মারল। ওগুলোর মধ্যে বেশ বড় চকচকে একটা সবুজ মাছিও রয়েছে। তখনও পুরোপুরি মারা যায়নি মাছিটা, পা নাড়ছে।

মাছিগুলোকে নিয়ে ফিরে এসে একটা কাগজের টুকরো ভাঁজ করে খামের মত বানাল টেরি। তার মধ্যে রেখে দিল মাছিগুলোকে। তারপর এক সুযোগে মিস্টার জনসনের অলক্ষ্যে খামটা চালান করে দিল সামনের দিকে। টাকির কাছে। টাকির কাছ থেকে পৌছাল একেবারে সমনের সারির সীটে বসা কড়ির কাছে।

টেরির পরিকল্পনার প্রথম পর্ব শেষ। এবার দ্বিতীয় পর্ব।

‘তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ,’ মিস্টার জনসন বলছেন, ‘মাকড়সার জাল বানানি শক্ত আর কাজের জিনিস। দেখতেও ভারি সুন্দর। গ্রীষ্মের সকালে

মাঠের মধ্যে শিশিরে ভেজা মাকড়সাও তাণে। ১১০১১ ১৬খণ্ডে ১০ ময়ে ৫৩৩ক
হয়ে যেতে হয়।'

মিস্টার জনসনের আবার ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ফেরান অপেক্ষা নাই।
তার আশা পূর্ণ হলো। নিঃশব্দে সীট ছেড়ে পা টিপে টিপে মিস্টার জনসনের
টেবিলের কাছে চলে গেল সে। যে মগটা দিয়ে চা খান তিনি, সেটার মধ্যে ফেলে
দিল মাছিগুলোকে। দ্রুত ফিরে গেল নিজের সীটে।

টেরির পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্বও শেষ। এবার তৃতীয় পর্বের অপেক্ষা।

'আজকের আলোচনা শেষ করার আগে পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার থেকে একটা
কুইজ দেব।' ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাতে লাগলেন মিস্টার জনসন। 'পাঁচ নম্বর
চ্যাপ্টারটা সবাই পড়েছ তোমরা, তাই না?'

গুঙিয়ে উঠল ক্লাস ভর্তি ছেলেমেয়ে। প্রতিদিনই এ রকম কুইজ করতে দেন
তিনি ওদেরকে। ছেলেমেয়েদের তাঁকে দেখতে না পারার এটাও একটা বড়
কারণ। সে-জন্যেই টেরির শয়তানি নীরবে দেখে যায় ওরা। বাধাও দেয় না,
মিস্টার জনসনকেও সাবধান করে না।

মিস্টার জনসন ওদের আসল টীচার নন। আসল সাইন্স টীচার মিস্টার ক্রেগ;
তিনি ছুটিতে। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে পা ভেঙেছেন। দু'তিন মাস আসতে
পারবেন না। ওই কয় মাস পড়ানোর জন্যে মিস্টার ক্রেগের জায়গায় সাময়িক
ভাবে চার্কারিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে মিস্টার জনসনকে।

এ ধরনের বিকল্প টীচারদের ওপর ভক্তি-শুন্দা কিছুটা কমই থাকে অনেক
ছেলেমেয়ের। আর টেরি ও তার বন্ধুদের মত হলে তো কথাই নেই। পড়ালেখা
বাদ দিয়ে টীচারকে খালি জুলায়। বিকল্প স্যারেরা হোমওঅর্কও তেমন দেন-টেন
না। তবে মিস্টার জনসন তাঁদের মত নন। তিনি বরং বাড়তি খাটাতে চান।
ক্লাসের পড়ার বাইরেও পড়া দেন। পোকা-মাকড়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তিনি চান
ছাত্রছাত্রীরাও এ ব্যাপারে মনোযোগী হোক।

যাই হোক, কুইজটা কিসের ওপর, জানা আছে সবার। মাকড়সার ওপর।
এবং তাদের ধারণা ভুল হলো না।

ডেক্সে বসলেন মিস্টার জনসন। যেমন লম্বা তিনি, তেমনি পাতলা-ছিপছিপে
একেবারে তালপাতার সিপাই। রোগাটে দেহ। দেহের তুলনায় মাথাটা ছোট। পুরু
লেঙ্গের বিশাল ফ্রেমের বেমানান চশমা। মাথার তিন পাশ ঘিরে খাড়া খাড়া চুল।

অপেক্ষা করছে ক্লাসভর্তি ছেলেমেয়ে। মগে মাছি দেয়ার ব্যাপারটা স্যারকে
বলে দেবে কিনা ভাবছে কিশোর। কারণ মিস্টার জনসনের চা খাওয়ার সময় হয়ে
গেছে। ফ্লাক্ষ থেকে এখন মগে চা ঢালবেন তিনি।

কিন্তু চা না ঢেলে একটা মোটা বই টেনে নিলেন মিস্টার জনসন। অবশ্যই
মাকড়সার ওপর। পড়তে শুরু করলেন।

কুইজের প্রশ্নের জবাবগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল মুসা। বেশির ভাগ
জবাবই জানা নেই। পোকা-মাকড়ে তেমন আগ্রহ নেই ওর। মাকড়সা নিয়ে বেশি
পড়াশোনা করেনি। জবাবগুলো যে কি হবে, শিওর হতে পারল না। অনুমানে
জবাব দেয়া ছাড়া কিছু করার নেই। এ ভাবে আন্দাজে পরীক্ষা দিতে ভাল লাগে

না তার।

রবিন আর কিশোরের দিকে তাকাল সে। রবিন প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। কিশোর লিখে যাচ্ছে।

পারে না কি আর করবে। চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে রইল মুসা। নিজেকে বোঝাল, কি হবে মাকড়সাবিশেষজ্ঞ হয়ে? তারচেয়ে বরং কুইজ বাদ দিয়ে টেরির দিকে নজর দেয়া যাক। টেরি আর দোস্তরা কি করে দেখতে লাগল সে।

দলা পাকানো একটা কাগজ গিয়ে পড়ল টেরির মাথায়। ছুঁড়ে মেরেছে টাকি। ‘আউক!’ করে উঠল টেরি। ব্যথায় নয়, চমকে গিয়ে।

‘টেরিয়ার, কিছু বলবে?’ মিস্টার জনসন জিজ্ঞেস করলেন।

‘কে, আমি?’ বোকার মত জুলজুল করে তাকাতে লাগল টেরি।

ওর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে লাগল টাকি। টেরির বিব্রতকর অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছে।

‘শব্দ কোরো না,’ শান্তকর্ত্ত্বে মিস্টার জনসন বললেন। ‘কুইজ দিয়েছি। করো।’

মগের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি।

দুই

নিশ্চয় মগে এখন চা ঢালবেন মিস্টার জনসন-ভাবছে কিশোর। মাছিগুলো কি দেখতে পাবেন? না পেলে বলে দেবে, ঠিক করল কিশোর। টেরির শয়তানিতে যোগ দিয়ে শিক্ষককে মাছি খাওয়ানোর কোন যুক্তি নেই।

মগে চা ঢাললেন মিস্টার জনসন।

কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখে অবাক হয়ে গেল কিশোর। মাছিগুলো কি তিনি দেখতে পাননি? আশ্চর্য! রেগে উঠে ফেটে পড়া তো দূরের কথা, দেখতেই যেন পাননি। এই ভদ্রলোককে নিয়ে শুরু থেকেই একটা কৌতুহল ছিল কিশোরের। সেদিন সেটা আরও বাড়ল। কিছুই না বলে চুপ করে রইল। দেখতে চাইল তিনি কি করেন।

বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মগে চুমুক দিলেন মিস্টার জনসন।

দম বন্ধ করে ফেলল কিশোর নিজের অজান্তেই। ফিরে তাকিয়ে দেখল নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে টেরি।

‘ঘন ঘন কয়েকবার মগে চুমুক দিয়ে মগটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন মিস্টার জনসন। গভীর মনোযোগে পড়ছেন।

তীব্রণ অবাক লাগছে তখন কিশোরের। কিছুটা অস্বস্তিও। যে ভাবে মগের দিকে সরাসরি তাকিয়ে চা ঢেলেছেন তিনি, মাছিগুলোকে না দেখার কথা নয়। আর যদি কোন কারণে না-ই দেখে থাকেন, চা খাওয়ার সময় জিভে অবশ্যই

লাগার কথা। কারণ মরা মাছি চায়ের ওপরেই ভেসে থাকে।

আনমনে আবার হাত বাড়িয়ে মগটা তুলে নিলেন মিস্টার জনসন। চুমুক দিলেন কয়েকবার। এবার আর শেষ না করে টেবিলে রাখলেন না। কিছুই ঘটল না। কোন রকম প্রতিক্রিয়া হলো না তাঁর। রেগে উঠলেন না। ফেটে পড়লেন না। বরং মুখ তুলে শান্তকণ্ঠে জিজেস করলেন, ‘কি, লেখা হয়েছে তোমাদের? যাও, ক্লাস শেষ। কাগজগুলো আমার টেবিলে জমা দিয়ে যাও। আর হ্যাঁ, পরের চ্যাপ্টার, অর্থাৎ ছয় নম্বর চ্যাপ্টারটা কাল পড়ে আসবে। ভুলো না কিন্তু।’

সারি দিয়ে মিস্টার জনসনের টেবিলের দিকে এগোল ছেলেমেয়েরা। কিশোরের কাগজটা টেবিলে রাখল। প্রচণ্ড কৌতৃহল দমাতে না পেরে চা খাওয়ার মগটার ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে উঁকি দিল। চায়ের তলানি পড়ে আছে। কিন্তু একটা মাছিও নেই।

বিজ্ঞান ক্লাসটাই সেদিনের শেষ ক্লাস। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। বারান্দায় বেরিয়ে এসে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াল, দিনের বাকি সময়টা কি ভাবে কাটাবে সেটা নিয়ে মুসা ও রবিনের সঙ্গে আলোচনার জন্যে। আলোচনার এক পর্যায়ে অবশ্যই মাছির কথা উঠল।

‘মাছিগুলোকে কি খেয়ে ফেলেছেন মিস্টার জনসন, কি মনে হয় তোমার?’ জিজেস করল মুসা।

‘জানি না!’ বিমৃঢ়ের মত জবাব দিল কিশোর। ‘না খেলে গেল কোথায়?’

‘আমার মনে হয় মাছি খেতে পছন্দ করেন তিনি,’ রবিন বলল। ‘আজব লোক! গতকাল কি বলেছিলেন মনে আছে? মাছি, তেলাপোকা এগুলো নাকি পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষের প্রিয় খাবার।’

‘মাকড়সা খায় না তো কেউ?’ মুসার প্রশ্ন।

‘খেলে খাকগে। মাকড়সার কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। ওরা চালাক, ওরা সুন্দর, ওরা হেন, ওরা তেন...’ চোখ বড় বড় করে তাকাল রবিন। ‘ওই দেখো, মাকড়সার কথা বলতে না বলতেই মাকড়সা এসে হাজির।’

ভুরু কুঁচকে তাকাল মুসা। ‘হ্যাঁ, দেখা যাক, এটা কি রকম চালাক।’

ছোট একটা বাদামী রঙের মাকড়সা ভুক্ত করে দ্রুত উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। মাকড়সাটার দিকে এক পা বাড়িয়ে দিল মুসা। মুহূর্তে ঘুরে গিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে রওনা দিল মাকড়সাটা। ঝাট করে আরেকটা পা সেদিকে বাড়িয়ে দিয়ে মাকড়সাটার যাওয়ার পথ আটকে দিতে চাইল সে।

একটা সেকেন্ড নিখর হয়ে রাইল মাকড়সাটা। যেন কোনদিকে যাবে বোঝা র চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎ করেই দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল মুসার জুতোর ডগায়। পা বেয়ে দৌড়ে উঠে আসতে শুরু করল।

‘খাইছে!’ চিৎকার করে উঠল মুসা। ‘চালাকই তো! ভীষণ চালাক।’

বাড়া দিয়ে পা থেকে মাকড়সাটাকে ফেলার চেষ্টা করল সে।

পড়ল না মাকড়সাটা। একই ভাবে উঠে আসতে থাকল।

হাত দিয়ে তখন ঝেড়ে ফেলে দিল ওটাকে।

সিঁড়িতে পড়ল মাকড়সাটা।

‘কি ব্যাপার, ভয় পাচ্ছ নাকি?’ জিজেস করল কিশোর।

‘ভয় যতটা না পাচ্ছি, তারচেয়ে বেশি লাগছে অস্বস্তি,’ জবাব দিল মুসা।
বিচ্ছিরি প্রাণীগুলোকে দু’চোখে দেখতে পারি না আমি।’

পা দিয়ে মাড়িয়ে মাকড়সাটাকে ভর্তা করে দিল সে।

ঠিক এই সময় একটা লম্বা কালো ছায়া এসে পড়ল ওদের ওপর।
চমকে ফিরে তাকাল তিনজনেই।

তিনি

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে ঠিক ওদের মাথার পেছনে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার জনসন।
ছায়াটা তাঁরই!

এমনিতে তাঁকে বড়ই নিরীহ মনে হয়। কিন্তু ওই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর লাগল
তাঁকে। ঠোঁট সরে গেছে মাটীর ওপর থেকে। বেরিয়ে পড়েছে চোখা চোখা
দাঁতগুলো। গলা দিয়ে অস্তুত একটা ঘড়ঘণ্ডে আওয়াজ রেরোতে থাকল।

কঙ্কালের মত হাড়িসার আঙ্গুল দিয়ে মুসার একটা হাত চেপে ধরলেন তিনি।
টান দিয়ে বললেন, ‘এসো আমার সঙ্গে!’

তাঁর কথা বলার ভঙ্গি আর কষ্টস্বর শিরশিরে কাঁপুনি তুলল কিশোরের
মেরুদণ্ডে। ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমাদের ব্যবস্থা পরে করব
আমি।’

মুসাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেলেন মিস্টার জনসন।

‘কি করব! রবিন বলল। বাড়ি চলে যাব?’

মাথা নাড়ল কিশোর, ‘উহ, মুসাকে কি করেন, না দেখে যাব না। চলো,
ওপাশ দিয়ে ঘুরে মিস্টার জনসনের ঘরের কাছে চলে যাই। জানালা দিয়ে উঁকি
দিয়ে দেখব।’

স্কুল বিল্ডিঙের পাশ ঘুরে অন্য পাশে চলে এল দু’জনে। মাথা নিচু করে
নিঃশব্দে গুড়ি মেরে হেঁটে এসে দাঁড়াল জানালাটার নিচে। খুব সাবধানে ধীরে
ধীরে মাথা তুলে তাকাল।

নাহ, খারাপ কিছুই ঘটছে না। অন্তত দেখে সে-রকম মনে হলো না। ডেক্সে
দুই কনুই রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন মিস্টার জনসন। মুসাকে বসিয়ে
রেখেছেন তাঁর মুখোমুখি। চিঢ়কার করছেন না। ধমক দিচ্ছেন না। ছেট একটা
ঘড়িকে টেবিলে রেখে আঙ্গুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে নিচু স্বরে কথা বলছেন
মুসার সঙ্গে। তাঁর কথায় একমত হয়েই যেন ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছে মুসা। সায়
দিচ্ছে মিস্টার জনসনের কথায়। কথাগুলো এতই নিচু স্বরে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে
পারল না কিশোররা।

বার্নার্ডার সিঁড়িতে আর ফিরে গেল না। গেটের কাছে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে
থাকল। অবশেষে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। এগিয়ে এল ওদের দিকে।

‘মিস্টার জনসন কি বললেন তোমাকে?’ জানার জন্যে তর সইছে না রবিনের।

‘টেরি যে তাঁর চায়ের মগে মাছি ফেলল, এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন নাকি?’ জানতে চাইল কিশোর।

তার কথার ধার দিয়েও গেল না মুসা। একঘেয়ে কঢ়ে বিড়বিড় করে বলল, ‘মাকড়সারা আমাদের বন্ধু। অতি উপকারী প্রাণী। কখনও...কখনও...কখনোই ওদের ক্ষতি করা উচিত না আমাদের।’

‘রসিকতা করছ নাকি?’ হাসল রবিন।

‘কখনও...কখনও...কখনোই মাকড়সাদের ক্ষতি করা উচিত না আমাদের,’ একই রকম ভঙ্গিতে একঘেয়ে কঢ়ে বলল মুসা। ‘ওরা বড়ই বুদ্ধিমান প্রাণী। জানো তোমরা? ওরা আমাদের বন্ধু।’

‘যখন তোমার পা বেয়ে ওঠে, তখনও? পায়ে সুড়সুড়ি দেয়, কুট করে কামড়ে দেয় চামড়ায়, তখনও বন্ধু?’ জিজ্ঞেস করল রবিন। হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে।

‘কখনও...কখনও...কখনোই মাকড়সাদের ক্ষতি করা উচিত না আমাদের,’ রবিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি মুসা।

হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের দিকে এগোল ওরা।

মোড়ের কাছে পৌছে কিশোর বা রবিন কাউকে কিছু না বলে ঘুরে সোজা বাড়ির পথ ধরল মুসা।

‘ও তো রোবটের মত আচরণ করছে,’ অবাক হয়ে বলল কিশোর।

‘রোবট না। জোন্সি,’ রবিন বলল। ‘ওই যে, যারা...’

‘যারা কি?’

‘যারা, জেগে থেকেও থাকে না, মনে হয় ঘোরের মধ্যে রয়েছে, তাদের মত। কিন্তু মুসা ওরকম আচরণ করল কেন? মগজ ধোলাই করে দিয়েছেন নাকি মিস্টার জনসন? সম্মোহিত করেছেন?’

‘সেটাই জানতে হবে আমাদের,’ চিন্তিত স্বরে বলল কিশোর। ‘মিস্টার জনসনের বাড়ি যাব। তাঁর ওপর নজর রাখতে হবে।’

‘লাভটা কি? কি পাব ওখানে?’

‘জানি না। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি, মিস্টার জনসন একজন অতি অস্ত্রুত মানুষ। আর মুসার মগজ ধোলাই করে তার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি উধাও করে দিয়েছেন তিনি। আমাদেরকেও ছাড়বেন না। বলেছেনই তো, আমাদের ব্যবস্থা তিনি পরে করবেন। তার আগেই তাঁকে ঠেকাতে হবে।’

‘তিনি কোথায় থাকেন জানো নাকি?’ জিজ্ঞেস করল রবিন।

‘জানি। ওয়ারনার জুন রোডের পুরানো বাড়িটাতে।’

‘বনের মধ্যের সেই পোড়ো বাড়িটা!’ রবিন অবাক।

‘হ্যাঁ। ঠিক সাতটার সময় আমাদের বাড়িতে চলে এসো। অঙ্ককার হলেই বেরিয়ে পড়ব আমরা। ভয় লাগছে?’

‘প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রবিন। ‘সময় মত পৌছে যাব তোমাদের বাড়িতে। চলি এখন।’

চার

শহর থেকে ওয়ারনার জুন রোডটা বেশি দূরে না। তবে ঘন বন একেবারে রাস্তায় এসে ঠেকেছে। সব কিছুই ছায়ায় ঢাকা। পাইন বনের মাথার ওপর দিয়ে গুঙিয়ে ফেরে ঝোড়ো বাতাস।

মূল রাস্তা থেকে নেমে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে এগোল কিশোর আর রবিন। বাড়িটার কাছে পৌছাল।

‘লোকটা পাগল নাকি?’ না বলে পারল না কিশোর। ‘এ রকম একটা জায়গায় বাস করেন! নিশ্চয় কোন কারণ আছে। অন্তুত কিছু ঘটাচ্ছেন বাড়িট র ভেতর। কারণ ছাড়া এ রকম একটা জায়গায় পাগলেও থাকতে আসবে না।’

ড্রাইভওয়েতে মিস্টার জনসনের পাড়িটা দেখতে পেল দু’জনে। বাড়ির পেছনের ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে পা টিপে টিপে এগোল, কোন রকম শব্দ না করে।

‘অন্তুত এক অনুভূতি হচ্ছে আমার,’ ভয়ে ভয়ে বলল রবিন। গলা কাঁপছে তার।

‘আমারও,’ বলল কিশোর। ‘সমস্ত ঝোপঝাড়গুলো মাকড়সার জালে ভরা, লক্ষ করেছ? সবখানে আছে। চোখেমুখে লাগছে।’

চোখেমুখে মাকড়সার জাল লাগলে ভীষণ বিরক্ত লাগে। লেগে গেলে ছাড়ানো কঠিন। আটকে থাকে। খুলতে গেলে আরও বেশি করে জড়ায়। হাত নেড়ে নেড়ে, ঝাড়া দিয়ে ওগুলো খোলার চেষ্টা করতে থাকল কিশোর আর রবিন। আর তা করতে গিয়ে বড় বেশি শব্দ করে ফেলতে লাগল। কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল ঘন বনের মধ্যে।

‘পেছন দিয়ে বারান্দায় উঠে পড়লে ভাল হবে,’ ফিসফিস করে বলল কিশোর। ‘উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতরে দেখতে সুবিধে হবে।’

আবার এগিয়ে চলল বাড়িটার দিকে। আগে আগে রয়েছে কিশোর। পৌছে গেল বারান্দার সিঁড়ির কাছে। বেয়ে উঠতে গিয়ে কাঠের সিঁড়ি ক্যাচকোঁচ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল সে। কাঁটা দিতে লাগল গায়ে। তার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে হৃমড়ি খেয়ে পড়ল রবিন।

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল দু’জনে।

কিছুই ঘটল না।

বারান্দায় উঠল ওরা।

মাথা নুইয়ে রেখে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে জানালার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। জানালার কাছে গিয়ে আস্তে করে মাথা তুলে উঁকি দিল ভেতরে। জানালার কাঁচে ময়লা লেগে আছে। তবে ভেতরটা দেখা যায় তার মধ্যে দিয়ে।

ঘরের ভেতরে কিছুই নেই। কিছু না।

আসবাব নেই। বাতি নেই। ঘর ভর্তি রয়েছে শুধু জাল আর জাল। মাকড়সার জাল। মানুষ বসবাসের কোন চিহ্নই নেই।

তাই বলে অসাবধান হলো না ওরা। এ ঘরে নেই, অন্য ঘরে থাকতে পারে। গাড়িটা যেহেতু আছে, মিস্টার জনসনও আছেন। এগিয়েছিল যেমন করে, তেমনি নিঃশব্দেই আবার পা টিপে টিপে বারান্দা থেকে নেমে এল ওরা।

মিস্টার জনসনকে না দেখে খানিকটা হতাশই লাগছিল। বনের দিকে ফিরে যাচ্ছে, এই সময় আলো চোখে পড়ল। বেসমেন্ট অথাৎ মাটির নিচের ঘর থেকে আসছে। জানালা দিয়ে।

পাঁচ

ঝোপের ভেতরে ভেতরে এগোল দু'জনে।

ছোট্ট জানালাটার কাছে গিয়ে থামল।

জানালার কাঁচে এত ময়লা, তার মধ্যে দিয়ে অন্যপাশে দেখাটা কঠিন। যতখানি নজরে এল, তাতে অনুমান করতে অসুবিধে হলো না, কোন ধরনের গবেষণাগার রয়েছে ঘরটাতে। ওদের স্কুলের সাইন্স ল্যাবরেটরিটার মত।

কি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে দেখার আর সুযোগ হলো না। উকি দেয়ার দু'তিন সেকেন্ডের মধ্যেই একটা দরজা খোলার শব্দ কানে এল ওদের। ভারী পদশব্দ এগিয়ে আসতে লাগল বারান্দা ধরে।

'কে ওখানে?' চি�ৎকার করে উঠলেন মিস্টার জনসন। মোটেও খুশি মনে হলো না তাঁকে।

বরফের মত জমে গেল যেন কিশোর আর রবিন।

দুপদাপ করে পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন মিস্টার জনসন। ওদের ভাগ্য ভাল, উল্লো দিকে ঘুরে গেলেন তিনি। কিশোররা কোনখানে রয়েছে বুঝতে না পেরে অন্য দিকে ঝুঁজতে গেলেন।

এই সুযোগে দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে আবার ঘন ঝোপের ভেতর তুকে পড়ল দু'জনে। তারপর পা টিপে টিপে পিছিয়ে যেতে শুরু করল বাড়িটার কাছ থেকে।

কিছুদূর গিয়ে মিস্টার জনসন কেনাদিকে গেছেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চাইল কিশোর। মাটিতে পড়ে থাকা টিনের পুরানো বালতিটা দেখতে পেল না। হাঁটতে গিয়ে পা লাগল তাতে। লাথি লেগে কাত হয়ে গেল বালতিটা। নীরবতার মাঝে বিকট শব্দ তুলে গড়তে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

'থামো! দাঁড়াও!'

কর্কশ আদেশ শোনা গেল,

অদ্রুত কঁষ্টা! যেন মানুষের কঁষ্টই নয়!

‘এসো এখানে। জলদি এসো! অ্যাহি, এসো বলছি!’ আবার আদেশ শোনা গেল। মিস্টার জনসনের নয়।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলল কিশোরের মাথায়।

কি করবে? থামবে? এগিয়ে যাবে? নাকি পিছাবে?

কিছুই করল না। বরং সাড়া না দিয়ে চুপ করে রইল দু’জনে।

আরও কয়েকবার ডেকে জবাব মা পেয়ে চুপ হয়ে গেল লোকটা।

কিশোররাও আর তাঁর গবেষণাগারে উকি দেয়ার সাহস করল না সেদিন।
বাড়ি ফিরে গেল।

*

পরদিন স্কুলে গিয়ে ভয়ে ভয়ে রইল দু’জনে, কখন ধরে বসেন মিস্টার জনসন।
রাতে ওরা তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল নাকি-জিজেস করলে কি জবাব দেবে ভাবতে
লাগল কিশোর। তবে ক্লাসে চুক্তে ওদের দু’জনের দিকে তাকালেনই না তিনি।
পড়ানো শুরু করলেন।

মুসা তার সেই ‘জোম্বি’ অবস্থাতেই রয়েছে। কোন রকম ভাবান্তর নেই
চেহারায়। চুপচাপ। অন্য দিনের মত আলাপ জমানোর চেষ্টা করল না কিশোর বা
রবিনের সঙ্গে। মাকড়সা ছাড়া আর কোন কথা নেই যেন ওর মুখে। দুই গোয়েন্দা
নিশ্চিত হলো, আসলেই কিছু একটা হয়েছে ওর। ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

‘কিছু কিছু লোক আছে, আমাদের মাকড়সা বন্ধুদের পান্তাই দিতে চায় না,’
লেকচার শুরু করলেন মিস্টার জনসন। তাঁর মুখেও মাকড়সা ছাড়া যেন আর কিছু
নেই। আর কোন বিষয় নেই পড়ানোর।

‘যেহেতু প্রাণীগুলো ছোট,’ বলে যাচ্ছেন তিনি। ‘কিছু কিছু লোক আছে,
অকারণে ওদেরকে ঘাড়া দিয়ে ফেলে দেয়। পা দিয়ে মাড়ায়।’

তাঁর নির্বিকার ভাবভঙ্গি দেখে স্বত্ত্বাস নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর আর রবিন।
ওদেরকে তিনি সন্দেহ করেননি। বুঝতে পারেননি, আগের রাতে ওরাই তাঁর
বাড়িতে গিয়েছিল।

‘মাকড়সাদের খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব,’
ক্লাসের এ মাথা ওমাথা জুড়ে হেঁটে বেড়াতে শুরু করলেন মিস্টার জনসন।
‘মাকড়সারা কখনও মড়া খায় না। ওদের পছন্দ জ্যান্ত প্রাণী।’ রবিনের কানের
কাছে ঝুঁকে শেষ কথাটা এমন করে বললেন তিনি, সীট থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠল
রবিন।

‘হ্যাঁ, শুধু জ্যান্ত প্রাণীই খায় ওরা। জালের ফাঁদ পেতে পোকা ধরে। শিকার
জালে পড়া মাত্র ছুটে যায় মাকড়সা। সিক্কের সুতো দিয়ে জড়িয়ে ফেলে
শিকারকে। গতকাল ওই সুতোর কথা কি বলেছিলাম, মনে আছে, কিশোর?’

চশমার পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।
চোখ দুটো জুলছে।

মরিয়া হয়ে মনে মনে জবাব খুঁজতে লাগল কিশোর। স্মরিটা ফাঁকা হয়ে
থাকল। মাকড়সার সিক্কের সুত্তের ব্যাপারে কি বলেছিলেন মিস্টার জনসন, মনে
করতে পারল না।

‘মনে নেই, স্যার,’ সত্ত্ব কথাটাই বলল কিশোর।

‘আমি বলেছিলাম, এই সুতো ভীষণ শক্তি,’ মিস্টার জনসন বললেন। ‘নাইলনের চেয়ে শক্তি, ইস্পাতের চেয়ে মজবুত, মানুষের তৈরি যে কোন জিনিসের চেয়ে টেকসই। কাজেই যদি একবার মাকড়সার জালে জড়িয়ে যায় কোন পোকা, তার আর মুক্তি নেই।’

মাকড়সাদের শিকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভাবভঙ্গি বদলে গেল মিস্টার জনসনের। ভয়ঙ্কর লাগছে এখন তাঁকে।

‘সেই ভয়ন্ত মজবুত সিংহের সুতোয় আটকে পড়ার পর কি ঘটে, বলো তো?’ ক্লাসকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

‘আমি জানি, স্যার,’ হাত তুলল মুসা। ‘পোকাটার গায়ে দাঁত ফুটিয়ে দেয় মাকড়সাটা।’

‘গুড বয়, মুসা,’ মিস্টার জনসন বললেন। ‘ঠিক বলেছ। পোকাটার গায়ে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে জ্যান্তি রেখেই ওটাকে খেতে শুরু করে। সমস্ত রস শুষে খেয়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলে পোকাটাকে। এই হলো মাকড়সার খাওয়ার কায়দা।’

মিস্টার জনসনের আলোচনার ধরনটাই কেমন ভীতিকর। গায়ে শিহরণ তোলে।

‘আমি তোমাদের বলেছি, মাকড়সারা আমাদের বন্ধু,’ মিস্টার জনসন বলে যাচ্ছেন। ‘কিন্তু তাই বলে ওদের নির্বিষ ভাবাটা ঠিক হবে না। রুয়াক উইডো স্পাইডারের নাম নিশ্চয় তোমরা শুনে থাকবে। ছোট জাতের মাকড়সা। পায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেও হয়তো টের পাবে না।’

বাঁকা চোখে কিশোর আর রবিনের দিকে তাকালেন তিনি। ‘কিন্তু যদি একবার তোমার শরীরে দাঁত ফোটতে পারে, তাহলে বুঝবে শেষ। স্রেফ খুন হয়ে যাবে। খুদে একটা রুয়াক উইডোর কামড়ে ঘোড়া পর্যন্ত মরে যায়, এতই বিষাক্ত। কাজেই মাকড়সাদের কাছে আত্মরক্ষার অস্ত্র নেই এটা যারা ভারে, তারা নেহাতই বোকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মাকড়সারা তাদের প্রতি সম্মান দাবি করতে পারে। নাকি?’

ঘরের পেছন দিকে বাখা আলমারির কাছে চলে গেলেন তিনি। জুতোর বাস্ত্রের সমান একটা বাস্ত্র নিয়ে ফিরে এলেন। কি দেখাবেন তিনি? ক্লাস ভর্তি ছেলেমেয়ে সবাই খুব কৌতুহলী হয়ে উঠল।

বাস্ত্রের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। বের করে আনার পর দেখা গেল তাঁর হাতের তালুতে বসে আছে বিশাল, রোমশ, ভয়ঙ্কর চেহারার একটা মাকড়সা।

অস্ফুট চিন্কার করে উঠল কেউ কেউ। জোরাল গুঞ্জন।

‘এটাই সেই বিখ্যাত টারানটুলা মাকড়সা,’ মিস্টার জনসনের ভঙ্গি দেখে মনে হলো ক্লাসকে ভয় দেখাতে পেরে বেশ মজা পাচ্ছেন তিনি। ‘এত খুদে নয় এটা। কাজেই কিছুটা সম্মান অন্তর একে দিতে পারো। চাইলেই চট করে পায়ের নিচে পিষে মারতে পারবে না এটাকে। এমনকি একে দেখলে, ভয়ও পাবে। এই এখন যেমন পাচ্ছ।’

আচমকা মাকড়সাটাকে রবিনের নাকের নিচে ঠেলে দিলেন মিস্টার জনসন। চিৎকার দিয়ে সীট থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন।

রবিনকে ভয় দেখানোর পর যে সারিতে কিশোর বসে আছে, সে-সারির দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে বললেন, ‘ভয় তোমাদেরকে পেতেই হবে। টারান্টুলারা শিকারী মাকড়সা। এরা জাল বোনে না। ফাঁদ পাতে না। গর্তে বাস করে। শিকার দেখলে ছুটে বেরিয়ে এসে শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরে গর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, টারান্টুলারা কামড়াতেও পারে।’

হাত থেকে মাকড়সাটাকে ছেড়ে দিলেন তিনি।

কিশোরের হাতের ওপর পড়ল ওটা।

‘দুঃখিত, কিশোর,’ খুশি খুশি গলায় বললেন মিস্টার জনসন।

আতঙ্কে জমে যাওয়ার জোগাড় হলো কিশোরের, কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না। মাথা ঠাণ্ডা রাখল। রবিনের মত লাফিয়ে উঠল না। চিৎকারটা আটকে রাখল বহু কষ্টে। আশা করল-এটা পোষা মাকড়সা, কামড়াবে না।

কিশোরের হাত বেয়ে ওপরের দিকে উঠে এল মাকড়সাটা। ওটার ধারাল চোয়াল দেখতে পাচ্ছে সে। ঠেলে বেরোনো কুতকুতে চোখ দেখতে পাচ্ছে।

মিনিটখানেক তাকে ভুগিয়ে তারপর মাকড়সাটাকে তুলে নিলেন মিস্টার জনসন।

‘কিশোর তো খুব মজা পেয়েছে। রোমশ এই চমৎকার মাকড়সাটাকে নিয়ে আর কেউ খেলা করতে চাও?’ আহ্মান জানালেন তিনি।

কিন্তু কেউ আগ্রহ দেখাল না।

‘দেখলে তো? নিজেরাই প্রমাণ করে দিলে, মাকড়সাদের কেউ পছন্দ করো না,’ তিনি বললেন। ‘কুকুর ভালবাসো, বিড়াল ভালবাসো, পাখি ভালবাসো, কিন্তু মাকড়সাকে নয়। মাকড়সার প্রতি কোন ভালবাসা নেই কারও। সম্মান দেখাতে জানো না। অথচ কুকুর-বিড়াল-পাখির চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান হলো এই মাকড়সারা। কুকুর কি জাল বুনতে পারে? বিড়াল কি মাকড়সার মত করে শিকার ধরতে পারে? পারে না। তারপরেও কেন আমরা মাকড়সাকে পাত্তা দিই না? আকারে ছোট বলে। যদি বড় প্রাণী হতো, তাহলে পিচ্চয় সম্মান দেখাতাম। তোমার কি মনে হয়, কিশোর পাশা?’

‘আমারও তাই মনে হয়, স্যার,’ ভয়ে ভয়ে জবাব দিল কিশোর।

‘তা তো মনে হবেই। কারণ সত্য তোমরা গুরুত্ব দাও না এই বুদ্ধিমান প্রাণীটিকে। যাই হোক, কুইজের সময় হলো।’

আগের রাতে হোমওঅর্ক ঠিক মতই করেছিল। তাই কুইজের প্রায় সব প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারল কিশোর।

ঘণ্টা বাজলে মুসা ও রবিনকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

‘কেমন লাগছিল, কিশোর?’ রবিন জিজ্ঞেস করল। ‘ভয়ঙ্কর ওই প্রাণীটা যখন তোমার হাতে হাঁটছিল, অনুভূতিটা কেমন ছিল?’

‘জঘন্য! কামড়ে দিতে পারে সেই ভয়ে হাত নাড়ানোরও সাহস পাইনি।’

‘মাকড়সাদেরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই,’ রোবটের মত যান্ত্রিক কণ্ঠে বলে উঠল মুসা। ‘মাকড়সারা আমাদের বন্ধু।’

‘তা তো বটেই,’ রেগে গেল রবিন। ‘চামড়ায় যখন চোয়ালের কাঁটা ফুটাবে, তখন টের পাবে কি রকম বন্ধু।’

‘কাল রাতে তোমরা মিস্টার জনসনের বাড়িতে গিয়েছিলে নাকি?’ জানতে চাইল মুসা।

মুসার অলঙ্কে তাড়াতাড়ি রবিনকে চোখ টিপল কিশোর। মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জবাব দিতে মানা করল।

বুঝতে পারল রবিন। প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে পাল্টা প্রশ্ন করল মুসাকে, ‘এ রকম একটা ধারণা হলো কি করে তোমার?’

‘রবিন,’ কিশোর বলল, ‘বাড়ি যাওয়া দরকার আমাদের। মুসা, প্রের দেখা হবে।’

মুসাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার সামনে কোন কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। সেজন্যেই চালাকি করে তার সামনে থেকে রবিনকে সরিয়ে আনল।

মুসার সামনে মাকড়সা কিংবা মিস্টার জনসনকে নিয়ে কোন কথা বলতে মানা করে দিল রবিনকে। মুসার মগজটাকে ধোলাই করে ‘জোম্বি’ বানিয়ে দিয়েছেন মিস্টার জনসন, ওকে বশ করেছেন, এখন তাকে দিয়ে গুপ্তচরগিরি করালেও অবাক হব না। কিশোর আর রবিনকে এখন সন্দেহ করেন তিনি। মুসাকে লাগিয়ে দিয়েছেন ওদের কাছ থেকে খবর আদায় করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

‘বনের মধ্যের ওই বাড়িটাতে কিছু না কিছু ঘটছেই,’ রবিনকে বলল কিশোর। ‘সেটা কি, জানতেই হবে আমাদের।’

‘তারমানে আবার যেতে চাও সেখানে?’

‘হ্যাঁ, চাই।’

ছয়

সে-রাতে রবিন আর কিশোর মিলে আবার রওনা হলো বনের দিকে। মিস্টার জনসনের বাড়িতে। রহস্যটার একটা কিনারা না করা পর্যন্ত স্বত্ত্ব পাচ্ছে না।

বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে, এমন সময় ওদের পেছনে গাড়ির শব্দ শুনল। ফিরে তাকিয়ে দুটো হেডলাইট ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। কিশোররা তখন এমন এক জায়গায় রয়েছে, যার একদিকে পাথুরে পাহাড়, আরেক দিকে নদী। লুকানোর কোন জায়গাই নেই।

আর কোন উপায় না দেখে দৌড়ানো শুরু করল। ওরা ভাবল, গাড়িটা মিস্টার জনসনের। দেরি করে বাড়ি ফিরেছেন।

ওরা যত জোরে দৌড়ায়, গাড়িটা তার চেয়ে জোরে ওদের দিকে ছুটে আসে।
উজ্জ্বল আলোর বন্যা এসে ঝাপিয়ে পড়ল যেন ওদের ওপর।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল দু'জনে। কিন্তু অতিরিক্ত খাড়া
ঢাল।

লাউডস্পীকারে গমগম করে উঠল একটা ভারী কণ্ঠ, ‘যেখানে আছ,
সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।’

পাথর হয়ে গেল যেন দু'জনে।

গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হলো।

আলোর জন্যে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না ওরা। হেডলাইটের আলো চোখ
ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এরই মাঝে অস্পষ্টভাবে একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে
দেখল।

আলোর এ পাশে বেরিয়ে এল মূর্তিটা। চিনতে পারল ওরা। শহরেরই
একজন পুলিশ অফিসার। নাম এডগার রাইলি। তিন গোয়েন্দাকে চেনে সে। নাম
জানে। জিঞ্জেস করল, ‘কিশোর! তোমরা এখানে কি করছ?’

‘আমাদের টীচার মিস্টার জনসনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম,’ জানাল
তাকে।

‘উনি এখানে থাকেন?’ রাইলি অবাক। ‘এই বনের মধ্যে! আমি তো জানতাম
বাড়িটা খালি পড়ে আছে বছুদিন থেকে। কেউ থাকে না এখানে।’

‘তা-ই ছিল। কিছুদিন হলো এসেছেন তিনি।’

‘অ। রাস্তার ওদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা লোক আমাকে বলল, দুটো
ছেলেকে এদিকে আসতে দেখা গেছে। তার ধারণা, ছেলেগুলো পথ হারিয়েছে।
সেজন্যেই দেখতে এসেছিলাম। জায়গাটা ভাল না। ঘন বন।’ থাপ্পড় দিয়ে মশা
মারল রাইলি। ‘মশাও তো দেখছি মেলা।’

রবিন বলল, ‘যেমন মশা, তেমনি মাকড়সা। আরও যে কি কি আছে খোদাই
জানে।’

‘মশার চেয়ে মাকড়সারা বেশি বিপজ্জনক। অনেক মাকড়সার কামড়ে মানুষ
মারাও যায়। মাকড়সা বেশি থাকলে বিপদের কথা,’ রাইলি বলল। ‘বাড়ি যাবে কি
করে? আমার গাড়িতে যেতে চাইলে চলো? পৌছে দিই।’

রাজি হলো না কিশোর। বলল, টীচারের সঙ্গে দেখা না করে যাবে না।

ওদের সাবধানে থাকতে বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেল রাইলি।

পেছনের লাল বাতিটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর আফসোস হতে লাগল
কিশোরের। মনে হলো—ওর সঙ্গে চলে গেলেও পারতাম। গাঢ় অঙ্ককারৈ এ ভাবে
গোয়েন্দাগিরি করতে যাওয়াটা কোন মজার ব্যাপার নয়। কিন্তু রহস্যময় টীচারের
উদ্ভৃত কাণ্ডকারখানার রহস্য ভেদ না করে যেতেও ইচ্ছে করছে না। রবিনকে নিয়ে
আবার এগোল কিশোর।

বাড়িটা আগের রাতের মতই অঙ্ককার। মাটির নিচের ঘর থেকে কেবল মৃদু
আলো আসছে।

ঝোপের ভেতরে ভেতরে হামাঙ্গি দিয়ে এগোল দু'জনে। মাকড়সার জাল

এদিকটায় অনেক বেশি ঘন। মুখে, মাথায় জড়িয়ে যেতে থাকল।

মাটির নিচের ঘরটার ছোট জানালার কাছে গিয়ে নিচে উঁকি দিল। এটা যে ল্যাবরেটরি তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। মন্ত এক টেবিল ভর্তি নানা রকম ফ্লাক্স আর টেস্ট টিউব। বীকার থেকে বীকারে নল যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। কতগুলো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের লাল আলোগুলো এমন করে জুলছে-নিভছে যেন পাগল হয়ে গেছে।

‘মিস্টার জনসনকে দেখা যাচ্ছে?’ ফিসফিস করে জিজেস করল তাকে রবিন।

‘না।’

ভাল করে দেখার জন্যে মাথাটাকে আরও সামনে বাড়িয়ে দিল কিশোর।

মিস্টার জনসনকে দেখা গেল না কোথাও।

ঘাবড়ে গেল সে। ওদেরকে ধরার জন্যে অঙ্ককারে কোথাও ঘাপটি মেরে নেই তো?

‘কি বুঝছ?’ প্রশ্ন করল রবিন।

‘মিস্টার জনসন কোন ধরনের গবেষণা করছেন এখানে,’ জবাব দিল কিশোর।

‘গবেষণাগার, না আজব রান্নাঘর?’ রসিকতা করল রবিন। ‘পোকা-মাকড়ের অষ্ট-ব্যঙ্গন রান্না করছেন নাকি?’

‘চুপ, ওই যে আসছেন!’ সাবধান করে দিল কিশোর।

আরেকটা ঘর থেকে গবেষণাগারে ঢুকলেন মিস্টার জনসন। কয়েকটা যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিলেন সব ঠিকমত চলছে কিনা। কমলা রঙের তরল পদার্থ ভরা একটা ফ্লাক্স তুলে নিয়ে চলে গেলেন অন্য ঘরটায়। ওখানে গিয়ে কি করছেন তিনি, দেখতে পেল না ওরা।

‘ওদিকটায় যেতে পারলে হয়তো দেখা যাবে,’ কিশোর বলল।

‘কিন্তু কোথায় যাচ্ছি বুঝব কি করে? যা অঙ্ককার।’

‘পেনলাইট আছে।’

খুদে টর্চলাইটটা বের করে দেখাল ওকে কিশোর। ‘চলো, ঘরের ভেতরটা দেখার ব্যবস্থা করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখি।’

হেঁটে এগোনোর সাহস হলো না। কোপের ডালপালার নিচ দিয়ে বুকে হেঁটে এগোতে লাগল।

‘এই, থামো তো!’ রবিন বলল।

ঘুরে তাকাল কিশোর। ‘কি ব্যাপার?’

‘আলোটা ফেলো। কি যেন লাগছে।’

আলো ফেলল কিশোর।

রবিনের হাতে একটা কালো মাকড়সা।

বরফের মত জমে গেল দু’জনে।

‘ব্ল্যাক উইডো!’ কেঁপে উঠল রবিনের গলা।

‘ব্ল্যাক উইডো ইলে পিঠে একটা চিঙ্গ থাকবে,’ বলল কিশোর।

‘আওয়ারগ্লাস। দুটো গ্লাস উল্টো করে একটাৰ পেছনে আৱেকটা লাগয়ে দিলে
দেখতে যেমন লাগবে, অনেকটা সেই রকম।’

‘এটাৰ পিঠে কি আওয়ারগ্লাস আছে?’

‘কি করে বলব?’

‘দেখি, আলোটা আৱেকটু সৱাও তো। নাহ, কোন চিহ-চিহ্ন তো দেখছি না।
থাবা দিয়ে ফেলে দেব নাকি?’

কিশোৱেৰ বলাৰ জন্মে অপেক্ষা কৱল না রবিন। হঠাৎ এক থাবা মেৱে হাত
থেকে ফেলে দিল মাকড়সাটাকে।

মাটিতে পড়েই ভয়ানক ভঙ্গিতে আট পায়ে খাড়া হয়ে উঠল ওটা। একটা
সেকেন্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাল যেন ওদেৱ। তাৱপৰ আট পায়ে হেঁটে দ্রুত
অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

আবাৰ এগোল কিশোৱৱা।

আলো চোখে পড়ল।

থেমে গিয়ে রবিনকে বলল, ‘ওই যে, আৱেকটা জানালা।’

জানালাৰ কাছে গিয়ে কাঁচেৰ ভেতৰ দিয়ে তাকাল কিশোৱৱা।

‘কি সাংঘাতিকি!’ বলে উঠল রবিন।

‘সৰ্বনাশ!’ ছোট চিৎকাৱটা ঠেকাতে পাৱল না, আপনাআপনি মুখ দিয়ে
বেৱিয়ে এল কিশোৱেৰ।

‘ওগুলো কি বাস্তব?’

‘বাস্তব, তবে অবিশ্বাস্য।’

সাত

যে জিনিস দেখল, নিজেদেৱ চোখকে বিশ্বাস কৱতে কষ্ট হলো। ঘৰভৰ্তি খাঁচা।
আৱ খাঁচাভৰ্তি মাকড়সা। আৱ সে-মাকড়সাগুলো একেকটা কুকুৱেৰ সমান বড়।
তিন ফুট লম্বা পা মানুষেৰ বাহুৰ সমান মোটা। কালো বড় বড় লোমে ছাওয়া।
মনে হতে লাগল, বাস্তব নয়, হৱৱ ছবি দেখছে।

আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছে দু'জনে, এ সময় ঘৰে টুকলেন মিস্টাৱ
জনসন। একটা খাঁচাৰ দৱজা খুললেন।

হেঁটে বেৱিয়ে এল একটা মাকড়সা।

একটা পাত্ৰে বাদামী রঙেৰ আঠা আঠা এক ধৰনেৰ তৱল পদাৰ্থ ঢেলে
দিলেন মিস্টাৱ জনসন। জিনিসটাৱ চেহারা দেখেই বৰ্মি আসাৱ জোগাড় হলো
কিশোৱেৰ।

পাত্ৰেৰ কাছে গিয়ে আট পায়েৰ ওপৰ ভৱ দিয়ে শৱীৱটাকে নামিয়ে দিল
মাকড়সাটা। ভয়ক্ষক চোয়ালেৰ নিচ থেকে জিভ বেৱ কৱে চাটতে শুরু কৱল সেই

জঘন্য খাবার।

‘দেখি, একটু সরো!’ ভয় পাচ্ছে রবিন, কিন্তু দেখার লোভটা সামলাতে পারছে না।

কাচে মাথা ঠেকিয়ে দেখতে লাগল। দেখার আগ্রহে এত বেশি ঠেলতে লাগল মাথাটা, চাপ লেগে ভেঙে গেল কাঁচ। ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

জানালার ফোকর দিয়ে রবিনের দেহটা ও ভেতরে চলে গেল। পড়েই যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে পা ধরে ফেলে আটকাল কিশোর। অর্ধেকটা শরীর চলে গেছে ভেতরে। উল্টো হয়ে ঝুলতে লাগল সে।

শব্দ শুনে চমকে গিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালেন মিস্টার জনসন।

বহু কষ্টে টেনে রবিনকে বাইরে নিয়ে এল কিশোর। কিন্তু ওর মুখটা দেখে ফেলার জন্যে প্রচুর সময় পেয়েছেন মিস্টার জনসন। আর দেখলে চিনবেন না, এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না কিশোরের।

পালানোর তাগিদ অনুভব করল সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু দৌড়ানোর সাহস হলো না।

বুকে হেঁটে নিঃশব্দে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোনোর সময় নিচু ডালের বাড়ি লাগছে মাথায়। শব্দ না করে এগোনোও কঠিন।

বাড়িটার কাছ থেকে সরে এসেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে সরে যেতে চাইল বাড়ির কাছ থেকে। মিস্টার জনসন এসে ওদের ধরে ফেলার আগেই।

হঠাতে করেই ভাবনাটা খেলে গেল তার মাথায়—তিনি কি নিজে আসবেন ওদের ধরতে? নাকি কুকুরের সমান বড় বড় মাকড়সা পাঠাবেন? মানুষ যেমন চোর ধরতে কুকুর ছেড়ে দেয়, তেমনি করে?

কি করেন, দেখার জন্যে কৌতুহল হলেও দাঁড়ানোর সাহস হলো না। বাড়ির পাশ দিয়ে ছুটল। কোণ ঘুরে সামনের দিকে পৌঁছার আগেই কানে এল ভয়ঙ্কর শব্দ। রক্ত-পানি-করা চাপা গর্জন।

ফিরে তাকানোর সময় নেই। সাহসও হলো না। কোনও দিকে না তাকিয়ে ঝেড়ে দৌড়াতে থাকল রাস্তার দিকে।

কিসের গর্জন দেখার জন্যে ভেতরে ভেতরে কৌতুহলে মরে যাচ্ছে কিশোর, কিন্তু থামার সুযোগ নেই। অনেকখানি বন পেরোতে হবে তখনও। কাজেই দৌড়াতেই থাকল।

অবশ্যে বনটা পেরিয়ে এল নিরাপদে। যখন বুবল, ভয় আর নেই আপাতত, তখন দৌড়ানো বন্ধ করল। হেঁটে চলল রাস্তা ধরে। মিস্টার জনসনের ওখানে যা যা দেখে এসেছে, সেটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে চলল।

দুঃজনেই একমত হলো, এমন কোন ফরমুলা বানিয়েছেন তিনি, যেটা রাস্তায় মাকড়সাগুলোকে বড় করে দানব বানিয়ে ফেলা সম্ভব।

হঠাতে থমকে দাঁড়াল রাস্তার ওপর। পাথর হয়ে গেল যেন।

ওদের ঠিক সামনে রাস্তার মাঝখানে বসে আছে কালো রঙের একটা কিয়েন ফুট তিনেক উঁচু।

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে ।

মাকড়সা !

‘শর্টকাটে মাকড়সাটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মিস্টার জনসন,’ ফিসফিস করে বলল রবিন। ‘আমাদের জন্যে বসে আছে। কাছে গেলেই ধরবে। কি করব, কিশোর?’

‘লাঠি,’ বলল কিশোর। ‘ডাল ভেঙে নাও। পিটিয়ে ‘তাড়াব’।

‘কিন্তু ডাল ভাঙতে গেলেই যদি তেড়ে আসে?’

‘কথা বলে সময় নষ্ট করলে তো আসবেই,’ ডালের জন্যে এুদিক ওদিক তাকানো শুরু করে দিয়েছে কিশোর। রাস্তার পাশেই মরা ডাল পড়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে ভেঙে নিয়ে এল।

রবিনও ভেঙে নিল একটা ডাল।

লাঠি হাতে তৈরি হয়ে দাঁড়াল।

কালো প্রাণীটা নড়ল না। কিন্তু ওদের দিকেই যে নজর, সেটা বোৰা যাচ্ছে।

‘শক্ত করে ধরো লাঠিটা,’ রবিনকে বলল কিশোর। ‘টর্চ জ্বালব। এগোনোর চেষ্টা যদি করে, কোন কথা নেই, দেবে বাড়ি মেরে। তারপর যা হয় হবে।’

লাঠিটা তুলে ধরল রবিন। ‘আমি রেডি।’

ছোট টচ্টা বের করল কিশোর। হাত কাঁপছে। টচ্টাকে পিস্তলের মত তুলে ধরে এক পা আগে-বাড়ল। দম বন্ধ করে রেখেছে। যা থাকে কপালে ভেবে কালো প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে ঢিপে দিল সুইচ।

‘রোডো!’ একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল দু’জনে।

দানব-মাকড়সা নয়। ওর নাম রোডো। চেনে ওকে ওরা। মিস্টার সিম্পসন নামে এক ভদ্রলোকের কুকুর। এ রাস্তারই শেষ মাথার বাড়িটাতে থাকেন উনি।

‘তাহলেই বোৰো,’ স্বত্ত্বার নিঃশ্বাস ফেলে বলল রবিন। ‘বিপদের সময় মানুষের মগজ কি রকম উল্টোপাল্টা ভাবে। কোথায় কুকুর আর কোথায় মাকড়সা।’

‘এ ক্ষেত্রে খুব একটা উল্টোপাল্টা ভেবেছে বলা যাবে না,’ জবাব দিল কিশোর। ‘দানব-মাকড়সা তো সত্যিই দেখে এসেছি মিস্টার জনসনের বাড়িতে। সেই দেখাটা কি ভুল ছিল?’

চুপ হয়ে গেল রবিন।

বনের মধ্যে মিস্টার জনসনের বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল দু’জনেই। অঙ্ককারে দেখা যাচ্ছে না ওটা।

আবার কোন বিপদ এসে হাজির হয়, তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি রওনা হলো।

আট

পরাদিন স্কুলে বিজ্ঞান ক্লাসে মিস্টার জনসন ঘোষণা করলেন ওদের জন্য একটা স্পেশাল আনন্দদানের আয়োজন করেছেন। মাকড়সা আর তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর একটা ভিডিও করেছেন, যেটা ওদের দেখাবেন তিনি।

জানালার পর্দা টেনে ঘর অঙ্ককার করে টেপটা চালু করে দেয়া হলো।

অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে মাকড়সাগুলোকে। জালের সামান্য দূরে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকতে দেখা গেল ওটাকে। একটা ঘাসফড়িং এসে আটকে গেল জালে। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মাকড়সাটার দেহে। ঝড়ের গতিতে ছুটে গিয়ে স্প্রে'র মত করে সিঙ্কের সুতো ছিটিয়ে জড়িয়ে ফেলল ঘাসফড়িংটাকে। তারপর দাঁত বসিয়ে দিল ওটার গায়ে। পুরো দৃশ্যটাই দেখানো হয়েছে খুব কাছে থেকে, ক্লোজ-আপে।

‘দারুণ দৃশ্য!’ মিস্টার জনসন বললেন। ‘আমাদের মতই বুদ্ধিমান ওরা, তাই না? এটা দেখে কি মনে হচ্ছে না মানুষ হিসেবে আমরা যতটা সম্মান পাই ওদেরও ততটা পাওয়া উচিত? অপেক্ষা করো, এমন দিনও আসবে, যখন মানুষ ওদের সম্মান করতে বাধ্য হবে।’

ঘণ্টা পড়ল। বেরোনোর জন্যে উঠতে গেল কিশোররা। মিস্টার জনসন বললেন, ‘এক মিনিট, রবিন। একটু বসো। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।’

রবিনকে রেখে বেরিয়ে এল সবাই। চিন্তা লাগছে কিশোরের। মুসাকে তো জোমি বানিয়ে দিয়েছেন। রবিনকেও যদি সে-রকম কিছু বানিয়ে ফেলেন?

মিস্টার জনসনের এই মাকড়সা-গ্রীতি কারোরই ভাল লাগছে না। অন্য ছেলেমেয়েদের কাছেও আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠল এটা। সবারই প্রশ্ন, মাকড়সাকে সম্মান দেখানোর কথা বলে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন?

‘তিনি, আসলে বোঝাতে চান,’ কিশোর বলল, ‘মাকড়সাকে সম্মান করতে আমাদেরকে বাধ্য করবেন তিনি।’

‘মানে?’ কিশোরের কথা বুঝতে না পেরে জিজেস করল টেরির বন্ধু টাকি।

‘আমি একবড় মাকড়সার কথা বলছি,’ দুই হাত ছড়িয়ে মাকড়সার বিশালতা বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। ‘মিস্টার জনসন এমন এক ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন, যেটার সাহায্যে দানব-মাকড়সা তৈরি করে ফেলা সম্ভব।’

‘দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সবাই। প্রথমে হেসে উঠল টাকি। ওর হাসিটা যেন সংক্রামিত হলো সবার মধ্যে। সবাই হাসতে শুরু করল।

‘হেসো না, সত্যি বলছি আমি!’ গভীর হয়ে রইল কিশোর। ‘নিজের চোখে

দেখে এসেছি আমরা। শুধু আমি না। রবিনও ছিল আমার সঙ্গে। বনের মধ্যে পুরানো বাড়িতে তাঁর ল্যাবরেটরি। লুকিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। টের পেয়ে আমাদের তাড়া করেছিলেন তিনি।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই,' মুখ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ করল কিশোরকে টেরি। 'শুধু মাকড়সা না, এতে বড় বড় মাছিও বানিয়ে ফেলেছেন তিনি।' দুই হাত যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দেখাল সে।

আরও গভীর হয়ে গেল কিশোর। 'দেখো, টেরি, সব সময় রসিকতা কোরো না। আমি সত্যি বলছি। বিশ্বাস করো আমার কথা। তিনি যে বাড়িটায় থাকেন, ওটার মাটির নিচের ঘরে ল্যাবরেটরি বানিয়েছে। বড় বড় খাঁচায় মাকড়সা পুষছেন। বিশ্বাস না হলে রবিনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

'বেশ,' বলল শারি নামে একটা মেয়ে, 'রবিনকেই জিজ্ঞেস করব আমরা। তবে আমার ধারণা, আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে পুরো ব্যাপারটাই বানিয়ে বলছ তুমি।'

'ওই যে, রবিন আসছে,' দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল কিশোর।

ওদের দিকে এগিয়ে এল রবিন। কিশোর কিছু বলার আগেই ওকে ঘিরে ফেলল টেরি, টাকি ও আরও কয়েকজন ছেলেমেয়ে। মিস্টার জনসনের বাড়িতে উদ্ভট, অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করল।

'নাহ, আমি কিছুই দেখিনি,' যান্ত্রিক গলায় স্বেফ অস্বীকার করল রবিন। 'তা ছাড়া অস্বাভাবিক আর কি দেখব? মিস্টার জনসন একজন অত্যন্ত স্বাভাবিক নিরীহ ভদ্রলোক।'

'তারমানে তুমি আর কিশোর কোনও বড় ধরনের মাকড়সা বা অন্য কোন পোকাটোকা দেখেনি?' জিজ্ঞেস করল টেরি।

'নাহ, তা কেন দেখব? আর সেটা দেখাটা কি স্বাভাবিক?'

'বড়সড় কোন ভয়াবহ মানুষখেকো দানব-মাকড়সা দেখেনি?' টাকি জিজ্ঞেস করল।

'মাকড়সারা ভয়াবহ হয় না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল রবিন। 'মাকড়সারা আমাদের বন্ধু। ভীষণ চালাক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উপকারী প্রাণী। ওদেরকে ভক্তিশূন্ধা আর সম্মান করা উচিত আমাদের।'

'কি মিয়া পুঁচকে শার্লক,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে গা-জুলানো খিকখিক হাসি হাসতে লাগল টেরি। 'তোমার দোষ তো তোমার কথায় সায় জানাল না।'

'আগেই জানতাম,' শারি বলল, 'ও আমাদের বোকা বানাচ্ছে। এই চলো চলো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফালতু বকবকানিতে লাভ নেই।'

চলে গেল ওরা।

রবিনের ওপর রেগে গেল কিশোর। 'ওদেরকে সত্যি কথাটা বললে না কেন? আমাকে তো একটা ছাগল বানিয়ে ছেড়েছে ওদের সামনে।'

'সত্যি কথাটাই বলেছি ওদেরকে,' যান্ত্রিক স্বরে জবাব দিল রবিন।

'কাল রাতের কথাটা ভুলে গেলে নাকি?' খেঁকিয়ে উঠল কিশোর।

'মাকড়সারা আমাদের বন্ধু। ওদেরকে কখনও...কখনও বিরক্ত করা উচিত

নয় আমাদের।'

'রবিন! কি হয়েছে তোমার, বলো তো?' আশঙ্কাটা ফিরে এল কিশোরের।
'মিস্টার জনসন কি করেছেন তোমাকে?'

কিন্তু জবাব দিল না রবিন। দাঁড়ালও না আর। কিশোরের দিকে তাকিয়ে
যান্ত্রিক হাসি ছেসে রোবটের মত পা বাড়াল গেটের দিকে। সে-ও মুসার মত,
জোম্বির মত আচরণ শুরু করেছে।

নয়

মুসা তো আগেই জোম্বি হয়েছে, এখন রবিনও হলো। কিছু একটা করার জরুরী
তাপিদ অনুভব করল কিশোর। নইলে কোনদিন তাকেও জোম্বি বানিয়ে দেবেন
মিস্টার জনসন। তখন আর কিছুই করার থাকবে না।

কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল কিশোর।

বুদ্ধি একটা পেয়ে গেল। বাড়ি ফিরে মেরিচাটীকে জিজেস করল, 'চাচী,
সেদিন যে একটা অ্যান্টিক ঘড়ি পাওয়া গিয়েছিল পুরানো মালের মধ্যে, সেটা কি
বেচে দিয়েছ?'

'না,' মেরিচাটী বললেন। 'কি করবে?'

'দাও না একটু। কাজ আছে।'

'দেখো, ভাঙ্গে নাও যেন। এ রকম জিনিস সচরাচর পাওয়া যায় না। রেল
কভাকটরের ঘড়ি। তা ছাড়া বহু পুরানো। ভাল দাম পাওয়া যাবে।'

'না ভাঙ্গব না। দাও।'

ঘড়িটা অনেক ভারী। সেকালে ট্রেনে চলাচলের সময় পকেটে নিয়ে ঘুরে
বেড়াত কভাকটর। লম্বা একটা চেন লাগানো। যাতে পকেট থেকে পড়ে গিয়ে
হারিয়ে না যায়। গোল ঢাকনাটার কিনারটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। মিস্টার জনসন
যে ঘড়ি দুলিয়েছিলেন মুসার চোখের সামনে তার সঙ্গে এ ঘড়িটার অনেক মিল।
ভুবঙ্গ এক রকম বললেও চলে। সে-জন্যেই চেয়েছে কিশোর।

ঘড়িটা নিয়ে প্রথমে রবিনদের বাড়িতে গেল সে। নিজের ঘরে রায়েছে রবিন
তাকে বলল কিশোর, একটা জিনিস দেখাতে এনেছে। পকেট থেকে বের করল
ঘড়িটা।

'বাহ, সুন্দর তো,' যান্ত্রিক স্বরে বলল রবিন। কোন উচ্ছ্বাস নেই।

'নেবে নাকি? নাও না,' ঘড়িটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'চেনটা ধরে
চোখের সামনে দোলাতে থাকো পেঁপুলামের মত। দারুণ একটা ব্যাপার ঘটবে,
দেখো।'

কিন্তু হাতে নেয়ার আগ্রহ দেখাল না রবিন। শেষে কিশোরই চেন ধরে ওর
চোখের সামনে নিয়ে গিয়ে দোলাতে শুরু করল, মিস্টার জনসন যেমন করে মুসার

সামনে দুলিয়েছিলেন।

‘হির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন।

‘দেখো,’ নরম স্বরে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকল কিশোর, ‘দেখতে থাকো। কেমন সামনে যাচ্ছে...পেছনে যাচ্ছে...সামনে...পেছনে...সামনে...পেছনে...সামনে...পেছনে...’

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনাআপনি চোখ বুজে এল রবিনের। যেন ঘুমিয়ে যাচ্ছে। চোখ আধবোজা করে চুল্লুচুলু ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল।

আশা হলো কিশোরের। যা সন্দেহ করেছিল, ঠিক তাই। ঘড়ির সাহায্যে ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছেন মিস্টার জনসন।

‘এক থেকে দশ পর্যন্ত গোগার সঙ্গে সঙ্গে জেগে যাবে তুমি,’ রবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকল কিশোর। ‘সম্মোহন কেটে যাবে তোমার। মাকড়সা নিয়ে আর কোন ধরনের উন্টট ভাবনা চিন্তা থাকবে না মগজে। আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে তুমি।’

মাথা ঝাকাল রবিন।

আশা বাড়ল কিশোরের। কাজ হচ্ছে মনে হলো।

এক দুই তিন করে গুলতে শুরু করল।

পুরোপুরি চোখ মেলল রবিন।

কিশোর বলল, ‘রবিন, দেখো দেখো, তোমার পেছনে বিছানার ওপর মন্ত এক মাকড়সা।’

রবিনের প্রতিক্রিয়াটা হলো ‘দেখার মত। লাফ দিয়ে নেমে গেল সে। একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল বিছানার দিকে, বাড়ি মেরে মাকড়সাটাকে ফেলে দেয়ার জন্যে।

হা-হা করে হেসে উঠল কিশোর।

বিছানায় মাকড়সা না দেখে অরূপ হলো রবিন।

‘তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম,’ কিশোর বলল।

‘কি বলছ? বুঝতে পারল না রবিন। কিসের পরীক্ষা?’

মিস্টার জনসন তোমাকেও সম্মোহিত করে ফেলেছিলেন। আজব এক ঘোরের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন তোমাকে। মাকড়সারা যে কত ভাল, মগজ ধোলাই করে সেই ধারণাটা চুকিয়ে দিয়েছিলেন তোমার মগজে। মাকড়সাদের ভালবাসতে বলেছিলেন।’

‘পাগল নাকি তুমি?’ বিশ্বাস করতে চাইল না রবিন। ‘কোন রকম ঘোরের মধ্যে যাইনি আমি। মাকড়সার মত একটা পচা আণীকে ভালবাসার তো প্রশ্নই ওঠে না।’

‘তারমানে তোমার কিছু মনে নেই? ক্ষুলে তুমি সবার সামনে বলোনি মাকড়সারা আমাদের বন্ধু? ওদেরকে কখনও বিরক্ত করা উচিত নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি? মনে পড়ছে না, মিস্টার জনসনের বাড়ির মাটির নিচে দেখা দানব-মাকড়সার কথা?’

খানিক চিন্তা করে নিল রবিন। ‘হ্যাঁ, তা মনে পড়ছে।’

‘স্কুলে’ সবার সামনে যে বলেছ মাকড়সা ভালবাসো, সেটা মনে পড়ছে না?’

মাথা নাড়ল রবিন। ‘নাহ। কেবল একটু একটু মনে পড়ছে, চোখের সামনে একটা ঘড়ি দুলিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিলেন মিস্টার জনসন। তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।...কি করেছিলেন, বলো তো?’

‘ওই যে বললাম সম্মোহিত করেছিলেন। মাকড়সা-ভালবাসার বুলি তুলে দিয়েছিলেন তোমার মুখে। বোৰা যাচ্ছে, মুসাকেও একই কাজ করেছেন।...নাহ, এ ভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। কিছু একটা করা দরকার। ঠেকানো দরকার উন্মাদটাকে। ভাল কিছু যে করছেন না তিনি, এটুকু বোৰা হয়ে গেছে।’

‘উদ্দেশ্যটা কি তাঁর?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘আমি তো একটা উদ্দেশ্যই দেখতে পাচ্ছি। ওই দানব-মাকড়সাগুলোকে খাচা থেকে ছেড়ে দেয়া। ভয় দেখিয়ে মাকড়সার প্রতি শ্রদ্ধা আদায়ের পরিকল্পনা করেছেন তিনি।’

‘কিন্তু কেন?’

‘মাকড়সা-বিদ্রোধী মানুষদের শায়েস্তা করার জন্যে, আর কেন? তিনি চান, মাকড়সাকে সবাই ভালবাসুক। প্রাণীগুলোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুক। পা দিয়ে না মাড়াক। উদ্দেশ্যটা খারাপ না। কিন্তু যে ভাবে তিনি মানুষকে মাকড়সা ভালবাসতে বাধ্য করতে চাইছেন, সেটা খারাপ। যত ভয়ানক স্বভাবেরই হোক ছোট প্রাণীকে ভয় পায় না মানুষ, মিস্টার জনসনের ভাষায় “সম্মান” করতে চায় না, তাই দানব তৈরি করছেন। এত বড় মাকড়সা দেখলে কলজে কেঁপে যাবে মানুষের। পা দিয়ে মাড়ানো তো দূরের কথা, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ভয়ে দৌড়ে পালাতে দিশে পাবে না।’

কিশোরের যুক্তির সঙ্গে একমত হলো রবিন, মিস্টার জনসনকে জলদি ঠেকানো দরকার, এ ব্যাপারেও দ্বিষ্ট রইল না। মাটির নিচের ঘরের খাচাগুলোর কথা ভাবল। সবগুলো খাচা ভর্তি দেখে এসেছে। কোনটাই খালি নেই। তারমানে তৈরি হয়ে গেছেন তিনি। যে কোন মুহূর্তে এখন মাকড়সাগুলোকে ছেড়ে দিতে পারেন। মাকড়সা-বিদ্রোধী মানুষকে আক্রমণ করার জন্যে পাঠাতে পারেন তাঁর অতিকায় মাকড়সা-বাহিনীকে।

‘তাহলে কি করব আমরা এখন?’ প্রশ্ন করল রবিন। ‘কাউকে বলা যাবে না এ কথা। সবাই আগামের পাগল ভাববে।’

‘আবার যেতে হবে মিস্টার জনসনের বাড়িতে,’ বলল কিশোর। ‘প্রমাণ নিয়ে আসতে হবে। আজই সুযোগ। টীচারদের মীটিং আছে। রাত দশটার আগে বুড়ি ফিরতে পারবেন না তিনি।’

‘কিন্তু কি প্রমাণ জোগাড় করব? মাকড়সা ধরে আনতে পারব না। ওই দানব ধরে আনা সম্ভব নয়।’

‘কিন্তু মাকড়সার ছবি তো আনা যাবে। তোমার ক্যামেরাটা নিয়ে নিও সঙ্গে।’

‘ঠিক বলেছ,’ হাসি ফুটল রবিনের মুখে। ‘ক্যামেরার বুদ্ধিটা মাথায়ই আসেনি আমার।’

ঘণ্টা দু'য়েক পর আবার কিশোররা মিস্টার জনসনের বাড়ির কাছাকাছি হলো। স্কুলের কাছ দিয়েই এসেছে। ইচ্ছে করেই ঘুরে এসেছে ওদিক দিয়ে, পার্কিং লটে মিস্টার জনসনের গাড়ীটা আছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। ওদের হাতে ঘণ্টা দু'য়েক সময় আছে। এর মধ্যে কাজ সেরে কেটে পড়তে হবে।

মুসাকেও নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল কিশোরের। বাড়ির সাহায্যে রবিনের মত ওকেও সম্মোহনমুক্ত করতে পারত। সেজন্যে রবিনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওদের বাড়িতেও গিয়েছিল। কিন্তু ওকে পায়নি। ওর মা'র সঙ্গে কোথায় যেন গেছে।

যাই হোক, বনের মধ্যে সেই জায়গাটাতে চলে এল কিশোর আর রবিন, যেখান থেকে ঝোপের মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়েছিল আগের দিন। বাড়ির কোথাও কোন আলো জুলছে না। মাটির নিচের ঘরের ল্যাবরেটরিতেও না। তবে তাতে ছবি তোলায় অসুবিধে নেই। রবিনের ক্যামেরায় ফ্ল্যাশলাইট আছে।

ঝোপের ভেতরে ভেতরে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল দু'জনে। বাড়ির কাছে গিয়ে দেখল, ভাঙ্গা জানালাটায় একটা হার্ডবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছেন মিস্টার জনসন। টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করল। কান্ত হলো না। শক্ত করে লাগিয়েছেন। হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এল আবার আগের জায়গায়।

‘এখন কি করা?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘বাড়িতে ঢুকতে হবে,’ বলল কিশোর। ‘আর তো কোন উপায় দেখছি না। নিচে নেমে যেতে হবে।’

আঁতকে উঠল রবিন। ‘পাগল হলে নাকি? এই অঙ্ককারে ভয়ঙ্কর ওসব মাকড়সার মধ্যখানে গিয়ে ঢুকব!’

কিশোরের কাছেও পাগলামি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। বলল, ‘তাহলে তুমি বলো, আর কি করা যায়?’

‘আরেকটা জানালা খুঁজে বের করা যেতে পারে,’ পরামর্শ দিল রবিন। ‘আরও জানালা নিশ্চয় আছে। ঝোপে ঢাকা পড়ে আছে বলে দেখতে পাচ্ছ না।’

ঠিকই বলেছে রবিন। আরও জানালা থাকতেই পারে। শেষে দু'দিক দিয়ে খুঁজতে যাবে ঠিক করল। বাড়ির একপাশ দিয়ে যাবে ও, অন্যপাশ দিয়ে রবিন।

চাঁদের আলো আছে। মেঘও আছে আকাশে। মাঝে মাঝে চাঁদ টেকে দিচ্ছে। অঙ্ককার হয়ে যাচ্ছে বনভূমি। সরে গেলেই আবার আলোকিত। আলো থাকলে দেখে দেখে চলছে। না থাকলে আন্দাজে। সামনে হাত বাড়িয়ে রেখেছে কিশোর, যাতে গাছটাছ পড়লে হাতে ঠেকে। বাড়ি কিংবা ধাক্কা না খায়।

বাড়ির কোণ ঘুরে এল সে। হাতে ঠেকল কি যেন। তবে সেটা গাছ নয়। বড় মাছ ধরার জালের মোটা সুতোর মত জিনিস। আঠা আঠা। হাত পেঁচিয়ে গেল তাতে। টানাটানি করে ছাড়াতে হলো।

কিছু সুতো পায়েও জড়াল। সেগুলো ছুটানোর জন্যে নিচু হত্তেই কাঁধে, ঘাড়ে জড়িয়ে গেল আরও। হাঁচকা টান দিয়ে ছুটাতে যেতেই পুরো হাতে জড়িয়ে গেল। ছুটানোর জন্যে মরিয়া হয়ে টানাটানি শুরু করল। থাবা মারতে লাগল। যতই চেষ্টা

করে, ততই জড়ায়। ছাড়াতে তো পারলই না, বেকায়দা ভঙ্গিতে শূন্যে ঝুলতে থাকল। মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়া মাছির মত।

দশ

মাকড়সার দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল। জালে পড়া শিকারের দাপাদাপিতে জালের মধ্যে যে কম্পন সৃষ্টি হয় সেটা অনুভব করেই মাকড়সা বুঝতে পারে জালে শিকার পড়েছে। ছুটে আসে তখন ধরার জন্যে। নড়াচড়া না করে চুপচাপ পড়ে থাকলে কিশোরের অস্তিত্ব টের পাবে না মাকড়সাটা।

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! চুপচাপ পড়ে রইল সে। নিঃশ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছে। ওই সামান্যতম কম্পনেও যদি টের পেয়ে গিয়ে চলে আসে মাকড়সাটা!

তার আশঙ্কাকে বাস্তব করে দিতেই যেন শুরু হলো পদশব্দ। নিশ্চয় মাকড়সাটার। জালে শিকার পড়ার খবরটা পৌছে গেছে তার কাছে। এগোনো শুরু করেছে।

ভয়াবহ দুঃস্বপ্নেও কখনও এ রকম পরিস্থিতিতে পড়েনি সে। চোয়ালের দুই পাশের কাঁটাওয়ালা দাঁত খুলতে খুলতে তার দিকে এগিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর প্রাণীটা-রোমহর্ষক এই দৃশ্য সইতে পারবে না। নিজে নিজে ছুটতে পারবে না এই জাল থেকে, বুঝে গেছে। বাঁচার আর কোন পথও নেই। তাই চোখ বুজে পড়ে থাকল চুপচাপ। মাকড়সাটার তীব্র পচা নিঃশ্বাসের গন্ধ আর মারাত্মক দাতগুলো দেহে ফুটে ঘাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল সে। আতঙ্কে রবিনকে ডাক দেয়ার কথাটাও যেন ভুলে গেছে।

কতক্ষণ পরে জানে না-তার মনে হলো প্রায় এক যুগ পরে কানের কাছে ফিসফিস করে ডাক শুনতে পেল রবিনের, ‘কিশোর?’

‘রবিন!’ কবিয়ে উঠল কিশোর। মাকড়সা নয় রবিনের পদশব্দ ছিল ওটা, বুঝতে পেরে ঘাম দিয়ে জুর ছাড়ল। ‘জালে আটকা পড়েছি আমি। ছাড়াও আমাকে।’

‘কি হয়েছে?’ জানতে চাইল রবিন।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। আলোকিত হলো বনভূমি। রবিনকে দেখতে পেল। সে-ও দেখতে পেল কিশোরকে।

‘জাল পেতে রেখে গেছে মাকড়সা। তাতে ধরা পড়েছি আমি।’ সাবধান করল কিশোর, ‘খবরদার, বেশি এগিয়ো না! জালে আটকা পড়বে।’

‘আহ, কি একখান পোজ দিয়ে আছ,’ হেসে বলল রবিন। ‘দারুণ একটা ছবি হবে। এতদিন জানতাম মাছি আর পোকা পড়ে মাকড়সার জালে। মানুষও যে পড়ে, জানতাম না। মিস্টার জনসনকে ধন্যবাদ।’

‘কথা কম বলো। মাকড়সারা চলে আসার আগেই ছাড়াও আমাকে। জলদি

করো। ওরা এসে গেলে তোমাকেও ছাড়বে না।

পকেট থেকে ছুরি বের করে জালের সুতো কাটতে শুরু করল রবিন। কাটার গতি বড়ই ধীর। এত বেশি সুতো, কেটে শেষ করতে পারছে না। তাহাড়া নিজেও যাতে জালে না জড়ায় সেদিকেও লক্ষ রাখতে হচ্ছে।

কিশোরের বাঁ হাত আর বাঁ পা জালমুক্ত করে ফেলল সে। ডান হাতে পেঁচিয়ে থাকা সুতো কাটতে শুরু করেছে, এই সময় একটা শব্দ কানে এল। কি যেন এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। মাটিতে পড়ে থাকা পাতায় খসখস শব্দ হচ্ছে।

‘মাকড়সা!’ ফিসফিস করে বলল কিশোর। ‘জলদি কাটো।’

‘জলদিই কেন করছি,’ ভয় পেয়ে গেছে রবিন। কিন্তু মাথা গরম করল না। বেছে বেছে একটা একটা করে সুতো কেটে চলেছে।

এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। ঠিক এই সময় আবার মেঘের আড়ালে চলে গেল চাঁদ। গভীর অঙ্ককারে ঢাকা পড়ল কিশোররা। কোন কিছুই নজরে আসছে না আর।

এগিয়ে আসার শব্দ দ্রুততর হলো। যে প্রাণীই হোক ওটা, ছুটে আসতে শুরু করেছে এখন ওদের দিকে।

জালের সুতোয় কিশোরের যে পাঁটা আটকে এখনও আছে, হাড়ানোর জন্যে টানাটানি শুরু করল সে। কিন্তু সাংঘাতিক শক্তি সুতো। ছিঁড়তেও পারল না, ছুটাতেও পারল না।

সুতো কাটা থামিয়ে দিয়েছে রবিন। কান পেতে আছে শব্দের দিকে।

‘থামলে কেন?’ চিৎকার করে উঠল। আতঙ্কে মাথা গরম হয়ে গেছে তখন কিশোরের। ‘কাটো! কাটো! জলদি কাটো।’

শিকারের গন্ধ পেয়ে গেছে বোধহয় প্রাণীটাও। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে কাছে এসে পড়ল শব্দ। হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল তীব্র আলো। তারপর গাঢ় অঙ্ককারে ঢেকে গেল আবার সব কিছু। জালের শেষ কঁটা সুতো কেটে দিল রবিন। অল্পক্ষণেই মুক্ত হয়ে গেল কিশোর।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল এতগুলো ঘটনা।

‘এদিক দিয়ে এসো!’ বলেই দৌড়ি দিল রবিন।

বাড়ির পাশ ঘুরে ছুটল দু’জনে। মাকড়সা যেদিক থেকে আসছে তার উল্টো দিকে যাচ্ছে। বিশাল একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে চুকে পড়ল। কঁটা বসানো ডালপালা দিয়ে ওদের যেন গ্রাস করে নিল ঝোপটা। অঙ্ককারে কোন দিকে চলেছে বুঝতে পারল না ওরা।

মেঘের আড়াল থেকে আবার বেরিয়ে এল চাঁদ। পথ দেখে চলতে পারায় ওদের চলার গতি বেড়ে গেল অনেক।

‘এহ্হে!’ বলে উঠল রবিন।

‘কি হলো?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘ক্যামেরাটা ফেলে এসেছি।’

‘কোথায়?’

‘তোমার জাল যেখানে কেটেছি।’

‘কিন্তু আর তো ওখানে যাওয়া যাবে না এখন!’ ফিরে যেতে চাইছে না কিশোর। মাকড়সার জালে পড়ার আতঙ্কটা কাটেনি এখনও পুরোপুরি। যত তাড়াতাড়ি সন্তুষ্পূর্ণ পালিয়ে যেতে চায় এই এলাকা থেকে।

‘কিন্তু ওই ক্যামেরাটাই তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।’

‘ক্যামেরা আমার প্রাণ বাঁচাল কি করে?’

‘কেন, আলোর ঝিলিক দেখোনি?’

‘তা তো দেখেছি। ফ্ল্যাশারের আলো। তাতে কি হয়েছে?’

‘মাকড়সাটা যখন ছুটে আসছিল, ঠেকানোর আর কোন উপায় না দেখে শব্দ লক্ষ্য করে শাটার টিপে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আচমকা ফ্ল্যাশারের আলো জুলে উঠতে দেখলে থেমে যাবে মাকড়সাটা। কাজ যে হয়েছিল, সেটা তো বুঝতেই পারছ। নইলে এতক্ষণে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ হত না। আলোর ঝলকানি দেখে মাকড়সাটাও আর এগোল না, সেই সঙ্গে ওটার ছবিও উঠে গেল। কি, কাজটা ঠিক করিনি?’

‘তা তো করেছ। কিন্তু মাকড়সাটাকে দেখেছিলে নাকি? কত বড় ছিল?’

‘দেখিনি। সামনে আসেনি ওটা।’

‘তাহলে ছবি উঠেছে বুঝলে কি করে?’

‘শব্দ লক্ষ্য করে যেহেতু শাটার টিপেছি, আমি শিওর, উঠেছে। তাড়াভুংড়োয় মানুষের চোখে অনেক সময় যে জিনিস ধরা পড়ে না, ক্যামেরার চোখে ঠিকই পড়ে সেটা-কারণ, ক্যামেরার চোখ ভুল করে না।’

‘হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু এখন তো আর ক্যামেরাটার দরকার নেই,’ বলল কিশোর। ‘ফিরে যাওয়া মানে সময় নষ্ট। কোন বিপদের মুখে গিয়ে পড়ব আবার তা-ই বা কে জানে!’

‘মাকড়সার জাল তারমানে ভালই ভয় দেখিয়েছে তোমাকে। কিন্তু জল্লটার ছবি রয়েছে ওটার মধ্যে...’

‘জল্ল নয়, পোকা।’

‘যে সাইজ হয়ে গেছে, এখন আর পোকা বলা যাবে না ওটাকে,’ রবিন বলল। ‘ক্যামেরাটার মধ্যে রয়েছে মিস্টার জনসনের কুকর্মের সাক্ষী। ওটা ছাড়া ফিরে গেলে কেউ বিশ্বাস করবে না আমাদের কথা।’

‘তা ঠিক। একমত না হয়ে পারল না আর কিশোর। ছবিটা নিয়ে যাওয়াটাই সমীচীন হবে।

আবার ফিরে চলল দু’জনে। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে পা ফেলছে। সন্দেহ হচ্ছে কিশোরের, অঙ্ককারে ক্যামেরাটা খুঁজে পাবে তো? ওখানে দানব-মাকড়সাটা অপেক্ষা করছে না তো ওদের জন্যে?

সামনে কি আছে হাত বাড়িয়ে বুঝে নিয়ে হাঁটছে। অসাবধান থেকে আরেকবার বোকার মত আটকা পড়তে চায় না মাকড়সার ভয়ানক জালে।

‘এই যে, পেয়েছি গাছটা,’ ফিসফিস করে বলল রবিন। ‘এর আশেপাশেই কোথাও আটকা পড়েছিলে তুমি।’

‘সত্যই এটা তো? বাড়িটার এত কাছে ছিলাম তখন?’ বিশ্বাস হতে চাইল না কিশোরের।

‘হ্যাঁ, ছিলাম। জালে আটকা পড়ে কোন কিছু খেয়াল করার মত অবস্থা ছিল না তোমার।’

হাঁটু গেড়ে বসে গাছের গোড়ায় হাতড়ে হাতড়ে ক্যামেরাটা খোঁজা শুরু করল দু’জনে। কয়েক সেকেন্ড খোঁজার পর এ ভাবে হবে না বুঝে পেনলাইট বের করল কিশোর। আলো খুব সামান্যই দিচ্ছে খুদে টর্চ, কিন্তু অঙ্ককারে হাতড়ানোর চেয়ে তো ভাল। দেখা তো যাচ্ছে।

প্রথম গাছটার গোড়ায় পাওয়া গেল না ক্যামেরাটা। পরের গাছটার গোড়ায় খুঁজল। ওখানেও পেল না। আরেকটার গোড়ায় খুঁজল। নেই। একের পর এক গাছের গোড়ায় খুঁজে চলল দু’জনে।

‘এই যে পাওয়া গেছে!’ অবশ্যে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

তার কথা শেষ হতে না হতেই কি যেন একটা এগিয়ে আসতে শুনল ওদের দিকে। নিশ্চয় মাকড়সা! দেখার জন্যে বসে থাকল না কেউ। লাফিয়ে উঠেই দৌড়।

শহরে পৌছানোর আগে আর পেছন ফিরে তাকাল না কেউ।

হাঁপাতে হাঁপাতে রবিন বলল, ‘যাক, প্রাণটা বাঁচল এ যাত্রা। আর প্রমাণও নিয়ে আসতে পারলাম।’ ক্যামেরা তুলে দেখাল সে।

এগারো

পরদিন ওদের বিজ্ঞান ক্লাসে একটা ফীল্ড-ট্রিপের ব্যবস্থা হলো। ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়ামে ওদের নিয়ে গেলেন মিস্টার জনসন।

এর আগেও বেশ কয়েকবার ওখানে গিয়েছে কিশোররা। বেশ কয়েকটা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর আর বিশাল দাঁতাল বাঘের একটা কঙ্কাল রয়েছে ওখানে। দেখতে ভাল লাগে ওর। দেখতে দেখতে কঞ্চনায় হারিয়ে গিয়ে চলে যায় বহ-বহুকাল আগের সেই প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে। আদৃত এক ফ্যান্টাসির জগতে ঘুরে বেড়ায় মনে মনে।

কঙ্কালগুলোর কাছে ওদের যেতে দিলেন না মিস্টার জনসন, ঘোরাতে লাগলেন শুধু পোকা-মাকড় ভরা কাঁচের বাক্সগুলোর সামনে।

কথা বলার জন্যে রবিনকে খুঁজছিল কিশোর। কিন্তু আশেপাশে কোনখানে দেখতে পেল না ওকে। গেল কোথায়? মুসাও নেই। স্কুলেই আসেনি সেদিন। ওর সম্মোহন কাটানোর সুযোগ করে উঠতে পারেনি তখনও কিশোর।

পোকা-মাকড়ের পর সরীসূপের ডিসপ্লেগুলোর কাছে ওদের নিয়ে গেলেন মিস্টার জনসন। স্টাফ করা কিছু র্যাটলস্নেক আর গোখরো দেখা গেল সেখানে।

মৃত সাপগুলোর চেহারাও ভয়ানক লাগে ।

হাঁপাতে হাঁপাতে চুকল রবিন । কপালে ঘাম ।

কিশোর জিজেস করল, ‘কোথায় গিয়েছিলে?’

‘ফিল্মগুলো ডিভেলাপ করতে গিয়েছিলাম,’ কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রবিন । ‘এক ঘণ্টায় করে দেয় যে সব দোকানগুলোতে, তার একটায় । এখান থেকে আমরা বেরোতে বেরোতে কাজটা হয়ে যাবে ওদের ।’

গ্রিউজিয়াম ক্যাফিটিরিয়ায় লাঞ্চ খেল ওরা । ডাইনোসর দেখার সুযোগ পেল দুপুরের পর । কিশোরের প্রিয় ডাইনোসর টাইরানোসরাস রেক্স । দাঁত কি একেকখান, বাপরে!

‘দেরি হয়ে গেছে,’ মিস্টার জনসন বললেন । ‘আজ আর স্কুলে ফেরার সময় নেই । চলো, বাসে ওঠা যাক । যার যার বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয়া হবে ।’

শুনে খুশি হলো । স্কুলে যেতে যে খারাপ লাগে কিশোরের, তা নয় । কিন্তু এ বকম একটা ফীল্ড-ট্রিপের পর ক্লাস করতে আর ভাল লাগবে না ।

বাস ছাড়ল । আরেকটু হলেই রবিনকে ফেলে আসছিল । শেষ মুহূর্তে দৌড়ে আসতে দেখা গেল ওকে । ওর মুখ দেখেই বুঝে গেল কিশোর, ছবিগুলো ডিভেলাপ করা হয়ে গেছে ।

বাসে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘বাস ড্রাইভারকে তো নতুন দেখছি । কে লোকটা? অঙ্গুত চেহারা!’

ছোটখাট চেহারার অঙ্গুত লোকটাকে কিশোরও চেনে না । আগে কখনও দেখেনি!

কিশোরের পাশে বসল রবিন । ছবির খামটার মুখ ফড়াৎ করে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল । দেখার জন্যে কাত হয়ে এল কিশোর । ঠোকাঠুকি হয়ে গেল মাথায় । কেয়ারই করল না । তর সইছে না দেখার জন্যে । ঠিক এই সময় সীটের সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে এসে ওদের পেছনে দাঁড়ালেন মিস্টার জনসন ।

‘কোথায় গিয়েছিলে, রবিন?’ জিজেস করলেন তিনি । ‘ক্যান্ডি কিনতে গেছিলে নাকি?’

‘না, স্যার,’ মিথ্যে বলল রবিন । ‘ডাইনোসরের ফসিল দেখতে দেখতে এতই তন্মুখ হয়ে গিয়েছিলাম, সবাই যে কখন বেরিয়ে গেছে খেয়ালই ছিল না ।’

‘হ্যাঁ!’ রবিনের কথা বিশ্বাস করলেন কিনা মিস্টার জনসন, বোঝা গেল না । তবে আর কিছু বললেন না তিনি । বাসের সামনের দিকের সীট, যেখানে গিয়ে বসেন সাধারণত, সেখানে বসলেন না । বসলেন ওদের ঠিক পেছনের সীটে । তারমানে, ছবিগুলো দেখা আর এখন সম্ভব না কোনমতে ।

এক এক করে যার যার বাড়ির সামনে নেমে যেতে থাকল ছেলেমেয়েরা । মাত্র অল্প কয়েকজন আর বাকি থাকতে, উঠে সামনের সীটে চলে গেলেন মিস্টার জনসন । সঙ্গে সঙ্গে খাম থেকে ছবিগুলো বের করে ফেলল রবিন ।

‘এই যে দেখো, মা’র ছবিটা,’ ওপরের ছবিটা দেখিয়ে বলল সে, ‘ভাল উঠেছে, তাই না?’

‘বাদ দাও না এ সব!’ অধৈর্য হয়ে বলল কিশোর । তর সইছে না কিশোরের ।

‘মাকড়সার ছবিটা বের করো।’

ছবিগুলোর মধ্যে খুজতে শুরু করল সে। ‘মা’র ছবি, বাবার ছবি-নানা পোজে নানা অ্যাঙ্গেলে তোলা, সবই রয়েছে, পাওয়া যাচ্ছে না কেবল মাকড়সারটা।

রবিন বলল, ‘তাড়াভুড়ার সময় এমনই হয়, আগেও দেখেছি। সর পাওয়া যায়, যায় না কেবল যে জিনিসটা খোঁজা হয় সেটা।’

অবশেষে পাওয়া গেল সেই ছবিটা। শেষ ছবি। তবে তাতে মাকড়সা নেই। আছে অদ্ভুত চেহারার একজন ছোটখাট মানুষ। রূপকথার কল্পিত বামন-মানবের সঙ্গে অনেক মিল। বিকৃত, আঁচিলে ভরা...

মুখ তুলে ড্রাইভারের দিকে তাকাল কিশোর। ছবিটার সাথে অবিকল মিল রয়েছে লোকটার। দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর মত ব্যাপারটা বুঝে ফেলল কিশোর আর রবিন দু'জনেই। শব্দ লক্ষ্য করে ছবি তুলতে গিয়ে মাকড়সা ভেবে লোকটার ছবি তুলে ফেলেছে রবিন। লোকটা মিস্টার জনসনের সহযোগী।

ভীষণ হতাশ হলো দু'জনে।

চারপাশে তাকাতে গিয়ে চমকে গেল কিশোর। ওরা যখন ছবি দেখায় মগ্ন, সে-সময় কখন যে একে একে নেমে গেছে সমস্ত ছেলেমেয়েরা, খেয়ালই রাখেনি। এখন দেখল, বাসের মধ্যে শুধু ওরা দু'জন, মিস্টার জনসন আর তাঁর অদ্ভুত চেহারার ড্রাইভারটা ছাড়া আর কেউ নেই।

জানালার ধাইরে তাকিয়ে আরেকবার চমকানোর পার্শ্ব। রবিনদের বাড়ির পথও নয়, কিশোরদের বাড়ির পথও না, অন্য পথে যাচ্ছে গাড়ি। সবাইকে নামিয়ে দেবার পর শহরের বাইরে অন্য রাস্তায় চলে এসেছে বাস। সেফ একটা গাধা মনে হলো নিজেকে কিশোরের। এতক্ষণ খেয়াল করেনি বলে।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিস্টার জনসন।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল তাঁর বামন-ড্রাইভার।

কিশোর আর রবিন দু'জনেই বুঝল, কপালে দুঃখ আছে ওদের!

বাবো

শহরের এমন এক জায়গা দিয়ে চলেছে ড্রাইভার, যে জায়গাটায় সাধারণত আসা হয় না ওদের। কিশোররা কেন, শহরের কেউই তেমন একটা আসে না এদিকে। জায়গাটা বুনো। পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল।

একটা স্ক্রিজ পেরিয়ে এল বাস। পাশের সরু রাস্তায় নেমে এগোল কিছুদূর। দুই ধারে ভাঙ্গচোরা কিছু ঝুপড়ি আছে। কোন এককালে খনি-শ্রমিকেরা থাকত সন্তুষ্ট ওগুলোতে। সেগুলো পার হয়ে এসে থামল বাস।

সীটের সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে এলেন মিস্টার জনসন। ওদের সামনের সীটে এসে বসলেন। ঘুরে তাকালেন ওদের দিকে।

‘শীঘ্রই তোমাদের নামিয়ে দেয়া হবে,’ বললেন তিনি। ‘তবে তার আগে ভাবছি আমার আজৰ ঘড়িটা দেখাব তোমাদের।’

‘ওই ঘড়ি একবার দেখিয়েছেন আমাকে, মিস্টার জনসন,’ রবিন বলল।

‘হ্যাঁ, দেখিয়েছি। খুব ভাল লেগেছিল তোমার, তাই তো বলেছিলে।’

‘হ্যাঁ, বোধহয় বলেছিলাম।’

‘খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তোমার চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছিল। তাই না?’

‘হ্যাঁ,’ জবাব দিল রবিন।

ঘড়িটা বের করলেন মিস্টার জনসন। রবিনের চোখের সামনে দোলাতে শুরু করলেন। চোখ সরাতে পারছে না রবিন। বুঝতে পারছে আবার সম্মোহিত হয়ে পড়ছে সে, ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে।

কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার জনসন। ‘কিশোর, তোমার কি খবর? ঘড়িটার ব্যাপারে আগ্রহ আছে?’

‘না স্যার।’

‘কেন থাকবে না? এত সুন্দর একটা ঘড়ি। কাছে থেকে দেখতে চাও না? শোনো, আমার কথা শোনো। ঘড়িটার দিকে তাকাও। দেখতে থাকো কেমন করে এটা দূলছে। একবার সামনে যাচ্ছে, একবার পেছনে।’

কিশোর তাকিয়ে আছে ঘড়িটার দিকে। চোখ সরাতে পারছে না। চেন ধরে দুলিয়ে যাচ্ছেন মিস্টার জনসন। সামনে-পেছনে, সামনে-পেছনে।

সম্মোহিত হচ্ছে না কিশোর। জানা আছে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে সম্মোহিত করা যায় না-বিশেষ করে সে যদি বুঝে ফেলে তাকে সম্মোহিত করা হচ্ছে। এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে তখন মগজে।

কিশোরকে সম্মোহিত করতে পারলেন না মিস্টার জনসন। কিন্তু সেটা তাঁকে বুঝতে দিল না কিশোর। দেখতে চাইল, তিনি কি করেন। তাই সম্মোহিত হওয়ার ভান করল।

‘চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে তোমাদের, তাই না?’ দু’জনকেই জিজেস করলেন তিনি।

‘দু’জনেই জবাব দিল, ‘হ্যাঁ।’

‘ভারি! ভীষণ ভারি!’ কেমন একফেয়ে স্বরে বলে গেলেন তিনি। ‘শুধু আমার কঠস্বর ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছ না তোমরা। এখন থেকে তোমরা জানবে, মাকড়সারা আমাদের বন্ধু। বিশ্যকর এক প্রাণী ওরা। কখনও, কোন কারণেই কোন মাকড়সাকে আঘাত করবে না। কাউকে মাকড়সা মারতে দেখলেই এসে বলে দেবে আমাকে। বুঝতে পেরেছ?’

মাথা নেড়ে দু’জনেই জানাল, পেরেছে।

কিশোরদেরকে আরও কিছু নির্দেশ দিলেন তিনি। ওদের মগজে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করলেন-তাঁর বাড়িতে যা যা দেখেছে ওরা, সব ভুলে যাবে। কোনদিন আর তাঁর বাড়িতে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। কি কি দেখে এসেছে সেখানে কাউকে গিয়ে বলবে না।

‘আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনলে জেগে উঠবে তোমরা,’ তিনি বললেন। ‘দেখবে খুব আরাম লাগছে তোমাদের। অস্তুত এক মানসিক শান্তি। তোমাদেরকে যে সম্মোহিত করা হয়েছে, এ কথাটাও মনে করতে পারবে না।...এক...দুই...’

দশ গোণার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল কিশোররা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ড্রাইভার। বাড়ি নিয়ে চলল ওদের।

‘কোথায় নামিয়ে দেব,’ জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার জনসন।

রবিনদের বাড়ির সামনে দু’জনকে নামিয়ে দিতে বলল কিশোর।

নামিয়ে দিয়ে চলে গেল বাস। ফুটপাত ধরে হেঁটে চলল কিশোররা। সতর্ক হয়ে রবিনের সঙ্গে কথা বলতে হবে এখন, ভাবছে কিশোর। আবার তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছেন মিস্টার জনসন। প্রভাব বিস্তার করে আছেন। কিশোর উল্টোপাল্টা কিছু বললেই গিয়ে মিস্টার জনসনকে বলে দেবে রবিন।

‘আমাদের বন্ধু পোকা-মাকড়দের ব্যাপারে অনেক তথ্য আজ জানা হলো, তাই না কিশোর?’ জিজ্ঞেস করল রবিন।

‘হ্যাঁ,’ শান্তকণ্ঠে জবাব দিয়ে পেছনের একটা ঝোপ দেখাল কিশোর। ‘ওখানে গেলেই দেখা যাবে মাকড়সার জাল। দারুণ সুন্দর, তাই না?’

নিজের কানেই বেখাঙ্গা শোনাল তার নিজের কথাগুলো। সুন্দর না ছাই! আগের রাতে আরেকটু হলেই মরতে বসেছিল মাকড়সার ভয়ঙ্কর জালে জড়িয়ে। কিন্তু সে-কথা এখন আর বলা যাবে না রবিনের সামনে। মনেও করিয়ে দেয়া যাবে না।

‘হ্যাঁ, সুন্দর!’ জবাব দিল রবিন। অবিকল জোম্বির মত আচরণ করছে। মুসার মত।

রবিনের সামনে কিশোরকেও জোম্বির আচরণ করতে হলো। বলল, ‘কোনদিন আমরা কোন মাকড়সাকে আর আঘাত করব না।’

‘ঠিক,’ কিশোরের সুরে সুর মিলিয়ে জবাব দিল রবিন, ‘কোনদিন না!’

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

কিশোরও তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল রবিন।

উল্টো দিকে ঘুরে কিশোর রওনা হলো ওদের বাড়িতে।

।

তেরো

রাতের খাওয়ার পর অ্যান্টিক ঘড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার কিশোর। রবিনদের বাড়িতে যাবে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা মোড় পেরিয়ে এসে আরেকটু হলেই মুখোমুখি ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল পরম্পরের সঙ্গে। কিশোর চলেছে রবিনদের বাড়িতে, আর রবিন চলেছে কিশোরদের বাড়িতে।

‘তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি,’ কিশোর বলল।

‘আমিও তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি,’ রবিন বলল।

‘আমাকে দেখানোর আগে তুমি এটা দেখে নাও,’ পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে রবিনের চোখের সামনে দোলাতে শুরু করল কিশোর। সুর করে বলল, ‘ভারি... ভারি হয়ে আসছে তোমার চোখ!’

‘না, আসছে না,’ হাসতে শুরু করল রবিন। পকেট থেকে একটা রিস্টওয়াচ টেনে বের করল। গলায় পরার চেনে বেঁধে নিয়েছে। চেন ধরে কিশোরের চোখের সামনে দোলাতে বলল, ‘তোমার মত অ্যান্টিক তো পেলাম না, তাই আমার হাতঘড়িটাকেই চেনে বেঁধে নিয়েছি। এটাই তোমাকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলাম আমি।’

‘তুমি আমাকে সম্মোহন থেকে মুক্ত করতে যাচ্ছিলে?’ ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

হাসল রবিন। ‘এ ছাড়া আর উপায় কি বলো? তোমাকে তো জোমি বানিয়ে দিয়েছেন মিস্টার জনসন।’

‘আর আমি ভেবেছিলাম, ইচ্ছাশক্তির জোরে আমি ঠিকই আছি, কিন্তু তোমাকে আবার জোমি বানিয়ে দিয়েছেন তিনি।’

দু’জনেই হাসতে শুরু করল। মন্ত ধোকা দিয়েছে মিস্টার জনসনকে। দু’জনেই বুঝে গিয়েছিল ওদেরকে সম্মোহিত করতে চাইছেন তিনি। প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল মগজে। তাই কিছুই করতে পারেননি তিনি। তাঁর সামনে সম্মোহিত হওয়ার ভান করেছে দু’জনেই।

রবিনদের বাড়ির কাছাকাছি রয়েছে ওরা। তাই নিজেদের বাড়িতে না গিয়ে ওদের বাড়িতেই চলে গেল কিশোর।

মুসাকে ফোন করল। যদি বাড়ি থাকে, গিয়ে তাকে সম্মোহনমুক্ত করার ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু মুসাকে পাওয়া গেল না। তার বাবা মিস্টার আমান জানালেন, ক’দিন ধরে মুসার কি যেন হয়েছে। কথাবার্তা, আচরণ সব উল্টাপাল্টা। সারাক্ষণ কীটপতঙ্গ আর মাকড়সার কথা বলে। বাড়িতে মাকড়সার ঝুল পরিষ্কার করতে দেয় না। বাধ্য হয়ে ওর মা ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন।

কি করা যায়, পেছনের বারান্দায় বসে তখন যুক্তি করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। মুসার আশা ছাড়তে হলো। ওকে সম্মোহিত করা হয়েছে ডাক্তার যদি এটা ধরতে না পারেন তাহলে ওকে স্বাভাবিক করতে পারবেন না। ওরাও শুকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারবে না। যা করার এখন দু’জনকেই করতে হবে। যদিও তিনজন থাকলে বাড়তি সুবিধা পেত অনেক।

রবিন যে ছবিটা তুলেছে, তাতে কেবল মিস্টার জনসনের বামন-মানবটার ছবি উঠেছে। মাকড়সার চিহ্নও নেই। এ ছবি দিয়ে কিছু প্রমাণ করা যাবে না। প্রমাণ সংগ্রহ করতে হলে একটাই উপায় আছে। আবার যেতে হবে মিস্টার জনসনের বাড়িতে।

অঙ্ককার হয়ে আসছে। হঠাৎ একটা অস্তুত শব্দ কানে এল বাড়ির পেছনের বন থেকে। গর্জন আর গোঙানির মাঝামাঝি একটা শব্দ। এতই ভয়ঙ্কর লাগল

শব্দটা, রঞ্জ যেন বরফের মত শীতল হয়ে গেল কিশোরের।

আতকে উঠল রবিনও। ‘কিসের শব্দ?’

‘বুঝতে পারছি না!’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। ‘চলো তো দেখে আসি।’
বারান্দা থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল কিশোর।

‘কি খুঁজছ?’ জিজ্ঞেস করল রবিন।

‘একটা অস্ত্র।’

‘কি অস্ত্র?’

‘মাকড়সার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় এমন কিছু। বাড়ি মেরে নাকমুখ ভেঁতা
করে দিতে পারলে কাজ হয়।’

উঠানের পাশে পুরানো একটা ক্রিকেট ব্যাট আর একটা ব্যাডমিন্টন র্যাকিট
পড়ে থাকতে দেখে সেগুলোও তুলে নিল দু'জনে। কিশোর হাতে নিল ব্যাটটা।
রবিন ব্যাডমিন্টন র্যাকিট।

‘এগুলো দিয়ে কিছু হবে না,’ রবিন বলল। ‘গায়েই লাগবে না দানবগুলোর।’

‘নাই মামাৰ চেয়ে কানা মামা ভাল। খালি হাতে তো আৱ যেতে হচ্ছে না।’

বাড়ি মারার ভঙ্গিতে ক্রিকেট ব্যাটটা সামনে বাড়িয়ে ধরে অঙ্ককার উঠানের
মধ্যে দিয়ে এগোল কিশোর। পেছনে রবিন।

আবার কানে এল সেই অস্ত্রুত গোঙানি। শব্দটা আসছে লনের অঙ্ককার কোণ
থেকে।

একটা ঘন ঝোপের কিনারে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

ব্যাটটা ডান হাতে তুলে ধরে রেখে বাঁ হাতে আস্তে করে ঝোপের ডাল-পাতা
সরাল কিশোর।

দেখে স্থির হয়ে গেল।

‘কি?’ কানের কাছে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

‘মিস্টার সিম্পসনের কুকুরটা। জালে আটকা পড়েছে।’

যে রুকম জালে কিশোর আটকা পড়েছিল, তেমনি এক দানবীয় মাকড়সার
জালে আটকে আছে কুকুরটা। শুন্যে ঝুলে থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে পা ছুঁড়ে।
ওদের দেখে কুঁই-কুঁই শুরু করল। মুক্ত করে দেয়ার জন্যে মিনতি জানাতে
লাগল।

‘ছুরিটা আছে নাকি তোমার পকেটে?’ রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘না, ঘরে রেখে এসেছি।’

‘দৌড় দাও। নিয়ে এসোগে।’

দৌড়ে চলে গেল রবিন।

কুকুরটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল কিশোর।

আতক্ষে সিটিয়ে গেছে বেচারা কুকুরটা। জালের বেশি কাছে যাওয়ার সাহস
করল না কিশোর। নিজেরও জড়িয়ে পড়ার ভয় আছে।

হঠাতে করেই অস্ত্রুত শব্দটা শুনল পেছনে। বিস্কুটের টিনে পাথর কিংবা মার্বেল
ভরে ঝাঁকালে যে রুকম শব্দ হয়, অনেকটা সে-রুকম।

অঙ্ককার ছায়ার মধ্যে দেখার চেষ্টা করল। এগিয়ে আসছে বিচ্ছি সেই

শব্দকারী। জুলজুলে দুটো আলোর বল দেখতে পেল। ভালমত দেখার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকল। জিনিসটা কি বুঝতে পেরেই জমে গেল হাত-পা।

মিস্টার জনসনের ল্যাবরেটরিতে দেখা সেই দানব মাকড়সাণ্ডলোর একটা। মাত্র কয়েক ফুট দূরে বসে খুদে খুদে জুলন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে কুকুরটার দিকে।

প্রাণভয়ে বিকট এক চিৎকার করে উঠল কুকুরটা। তারমানে সে-ও দেখেছে মাকড়সাটাকে।

ব্যাট ঘুরিয়ে মাকড়সাটাকে বাড়ি মারল কিশোর।

মুহূর্তে পেছনে সরে গিয়ে বাড়িটা এড়াল মাকড়সাটা। আবার আগে বাড়ল। আবার বাড়ি!

আবার পেছানো!

লাগাতে পারছে না কিশোর। বুঝতে পারছে, লাগলেও ব্যাটের বাড়িতে তেমন ক্ষতি হবে না এই দানব-মাকড়সার।

কিশোরের পাশ কাটিয়ে ঘুরে এগোনোর চেষ্টা করল ওটা। জালের কাছে যেতে চায়। কুকুরের মত একটা রসাল খাবারের খায়ে দাঁত ফুটানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।

রাগ লাগল কিশোরের। দাঁত সে ফুটাতে দেবে না মাকড়সাটাকে।

মাকড়সার খাবার মাছি হতে পারে, অন্য যে কোন কীট-পতঙ্গ কিংবা ছোট জাতের পাখি হতে পারে-প্রকৃতি যে সব খাবার নির্ধারিত করে রেখেছে মাকড়সার জন্যে। কিন্তু মাকড়সার কুকুর খাবে, এটা ভাবতেও ভাল লাগল না।

বাড়ি মারতে মারতে একটা বাড়ি অবশ্যে লাগাতে পারল মাকড়সাটার এক পায়ে। কিশোরকে লক্ষ্য করে পা চালাল ওটা। পায়ের চোখা মাথাটা ধ্রেয়ে এল বল্লমের মত। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল কিশোর। নিজের অজান্তেই হাত উঠে গেল ওপর দিকে, মাথা বাঁচানোর জন্যে। রোমশ একটা পা বাহু ছুঁয়ে গেল কিশোরের। কোন কিছুর স্পর্শ এত ভয়ঙ্কর লাগেনি কখনও।

চোদ্দ

‘কিশোর?’ রবিনের ডাক শোনা গেল। ‘কি হয়েছে?’

চলে এসেছে সে। তার এক হাতে ছুরি আর আরেক হাতে একটা বড় সাইজের টর্চ।

‘এখান পর্যন্ত চলে এসেছে ওটা!’ জবাব দিল কিশোর।

‘কি...?’ কথা শেষ হলো না রবিনের। মাকড়সাটার গায়ে টর্চের আলো পড়তেই থেমে গেল সে। দেখে ফেলেছে ওটাকে।

এতক্ষণ অস্পষ্ট ভাবে দেখছিল কিশোর। এখন সে-ও স্পষ্ট দেখল।

মাকড়সার চোখ দুটো জুলন্ত কয়লার মত জুলছে। মন্ত এক সাঁড়াশির মত দুই পাশে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে ভয়াল দাঁতকাটা চোয়াল। কালো লোমে ঢাকা গা। শিকারের কাছে যেতে বাধা পেয়ে ভীষণ খেপে গেছে মাকড়সাটা!

ব্যাট নিয়ে ওটার মুখোমুখি হলো কিশোর। আটকে রাখল। লাগুক না লাগুক এগোনোর চেষ্টা করলেই ব্যাট চালায়। এ সুযোগে জালটা কেটে দিতে থাকল রবিন।

দুই দুই বার এত কাছে চলে এল মাকড়সাটা, ধাম ধাম করে পিঠে বাড়ি মারল কিশোর। তাতে কিছুই হলো না ওটার।

এ ভাবে কতক্ষণ ঠেকাবে? ব্যাটের বাড়িতে ব্যথা না পেলে খুব শীত্রি সাহস বেড়ে যাবে ওটার।

আরেক বুদ্ধি করল তখন কিশোর। ব্যাটটাকে দু'হাতে সোজা করে ধরে গায়ের জোরে খোঁচা মারল মাকড়সাটার মাথা লক্ষ্য করে। কপ করে ব্যাটের মাথাটা কামড়ে ধরল ওটা। ধারাল দাঁতগুলো কেটে বসে গেল ব্যাটের গায়। টেনে আর ছুটাতে পারল না।

‘রবিন! হলো তোমার?’ চিংকার করে উঠল সে।

‘এই হয়ে গেছে। আর মাত্র সামান্য কয়েকটা সুতো।’

‘তাড়াতাড়ি। আর পারছি না।’

হাঁচকা টান দিয়ে কিশোরের হাত থেকে ব্যাট কেড়ে নিয়ে গেল মাকড়সাটা। আর কোন উপায় না দেখে ঠিক ওটার চোখ বরাবর আলো ফেলল কিশোর। তীব্র আলো দেখলে সব জানোয়ারই সাধারণত যা করে-থমকে যায়, মাকড়সাটাও তাই করল। আলো ভাল লাগছে না ওটার। তবে এই আলোও যে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না বেশক্ষণ, বুঝতে পারছে কিশোর।

সামনের একটা পা তুলে থাবা মারল ওটা। কিশোরের বুকে এসে লাগল আঘাতটা। চিত হয়ে পড়ে গেল সে। তার গায়ের ওপর এসে উঠল মাকড়সাটা। ভয়ঙ্কর চোয়াল দুটোকে মুখের ছয় ইঞ্চি তফাতে দেখতে পেল কিশোর। আরও নামিয়ে আনতে লাগল মাকড়সাটা।

ঠিক ওই মুহূর্তে জাল কাটা শেষ হলো রবিনের। মুক্ত হয়ে গেল কুকুরটা। দৌড়ে এল ওদের দিকে। মাকড়সাটার কাছে এসে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল। পিছিয়ে গেল মাকড়সাটা। খেপা কুকুরের চিংকার এমনই ভয়ানক, দানব-মাকড়সাকেও ভড়কে দিল।

একটা মুহূর্ত আর দেরি না করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দৌড় দেয়ার আগে ডেকে সরিয়ে আনল কুকুরটাকে। ওখানে থাকলে আবার জালে আটকা পড়তে পারে।

বাড়ির দিকে দৌড়াতে লাগল দু'জনে। পেছন পেছন এল কুকুরটা।

হড়মুড় করে ঘরে চুকে পড়ল কিশোর আর রবিন। কুকুরটা ও চুকল ওদের সঙ্গে।

দরজা লাগিয়ে একেবারে ছিটকানি তুলে দিল রবিন।

লিভিংরুমে বসে কাগজ পড়ছেন রবিনের বাবা মিস্টার মিলফোর্ড। অবাক

হয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

‘বাবা,’ রবিন বলল, ‘প্রাণীদেহকে বিশাল করে তোলার উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন আমাদের সাইন্স টীচার মিস্টার জনসন। মাকড়সাকে দানব বানিয়েছেন, মন্ত জাল বানিয়ে ফাঁদ পেতে বসে থাকে ওগুলো শিকার ধরার অপেক্ষায়...’

‘অতিরিক্ত হরর কাহিনী পড়া শুরু করলে নাকি?’ বিশ্বাস করলেন না তিনি।

‘বানিয়ে বলছি না, বাবা। বিশ্বাস করো।’

‘ঘুমানোর আগে আর ভয়ের গল্প পড়বে না। মগজে থেকে যায়। ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখায়। জেগে উঠলেও সে-সব দৃশ্য আটকে থাকে মগজের কোষে কোষে।’

‘দুঃস্বপ্ন না, বাবা,’ মরিয়া হয়ে চিংকার করে উঠল রবিন। ‘বাস্তবেই দেখে এসেছি মাকড়সাগুলোকে।’

‘কুকুরটাকে জোগাড় করলে কোথেকে?’ রবিনের কথা শুনতেই চাইলেন না মিস্টার মিলফোর্ড।

বুঝতে পারল কিশোর, কেউ ওদের কথা বিশ্বাস করবে না, কাউকে বোঝানো যাবে না, যতক্ষণ না নিজের চোখে দেখবে। প্রমাণ আনতেই হবে। তারমানে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হলেও আরও একবার মিস্টার জনসনের বাড়িতে যেতে হবে ওদের।

*

এবার মিস্টার জনসনের বাড়িতে যাওয়ার সময় পেনলাইট না নিয়ে নিল রবিনের বড় টর্চটা। ক্যামেরা তো নিলই। কাঠের ব্যাটেট্যাট দিয়ে হবে না, তাই স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে একটা লোহার ডাঙা নিয়ে নিল কিশোর। ইয়ার্ডে ওসব জিনিসের অভাব নেই।

‘এ ভাবে ঝুঁকি নেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?’ কাঁচা রাস্তাটা ধরে আরও একবার হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন।

‘না নিয়ে কি করব?’ বলল কিশোর। ‘মাকড়সার জালে আজ আমি পড়েছি, কাল তুমি পড়বে। তোমাদের বাড়ির কাছে চলে আসার সাহস দেখিয়েছে প্রাণীটা। কুকুর-বিড়াল খেতে খেতে এক সময় ইন্দুষের দিকে নজর দেবে। একের পর এক মানুষ ধরে থাচ্ছে, কল্পনা করতে পারো? খাবে আর বাচ্চা জন্ম দেবে। মানুষখেকো মাকড়সার সংখ্যা বাড়তে থাকবে অবিশ্বাস্য গতিতে। প্রতিবারে একটা মাকড়সা কি পরিমাণ ডিম পাড়ে জানো না?’

‘কম করে হলেও পাঁচশো।’

‘ধরা যাক একবারে একটা দানব-মাকড়সা পাঁচশো করে ডিম পাড়ল, সেগুলো ফুটে বাচ্চা বেরোল, বাচ্চাগুলো বড় হলো। কল্পনা করতে পারো কি ঘটবে? মাকড়সায় মাকড়সায় ছয়লাপ হয়ে যাবে। শহরের কোন মানুষ, কোন প্রাণীকে বাঁচতে দেবে না ওরা। এবং এ সবের জন্যে দারী হবেন একটিমাত্র লোক-মিস্টার জনসন। সুতরাং তাঁকে ঠেকাতেই হবে। নইলে শহরের পর শহর ধ্বংস করে দিতে থাকবে তাঁর মাকড়সা-বাহিনী, বিরান করে দেবে জনপদ,

হৃষ্মকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে গোটা পৃথিবী।'

বিদ্যুৎ চমকাল। কড়াৎ করে বাজ পড়ল। এত কাছে, মনে হলো মাথায় পড়ল। ভীষণ চমকে পেল ওরা। বিপদের ঘোলোকলা পূর্ণ হলো যখন বৃষ্টি শুরু হলো। কল্পনাই করেনি বৃষ্টি আসবে। বর্ষাতি আনার কথা মাথায় আসেনি তাই।

মিস্টার জনসনের বাড়িতে পৌছে সোজা সামনের বারান্দার দিকে রওনা হলো ওরা।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'এভাবে চুরি করে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছি। সোজা গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে, ভেতরে ঢুকে, মিস্টার জনসনকে এ সব বন্ধ করতে বলার সময় এসে গেছে।'

'পাগল নাকি!'

জবাব না দিয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল কিশোর। দরজায় ঠেলা দিল।

'যদি কিছু করে?' ভয় যাচ্ছে না রবিনের।

'আরে দূর, পাগল নাকি জিজ্ঞেস করি। এমনি বললাম।'

প্রথম ঠেলাটায় খুলল না দরজা। আরেকটু জোরে ঠেলা দিতেই কজার ক্যাচকেঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল। ভেজানো ছিল পাল্টাটা।

ভেতরে উকি দিল কিশোর। কেউ নেই। কিছু নেই। না আসবাবপত্র, না পর্দা; কিছু না।

'এসো,' রবিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে ডাক দিল কিশোর।

ভেতরে ঢুকতেই প্রথম যে অনুভূতিটা হলো, সেটা হলো মুখে আঠা আঠা কিছু লেগে যাওয়ার অনুভূতি। বুরাতে পারল, মাকড়সার জাল। ঘরে আর কিছু না থাক, এই একটা জিনিস প্রচুর পরিমাণেই আছে। শত শত, হাজার হাজার মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে। মাকড়সাগুলো সব ছোট আকারের, অর্থাৎ স্বাভাবিক মাকড়সা।

'ঘরে মাকড়সা পোষেন মিস্টার জনসন,' ফিসফিস করে বলল রবিনকে। 'তিনি বাস করেন নিচে, মাটির তলার ঘরে, তাঁর ল্যাবরেটরির কাছে। ওপরের এই ঘরটায় এখানে বংশবৃক্ষি করে চলেছে সাধারণ মাকড়সাগুলো। এগুলো তাঁর গিনিপিগ। প্রয়োজন পড়লেই এখান থেকে নিয়ে যান।'

জালের ভেতর দিয়ে এগোতে ভাল লাগল না ওদের। কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই। নিচে নামার সিঁড়ির দরজাটা খুঁজতে লাগল।

'অসংখ্য ছোট ছোট ঘর। অলি-গলি-বারান্দায় ভরা।' কোনটাতে যে নিচে নামার সিঁড়ি রয়েছে, কে জানে।

হঠাতে কানের কাছে গুঞ্জন করে উঠল কিসে যেন। বট করে মাথা নিচু করে ফেলল কিশোর। ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা। আওয়াজে মনে হলো ছোটখাট একটা অ্যারোপ্লেন উড়ে গেল।

'ওই যে, আবার আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'আলোটা ধরে রাখো সোজা করে,' বলল কিশোর।

এবারে আর শুধু মাথা নামিয়ে কাজ হলো না, একেবারে শুয়ে পড়তে হলো

মেঝেতে। নইলে গুঁতো লাগত মাথায়। আলোটা জ্বেলেই রেখেছে রবিন। কিন্তু দেখতে পারল না ঠিকমত।

আবার ফিরে এল ওটা।

এবার দেখল।

একটা মাছি।

কিন্তু সাধারণ মাছি নয়। বাক্সেটবলের সমান বড়। ডাইভ দিয়ে এসে ডানার বাড়িতে রবিনের হাত থেকে টর্চটা ফেলে দিল। ডানার বাতাস লাগল কিশোরের গায়ে। একেকটা ডানা তিন ফুট লম্বা।

‘দেখলে?’ জিজ্ঞেস করল রবিন।

‘হ্যাঁ,’ গলা কাঁপছে কিশোরের।

নিচু হয়ে টর্চটা তুলে নিল রবিন। আলোটা নেভেনি। মাছিটার ওপর ধরল। ওদের ঘিরে চক্কর মারছে ওটা। খানিকটা সরে গিয়ে হঠাৎ আলো লক্ষ্য করে ছুটে এল। লাফিয়ে সরে গিয়ে ডাঙা ঘুরিয়ে বাড়ি মারল কিশোর।

মাথায় লাগল বাড়ি। মাটিতে পড়ে বার দুই নাচানাচি করে চুপ হলো মাছিটা।

‘মরে গেছে?’ রবিনের প্রশ্ন।

জবাব দিল না কিশোর। বিমুচ্ছের মত তাকিয়ে আছে।

রবিনের প্রশ্নের জবাব মাছিটাই দিল। উঠে দাঁড়াল ওটা। মাথা বাড়া দিল। মস্ত চোখ দুটাতে অসংখ্য লেপ চকচক করছে। সামনের পা দিয়ে মাথা ঘষল কয়েকবার। তারপর উড়ে গেল। ওদের প্রতি আর আগ্রহ দেখাল না।

‘নিশ্চয় দানব-মাকড়সাগুলোকে খাওয়ানোর জন্যেই দানব-মাছির প্রজনন করছেন মিস্টার জনসন,’ রবিন বলল। ‘কিন্তু জান কি শক্ত! এত জোরে বাড়ি খেয়েও মরল না!'

ভয়ে ভয়ে বলল কিশোর, ‘মাছিরই এই অবস্থা। দানব-বোলতা আর দানব-ভীমরূপ না বানিয়ে থাকলেই বাচি।’

‘তা বোধহয় বানাবেন না। বোলতা আর ভীমরূপেরা মাকড়সার দুশ্মন।’

‘না বানালেই ভাল। চার ফুট লম্বা ভীমরূপের হুলের খোঁচা খেতে চাই না আমি।’

বাইরে ঘন ঘন বাজ পড়ার শব্দ হচ্ছে। জানালার কাঁচে আঘাত হানতে শুরু করল বৃষ্টির ফোঁটা।

শূন্য ঘর। গা ছমছমে পরিবেশ। বিদ্যুতের আলো থেকে থেকেই আলোকিত করে দিচ্ছে ঘরটাকে। আলো নিভে গেলেই গাঢ় অঙ্ককারে নিমজ্জিত হচ্ছে।

অবশেষে খুঁজে পেল সিঁড়ির দরজাটা। সামান্য ফাঁক করে নিচে তাকাল কিশোর। আলো জ্বলছে। কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। গলা শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই মিস্টার জনসন। তার সহকারীর সঙ্গে কথা বলছেন।

তাকিয়ে থাকতেই এমন একটা জিনিস চোখে পড়ল কিশোরের, দম আটকে এল। একটা টারানটুলা মাকড়সা। চারফুট লম্বা দেহ, কালো কালো মোটা রোমশ পা, বড় বড় দাঁত। সিঁড়ির গোড়ায় বসে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পনেরো

‘ক্যামেরা রেডি করো,’ রবিনকে বলল কিশোর।

কানে এল মিস্টার জনসনের কষ্ট, ‘কি ব্যাপার, কিরিকিরি? কিছু দেখেছিস?’

কিরিকিরি! অস্তুত নাম তো! নিচয় মাকড়সাটার। পাহারাদার কুকুরের মত পাহারা দেয়ার জন্যে সিঁড়ির গোড়ায় বসিয়ে রেখেছেন মিস্টার জনসন।

মুহূর্তে খচমচ করে সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেক ওপরে উঠে চলে এল মাকড়সাটা। মিস্টার জনসন ক্লাসে কি বলেছিলেন মনে পড়ল। টারানটুলারা জাল বানায় না। মাটিতে খোঁড়া গর্তে লুকিয়ে থাকে। শিকার দেখলেই ছুটে গিয়ে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাকড়সা-জগতের সবচেয়ে দ্রুতগামী মাকড়সাদের একটা। ভয়ানক শিকারী।

‘হবি তোলো। কুইক!’ রবিনকে তাগাদা দিল কিশোর। দরজাটা পুরো ফাঁক করে দিল। যাতে সিঁড়িতে বসা দানবটাকে ভালমত দেখতে পায় সে।

বিলিক দিয়ে উঠল ক্যামেরার ফ্ল্যাশার।

‘কে? কে?’ চিংকার করে উঠলেন মিস্টার জনসন।

আবার বিলিক দিয়ে উঠল তীব্র আলো। এটা আর ফ্ল্যাশারের আলো নয়, বিদ্যুতের চমক। পরক্ষণে বাড়ি কঁপিয়ে দিল বজ্রপাতের শব্দ। দপ করে নিভে গেল নিচতলার বাতি। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে নিচয়। ঘন অঙ্কুরারে চেকে গেল বাড়িটা।

বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে দৌড় দিল দু’জনে।

কিন্তু কোথায় ওটা? পাচ্ছে না। কিশোরের মনে হলো এক গোলকধাঁধার মধ্যে চুকে পড়েছে। হাতে, মুখে ক্রমাগত জড়াচ্ছে মাকড়সার জাল। ভুল করে সামনের দরজার কাছে না গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে আরেকটা ঘরে চুকে পড়ল। এটা থেকে বেরোনোর কোন পথ নেই। মাকড়সাটার এগিয়ে আসার শব্দ কানে আসছে। হাঁটার সময় কাঠের মেঝেতে ওটার পা পড়ে চোলের গায়ে কাঠি পড়ার মত শব্দ হচ্ছে।

‘ওই যে, দরজা!’ বিদ্যুতের আলোয় দেখে ফেলল রবিন।

দৌড় দিল ওটার দিকে। সিঁড়ি চলে গেছে ওপাশ থেকে। দৌড়ে উঠে এল ওপরে। আরও ভালমত আটকা পড়ল এখন।

ওপরতলাতেও অসংখ্য ছোট ছোট ঘর আর হলওয়ে, নিচতলার মতই। এখানে মাকড়সার জাল আরও ঘন। করিডরের দিকে দৌড় দিল। সারা গায়ে আটকে যেতে থাকল আঠাল জাল।

একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

টর্চ জুলল রবিন। দরজার গায়ে লেখা : প্রবেশ নিষেধ।

তারমানে সাংঘাতিক কিছু রয়েছে অন্যপাশে। লুকানোর জন্যে মোটেও উপযুক্ত জায়গা নয়।

আর কোন উপায় না দেখে ওটাতেই চুকে পড়ল ওরা। দরজাটা লাগিয়ে দিল। বাকি ঘরগুলোর মতই এটাও খালি।

অবাক লাগল কিশোরের। ‘বাইরে ওই সাইমবোর্ড লাগানো কেন?’ নিজেকেই প্রশ্ন করল সে।

‘চুপ!’ সাবধান করল রবিন।

হলওয়ে ধরে মাকড়সাটার আটপায়ে হেঁটে এগিয়ে আসার শব্দ কানে আসছে স্পষ্ট। তবে মনে হয় এ ঘরে চুকতে পারবে না ওটা। আপাতত ওরা নিরাপদ।

‘আবার বিদ্যুৎ চমকাল।

তীব্র আলোয় ক্ষণিকের জন্মে পরিষ্কার দেখতে পেল ঘরটা।

‘এতক্ষণে বুঝলাম, বাইরের ওই সাইনবোর্ড লাগানোর কারণ!’ বিড়বিড় করে বলল কিশোর। আতঙ্কে দম আটকে আসতে চাইছে তার।

‘কি কারণ?’ রবিন এখনও দেখেনি ওটাকে।

‘বাঁয়ে কোনার দিকটায় আলো ফেলো, তাহলেই বুঝতে পারবে।’

আলো ফেলল রবিন।

ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা কাঁকড়াবিছে। ছয় ফুট লম্বা। লেজের মাথার হুলটা তরোয়ালের মত দোলাচ্ছে এপাঞ্চ-ওপাশ।

ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল ওদের দিকে।

‘কিন্তু কাঁকড়াবিছে কেন?’ কিশোরের প্রশ্ন।

‘মনে নেইও’ রবিন বলল, ‘বইয়ের এগারো নম্বর চ্যাপ্টারে আছে-মাকড়সা আর কাঁকড়াবিছেরা কাছাকাছি গোত্রের। খালাত ভাইটাই আরকি।’

‘হ্যাঁ। মনে পড়েছে।’

‘ওই যে, চলে এসেছে!'

টর্চের আলোয় দেখা গেল, গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ওটা। দ্রুত ছুটে আসছে ওদের লক্ষ্য করে। লেজসহ দেহের পেছনের অংশটা বাঁকিয়ে নিয়ে এসেছে মাথার ওপর।

লাফ দিয়ে সরে গেল দু'জনে দু'দিকে। কিশোরের হাতে লোহার ডাঙা আছে, কিন্তু ওটা দিয়ে বাড়ি মেরেও কিছুই করতে পারবে না এতবড় দানবের।

শাঁই করে হুল চালাল বিছেটা। কিশোরের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল ফুটখানেক লম্বা ইস্পাতের মোটা সুচের মত হুলটা।

দৌড়ে ঘরের অন্যপ্রান্তে চলে গেল কিশোর আর রবিন। একটা দরজা আছে ওদিকটায়। দেয়াল-আলমারির দরজা বোধহয়। চুকে পড়তে পারলে খানিকটা নিরাপত্তা তো দিতে পারবে।

চুকে পড়ল ওটার মধ্যে। দরজাটা ধরে টানতে লাগল কিশোর। যত জোরেই টানে, বন্ধ আর হয় না।

‘ওই আবার আসছে!’ চিৎকার করে উঠল রবিন।

গায়ের জোরে দরজাটা ধরে হ্যাচকা টান মারল কিশোর। খুলে চলে এল আন্ত পাল্লাটাই। কাঠ এতটাই পচে গেছে, কজা থেকেই ছুটে গেছে। ঠিকই ওই মুহূর্তে কাছে পৌছে গেল বিছেটা। দরজাটা পড়ল ওটার ওপর।

ভারী দরজার নিচ থেকে রেরিয়ে গেল বিছে। কিন্তু অতিরিক্ত ছটফট করতে লাগল। আর এগোনোর চেষ্টা করছে না। আলো ফেলে ভালমত দেখার পর বোৰা গেল ঘটনাটা কি ঘটেছে। দরজার চাপে ওটার নিজের হুল নিজের গায়েই ফুটেছে। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে আস্তে করে আট পায়ের ওপর বসে পড়ল ওটা। আর নড়ল না। মরে গেছে।

বিশাল, ভয়ঙ্কর, কৃৎসিত প্রাণীটার একটা ছবি তুলল রবিন।

ব্যস, হয়ে গেছে। যথেষ্ট প্রমাণ হাতে চলে এসেছে ওদের। এখন এখান থেকে বেরোতে পারলেই হয়।

কিন্তু পারবে তো?—ভৱসা পাছে না কিশোর।

‘ওপরতলায় শব্দ ওন্লাম,’ বলল একটা কণ্ঠ। নিশ্চয় মিস্টার জনসনের সহকারী।

জবাবে মিস্টার জনসন বললেন, ‘ভালমত খুঁজে দেখো সবগুলো ঘর।’

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল পায়ের শব্দ।

প্রতিটি ঘরের দরজা খুলে খুলে দেখতে লাগলেন মিস্টার জনসন ও তাঁর সহকারী।

একটা বুদ্ধি এল কিশোরের মাথায়। যে ঘরটায় ঢুকেছে, তার দরজার সামনে আড়আড়ি ভাবে ফেলে রাখল লোহার ডাঙুটা। দরজার পাশের দেয়ালের গায়ে গো মিশিয়ে সেঁটে রাইল কিশোর আর রবিন।

দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল মিস্টার জনসনের সহকারী ছোটখাট মানুষটা। হাতে একটা মশাল। টর্চ নেই ওদের কাছে এ কথা বলা যাবে না,, নিশ্চয় নিরাপত্তার জন্যে আগুন নিয়ে চলাফেরা করে। দানবীয় কাঁকড়াবিহুর মত প্রাণীর বিরুদ্ধে আগুন একটা বেশ নির্ভরযোগ্য অস্ত্র।

ঢুকেই দেখে ফেলল ওদের। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল কৃৎসিত মুখটাতে। বেশির ভাগ দাঁতই নেই লোকটার। যা-ও বা আছে, কালো কালো দাগওয়ালা, পচা দাঁত।

ওদের দেখে আনন্দে শয়োরের মত ঘোঁ-ঘোঁ করে উঠল সে।

ওদের দিকেই নজর লোকটার, কোথায় কিসের মধ্যে পা দিয়ে বসছে সে-খেয়াল নেই। অতএব যা ঘটার তাই ঘটল। পাইপের মত ডাঙুটায় পা দিয়ে বসল। জুতোর নিচে পড়ে গড়িয়ে গেল ওটা। সামলাতে না পেরে ধুড়ুম করে চিত হয়ে পড়ল সে-ও।

পালানোর জন্যে কয়েক সেকেন্ড সময়ের প্রয়োজন ছিল গোয়েন্দাদের। সেই সময়টুকু পেয়ে গেল। পড়ে থাকা লোকটাকে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলে এল দরজার বাইরে। ডাঙুটা তুলে নিতে ভুলল না। দৌড়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

নিচতলায় নেমে আবার সেই অসংখ্য ঘর আর অলি-গলির গোলকধাধা কোনদিকে গেলে যে ঢোকার বড় ঘরটা পাবে, বুঝাতে পারল না। খুঁজতে খুঁজতে

অবশ্যে পেয়ে গেল ঘরটা। পরিচিত লাগল। এটা দিয়েই চুকেছে। সামনের দরজাটা খোলা রয়েছে এখনও। বাইরে বামবাম বৃষ্টির শব্দ।

দৌড় দিতে যাচ্ছিল রবিন। তার হাত খামচে ধরল কিশোর। ‘দাঁড়াও!'

কেন তাকে থামানো হলো, বুঝতে সময় লাগল না রবিনের। খোলা দরজার কাছে বসে রয়েছে আরেকটা দানব। মাকড়সাই, তবে টারান্টুলাটা নয়। অন্য প্রজাতির আরেকটা। সরু সরু লম্বা পা। কালো চকচকে শরীর। আর পিঠে সেই ছাপ মারা আওয়ারগ্লাসের চিহ্ন।

‘দেখলে?’ ফিসফিস করে বলল কিশোর।

আলোটা স্থির করল রবিন। মাকড়সার পিঠের ডিজাইনটা স্পষ্ট হলো। টারান্টুলার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর মারাত্মক বিষাক্ত ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার।

‘মিস্টার জনসন বলেছিলেন সাধারণ একটা ব্ল্যাক উইডোর কামড় ঘোড়াকে মেরে ফেলে,’ বিড়বিড় করে বলল কিশোর। ‘এটার কামড়ে কি মরবে? হাতি? নাকি তিমি?’

‘সাধারণ একটা লোহার ডাঙা দিয়ে কিছু করতে পারব না এটার!’ গজা কাঁপছে রবিনের।

নড়ে উঠল মাকড়সাটা। এগিয়ে আসতে শুরু করল ওদের দিকে।

ঘুরে উল্টো দিকে দৌড় মারল দুই গোয়েন্দা।

ষোলো

মাটির নিচের ঘরে নামার দরজাটা পাওয়া গেল। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, নামলে নিচেই নামতে হবে। কিশোর ভাবল, যা থাকে কপালে-নিচে নেমেই দেখি, যদি ওখান থেকে বেরোনোর কোন পর্য পাওয়া যায়। না পেলে শেষ।

ভাবার সুযোগ পেল না বেশিক্ষণ। কানে এল মিস্টার জনসনের কণ্ঠ। ফাঁদে আটকা পড়েছে ওরা ভালমত।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল দু'জনে। ল্যাবরেটরিতে নেমেছে। টেবিলটায় আলে ফেলল রবিন। নানা ধরনের শিশি-বোতলে নানা রঙের তরল আর পাউডার টেবিলের শেষ মাথায় কয়েকটা বোতলে কালচে লাল তরল দেখা গেল শিশিগুলোতে লেবেল লাগানো; বিগ।

‘এটাই হলো আসল জিনিস,’ বলে উঠল কিশোর। ‘বিগ! তারমানে নিশ্চয় প্রাণীদেহকে বড় করার ফরমুলা রয়েছে এটাতে।’

‘দিই খতম করে, কি বলো?’ রবিন বলল।

‘হ্যাঁ, চলো।’

বোতলগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে মুখ খুলে ভেতরের তরল পদার্থ সিঙ্কে ঢেলে

ফেলতে লাগল দু'জনে। ভীষণ দুর্গন্ধ। অ্যামেনিয়ার সঙ্গে কেরোসিন মিশালে যে রকম গন্ধ বেরোয় অনেকটা তেমনি। তিনটে বড় বোতলের ওষুধ ফেলে শেষ করল প্রথমে। বাকি রইল একটা ছোট শিশি। মুখটা গেছে আটকে। খুলতে না পেরে পকেটে ভরে ফেলল ওটা কিশোর। বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

‘বেরোনো দরকার এখন,’ রবিনকে বলল সে।

‘ওই জানালাটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?’ রবিন বলল। ‘যেটা দিয়ে উঁকি দিতাম আমরা...’

‘চুপ! বসে পড়ো। মনে হয় আসছে ওরা।’

একটা আলমারির নিচের দিকটায় চুকে বসে পড়ল দু'জনে। অঙ্ককারে ওদের দেখতে পাবেন না। জনসন, আশা করল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপর থেকে প্রথমে নেমে এলেন মিস্টার জনসন। পেছনে তাঁর ভূতুড়ে চেহারার সহকারীটা।

‘কই, গেল কোথায়?’ মিস্টার জনসন বললেন। ‘আরি, ওষুধগুলো কই? আমার ওষুধ! নিশ্চয় ফেলে দিয়েছে। হায় হায়, আমার এতদিনের সাধনা। দাঁড়াও, হাতে পেয়ে নিই একবার, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করব।’

অঙ্ককারে গা মিশিয়ে আরও ঠাসাঠাসি করে বসল কিশোররা। ল্যাবরেটরিতে দুপদাপ করে পা ফেলে বেড়াতে লাগলেন জনসন, খুঁজছেন ওদের। বাড়ির অন্য আরেক অংশে খুঁজতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছেন, ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চলে এল। নিশ্চয় লাইন মেরামত করে ফেলেছে। যেন কিশোরদের বিপদ বাঢ়ানোর জন্যেই একেবারে সময়মত কাজটা সেরে ফেলল বিদ্যুৎ কোম্পানির লোকেরা।

আর লুকিয়ে থাকা গেল না। মিস্টার জনসনের সহকারীটা দেখে ফেলল ওদের। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠে হাত তুলে মিস্টার জনসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

‘ওই তো! ওই তো শয়তানগুলো!’ চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার জনসন। ‘এখানে এসে লুকিয়েছে। আমার এত কষ্টের ফসল নষ্ট করে দিয়ে এখন এখানে এসে বসে আছ। সামান্য কয়েক বোতল ওষুধ ফেলে দিয়ে মনে করেছ আমার মাকড়সা বন্ধুদের ঠেকাতে পারবে? ফরমুলাটা এখনও আছে। আবার ওষুধ বানাব আমি। আর তোমাদের আমি ছাড়ব মনে করেছ? মাকড়সা দিয়েই খাওয়াব। তোমাদের দিয়েই হবে আজ ওদের দুপুরের ভোজ।’

আর বসে থাকার কোন মানে হয় না। হড়মুড় করে আলমারি থেকে বেরিয়ে দৌড় মারল কিশোর। একদৌড়ে ঘরের একেবারে আরেক প্রান্তে। কাউন্টারে উঠে হাত উঁচু করে জানালাটা ধরার চেষ্টা করল। কাঠের ফ্রেমে আঙুল বাধতেই ধরে হ্যাচকা টান মারল। পুরানো জিনিস বলেই ভেঙে গেল। টান লেগে খুলে চলে এল। তাজা ঠাণ্ডা বাতাস যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ের ওপর। আহ, আনন্দ! যেন মুক্তির। যদিও মুক্তি তখনও অনেক দূর।

‘এক কাজ করো,’ রবিনকে বলল, ‘আমার কাঁধে চেপে উঠে যাও।’

‘আমি আগে যাব?’

‘আহ; তর্ক কোরো না! যাও!’ প্রায় জোর করে ধরে ওকে তুলে দিল কাঁধের

ওপৰ ।

জানালা ধৰে ঝুঁলে পড়ল সে ।

‘দাঁড়াও! থামো!’ চিৎকার করে উঠলেন মিস্টার জনসন ।

ভার রাখতে পারল না পুরানো জানালা । ভেঙে নিচে পড়ে গেল রবিন ।

বুঝল কিশোর, আর বেরোতে পারবে না । ধৰা পড়ে গেছে । ওদের কাছে দৌড়ে চলে এসেছেন মিস্টার জনসন ।

ঠিক এই সময় ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ হলো । প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে জনসনের সহকারী । উপুড় হয়ে পড়েছে কাঁচের জার শিশি-বোতলের ওপর । হাতের মশালের বাড়ি লেগে ভেঙে পড়েছে রাসায়নিক পদার্থ ভর্তি অনেকগুলো বড় বড় জার । শব্দটা তারই ।

ধাক্কাটা কে দিয়েছে, দেখে ক্ষণিকের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল সবাই । বিশেষ করে মিস্টার জনসন ।

সহকারীর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা । হই-হটগোলের সময় কখন যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে সে, কেউ খেয়াল করেনি ।

মুহূর্তে আগুন ধৰে গেল রাসায়নিক পদার্থে ।

‘আরে করলে কি, গাধা কোথাকার!’ রাগে চিৎকার করে উঠলেন জনসন । ‘দিলে তো সব ধৰ্ষস করে । গেল আমার সমস্ত সাধনা ।’ কাগজপত্র পুড়তে দেখে তিন গোয়েন্দাকে ভুলে গিয়ে সেগুলো বাঁচাতে দৌড় দিলেন । ‘হায় হায়রে, আমার ফরমুলাগুলোও গেল !’

প্রচণ্ড আক্রোশে মশাল নিয়ে এসে তিন গোয়েন্দার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল জনসনের সহকারী । কিন্তু তিনজনের সঙ্গে পারল না সে । দেখতে দেখতে ওকে কাবু করে ফেলল ওরা । হাতের মশালটা কেড়ে নিল মুসা ।

‘জলদি এসো !’ চিৎকার করে বলে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল কিশোর ।

তার পেছনে ছুটল রবিন ।

মশাল হাতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিল একটা সেকেন্ড মুসা, মিস্টার জনসন বাধা দিতে এলেই দেবে মাথায় বাড়ি মেরে-শিক্ষক হোন আর যা-ই হোন, কোন কিছুর পরোয়া করবে না সে । জোমি বানিয়ে তাকে ভুগিয়েছে, সে-আক্রোশটা রয়ে গেছে তার ।

কিন্তু বাধা দিতে এলেন না মিস্টার জনসন কিংবা তাঁর সহকারী । নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত । দু’জনেই পালানোর জন্যে অস্ত্র হয়ে উঠল, কারণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন ।

নিরাপদেই বাইরে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা ।

স্বাধীন এখন ওরা ।

ওখানে থাকলে আবার কোন বিপদে পড়ে, এই ভয়ে একটা মুহূর্ত আর দাঁড়ানোর সাহস করল না । দৌড়ানো শুরু করল রাস্তার দিকে ।

কিছুদূর এগিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর । দেখল, বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছে দুটো ছায়ামূর্তি । মিস্টার জনসন ও তাঁর ভূতুড়ে সহকারী । ধোয়া আৱ আগুন তাঁদেরকে ল্যাবরেটরিতে টিকতে দেয়নি ।

কোন ঝুঁকি নিল না কিশোর। জনসনদের চোখে পড়তে চায় না আর। দুই সহকারীকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। বাড়ির সামনের দিকটাতে এসে বনের মধ্যে লুকিয়ে রইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির পাশ ঘুরে আসতে দেখল মিস্টার জনসন আর তাঁর সহকারীকে।

সঙ্গীকে সহ গিয়ে গাড়িতে উঠলেন তিনি। যত তাড়াতাড়ি পারলেন গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁর 'মাকড়সা বন্ধুরা' সব ওই বাড়িতেই আটকা 'পড়ল'। আগুনে পুড়ে মরতে লাগল। কেউ আর দেখার নেই ওদের। কেউ নেই বাঁচানোর।

চোখের পলকে পুরো বাড়িটায় আগুন ছড়িয়ে পড়ল। দাউ দাউ করে জুলছে। দূরে যখন দমকল বাহিনীর ঘণ্টা আর পুলিশের সাইরেন শোনা গেল, বাড়িটার একটা জানালাও আর আগুন-মুক্ত নেই।

'আর এখানে থাকার কোন মানে হয় না। ফোস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বলল, 'চলো, বেরোই।'

পুলিশের চোখে পড়লে হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। আপাতত সেটা দেয়ার মত মানসিক কিংবা দৈহিক অবস্থা কোনটাই নেই। গোয়েন্দাদের, বিশেষ করে কিশোর আর রবিনের। সাংঘাতিক ধকল গেছে। কয়েকবার করে মরতে মরতে বেঁচেছে। বাড়ি গিয়ে এখন বিছানায় গা এলিয়ে দেয়াটা ওদের একমাত্র লক্ষ্য।

ঝোপের আড়ালে আড়ালে এসে রাস্তায় উঠল ওরা। বড় রাস্তায় ওঠার পর অনেকক্ষণ চেপে রাখা প্রশ্নটা আর চাপতে না পেরে বলে উঠল রবিন, 'মুসা, তুমি এলে কি করে?'।

মুসা যা বলল, তার সারাংশ-ডাক্তার বুঝে ফেলেছিলেন ওকে সম্মোহিত করা হয়েছে। বাড়ি ফিরেই আগে কিশোরের খৌজ করেছে সে। তাকে বাড়িতে না পেয়ে রবিনের খৌজ করেছে। তাকেও যখন পায়নি, বাড়ি থেকে বেরিয়ে খৌজাখুঁজি শুরু করে সে। জেরি নামে একটা ছেলে জানায়, কিশোর আর রবিনকে বনের দিকে যেতে দেখে সে। রাতের বেলা কোথায় যাচ্ছে দু'জনে সন্দেহ হওয়ায় কিছুদূর পিছে পিছে যায় সে। দুই গোয়েন্দাকে বনের মধ্যে মিস্টার জনসনের বাড়ির দিকে যেতে দেখে। সে আর বনে ঢোকেনি। ফিরে এসেছে। মুসার আর কোন সন্দেহ থাকেনি, কিশোররা মিস্টার জনসনের বাড়িতেই গেছে। মিস্টার জনসনের বাড়িতে এসে গবেষণাগারের জানালা দিয়ে সব দেখে সে। কিশোরদের বিপদে পড়তে দেখে দেরি না করে ঢুকে পড়ে বাড়িতে। নেমে যায় মাটির নিচের ঘরে।

'শেষ মুহূর্তে হাজির হয়ে বাঁচালে আমাদের, মুসা,' মুসার কথা শেষ হলে বলল রবিন। 'ও সময় তুমি না এলে এতক্ষণে মাকড়সার খাবার হয়ে যেতাম আমরা। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

চুপ করে রইল মুসা। নীরবে হাসল।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'যা একখান অ্যাডভেঞ্চার করে এলাম, বিখ্যাত হয়ে যাব আমরা, কি বলো, কিশোর?'

বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ।

'এমনিতেই কি আমরা কম বিখ্যাত?' হেসে জবাব দিল কিশোর।

‘তবু…’

‘ছবি তোলাটা একটা কাজের কাজ হয়েছে,’ রবিনকে থামিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। ‘নইলে কেউ বিশ্বাস করত না আমাদের কথা।’

‘কাল সকালে উঠে আমার প্রথম কাজই হবে ছবিগুলো ডেভেলপ করানো,’ ক্যামেরাটায় চাপড় দিয়ে বলল রবিন। ‘ফিল্মটা এখনই বের করে ফেলি না কেন!?’

কিন্তু ফিল্ম খুলতে গিয়েই আর্তনাদের ঘত একটা অস্কুট শব্দ বেরিয়ে এল রবিনের মুখ থেকে।

‘কি হলো?’ প্রায় একই সঙ্গে জানতে চাইল কিশোর আর মুসা।

‘ক্যামেরায়...ফিল্মই নেই।...ভরতে ভুলে গিয়েছিলাম!’

একেবারে দমে গেল কিশোর। ‘বলো কি! ধূর, গেল সব! কাউকে আর বিশ্বাস করানো গেল না। সবাই বলবে, বানিয়ে বলছি আমরা। বলবে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে।’

হতাশ ভঙ্গিতে পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে হাতে ঠেকল শক্ত একটা জিনিস। মিস্টার জনসনের গবেষণাগারে ওযুধ ভর্তি যে শিশিটার মুখ খুলতে পারেনি সেটা। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, ‘না, না, প্রমাণ আছে।’ টেনে বের করল শিশিটা। দুই সহকারীর দিকে তুলে বলল, ‘প্রাণীদেহকে বড় বানানোর ওযুধ।’

‘ওটা নিয়ে এ ভাবে নাড়াচাড়া করাটা ঠিক হচ্ছে না,’ ভয়ে ভয়ে বলল রবিন। ‘যদি ভেঙে যায়? গায়ে লাগে? মানুষের ওপর কি রকম ক্রিয়া করবে জানি না। দেখা যাবে চোদ্দতলা বিল্ডিংর সমান উঁচু হয়ে গেলে তুমি। দানব হয়ে গেলে! মানুষের সমাজে আর টিকতে পারবে না। ফেলো ফেলো।’

রবিনের কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো কিশোরের কাছে। ‘ঠিক বলেছ! মিস্টার জনসনের ভয়াল গবেষণা নিয়ে আর না ভাবলেও চলবে। তাঁর ল্যাবরেটরি, তাঁর ফরমুলা ধ্বংস করে দিয়েছি, এটাই আসল কথা। দৈত্যাকার মাকড়সা-বাহিনী নিয়ে আর পৃথিবী দখল করতে পারবেন না তিনি। কে আমাদের কথা বিশ্বাস করল না করল, আমাদের হিঁরো ভাবল কিনা, তাতে কি এসে যায়। তা ছাড়া শিশিটা প্রমাণের জন্যে নিয়ে গেলে আবার কার হাতে পড়বে কোন ঠিক নেই। এটা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে যদি আরেকজন মিস্টার জনসন তৈরি হয়ে যায়?’

এখন আর মুখ খোলার তাড়াহড়া নেই। শার্টের কোনার কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে মোচড় দিতে লাগল কিশোর। ঘুরে গেল শিশির মুখ। খুব সাবধানে খুলল যাতে সামান্যতম ওযুধ গায়ে না লাগে। তীব্র ঝাঁজাল গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিল। একটা লেকের পাশ দিয়ে হাঁটছে তখন। শিশির পানি ঢেলে দিল পানিতে। শিশিটা ছুঁড়ে ফেলল একটা ডাস্টবিনে।

*

পরদিন শনিবার। সকালে উঠেই খবরের কাগজে পড়ল ওরা মিস্টার জনসনের বাড়ি পুড়ে যাওয়ার সংবাদ। তাঁর সংস্কর্ক বলা হয়েছে, গাড়ি নিয়ে চলে গেছেন তিনি। রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছেন। পুরো ব্যাপারটাই রহস্যময়-কাগজের মন্তব্য।

সোমবার দিন ওদের আসল টীচার মিস্টার ক্রেগ—যাঁর জায়গায় মিস্টার জনসনকে নেয়া হয়েছিল, তিনি কাজে যোগদান করলেন। স্বাভাবিক বইপত্র হাতে ক্লাসে ঢুকলেন তিনি। মাকড়সা আর কীট-পতঙ্গের কবল থেকে রেহাই পেল কিশোররা। বায়োলজি বই খুলে মাছের চ্যাপ্টারটা পড়াতে শুরু করলেন তিনি।

চুটির পরও ক্লাসে রয়ে গেল কিশোররা তিনজন-কিশোর, রবিন আর মুসা। মিস্টার ক্রেগের রূমে গেল তাঁর সঙ্গে কথা বলতে।

‘আচ্ছা, স্যার, এমন কোন ওষুধ বানানো সম্ভব, যার সাহায্যে মাকড়সা কিংবা কীট-পতঙ্গকে অনেক বড় করে ফেলা যায়?’ কিশোর জিজ্ঞেস করল।

‘এবং মাকড়সাকে কুকুরের সমান বড় করা যায়?’ কিশোরের প্রশ্নের সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন যোগ করল রবিন।

‘উভু, সেটা সম্ভব না,’ মিস্টার ক্রেগ জবাব দিলেন। ‘ওরকম কোন ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত করতে পারেনি কেউ।’

‘কিন্তু যদি কেউ এসে আপনাকে বলে,’ কিশোর বলল, ‘কুকুরের সমান মাকড়সা সে দেখে এসেছে। শুধু দেখেনি, অতবড় মাকড়সার কবলেও পড়েছে, তাহলে আপনি কি বলবেন?’

‘ইমপস্যাবল!’ ভুরু কুচকে তাকালেন মিস্টার ক্রেগ। ‘খুব ভাল করেই জানো তোমরা, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাকড়সাটাও কয়েক ইঞ্চির বেশি বড় হয় না। মিস্টার জনসন তো শুনলাম, কীট-পতঙ্গ আর মাকড়সা ছাড়া অন্য কিছুই পড়াননি তোমাদের। কত বড় হয়, সেটা পড়াননি?’

‘হ্যাঁ, তা পড়িয়েছেন,’ মৃদুস্বরে জবাব দিল কিশোর। ‘মাকড়সার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বানিয়ে ছেড়েছেন আমাদের।’

‘তাহলে আর এ সব প্রশ্ন কেন?’ ভুরু নাচালেন মিস্টার ক্রেগ।

‘না স্যার, এমনি। যাই, স্যার। আপনার সময় নষ্ট করলাম, সরি।’ বলেই দরজার দিকে হাঁটা দিল রবিন। যা বোঝার বুঝে গেছে। সুবিধে হবে না এখানে বিশ্বাস করাতে পারবে না মিস্টার ক্রেগকে।

মিস্টার ক্রেগের ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করাতে পারবে না কাউকে, আগেই জানত।

বাইরে এক জায়গায় জটলা করছে কয়েকটা ছেলে। তাদের মধ্যে শুঁটকি টেরিকে দেখল। তার দোষ্টরাও রয়েছে।

একটা মাকড়সার ঠ্যাং ধরে উঁচু করে রেখেছে টেরি। খিকখিক করে হেসে বলল, ‘কি বিচ্ছিরি! কুৎসিত! শয়তান মাকড়সা, তোকে আমি এখন ভর্তা করব।’

দৌড়ে গেল কিশোর আর রবিন। চিৎকার করে বলল, ‘না না, মেরো না! ওরাও আমাদের মতই প্রাণী। পৃথিবীতে আমাদের যতখানি অধিকার, ওদেরও ততখানি। কেন শুধু শুধু মারছ প্রাণীটাকে?’

ফিরে তাকাল টেরি। তিন গোয়েন্দাকে দেখে হাসিটা বাড়ল তার। টিটকারি দিয়ে বলল, ‘আরে আরে, পুঁচকে শার্লকের দল যে! মিস্টার জনসনের প্রতিনিধি হয়েছে ওনারা।’ টেনে টেনে বলল, ‘এখনই হ্যাতো বলে বসবেন-না, মাকড়সা

মেরো না, ওরা আমাদের বন্ধু, ওদের মতই মাছি খাব আমরা...হি-হি-হি!' বলে একটা মুহূর্তও আর দেরি না করে মাকড়সাটাকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভর্তা করে ফেলল সে।

প্রচণ্ড ক্ষিণ্ঠ হয়ে তাকে কিলানোর জন্যে শাটের হাতা গোটাতে শুরু করল মুসা। কিশোর আর রবিন ঠেকাল। ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে সরে এল সেখান থেকে। ওই মুহূর্তেই সিঙ্কান্ত নিল ওরা, ক্ষুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কীট-পতঙ্গকে বাঁচানোর একটা সংগঠন তৈরি করবে। শুঁটকি টেরির মত নিষ্ঠুর মানুষদের বাধা দেয়াটা জরুরী।

আরও দিন পনেরো পরের কথা। মিস্টার জনসনের মাকড়সা-বাহিনীর আতঙ্ক মুছে গেছে ওদের মন থেকে। যত সাংঘাতিক ঘটনাই ঘটুক, দিন গেলে সব কিছুই আপসা হয়ে আসে, এটাই পৃথিবীর নিয়ম।

এক ছুটির দিনে মুসা প্রস্তাব দিল, 'চলো, লেকে মাছ ধরতে যাই।'

রাজি হয়ে গেল কিশোর আর রবিন। মাছ ধরতে গেল সেই লেকটায়, যেটাতে ওষুধ ফেলেছিল। দশ কেজি ওজনের একটা পুঁটি মাছ ধরল মুসা।

পরম্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। চোখে অঙ্গুত দৃষ্টি। তবে অবাক হয়নি। জানে, কি ভাবে বিশাল আকৃতি পেয়েছে ওই পুঁটি মাছ।

মানুষখেকোর দেশে

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

ভাল লাগল না দৃশ্যটা তিন গোয়েন্দার।

‘পৃথিবীর সবচেয়ে বন্য দ্বীপ’-দ্বীপটা সম্পর্কে এটা হলো অভিযাত্রীদের মন্তব্য। বিশাল নিউগিনি, মানচিত্রের দ্বিতীয় বহুতম দ্বীপ। অ্যারাফুরা সাগরের বুকে যেন দানবীয় এক ব্যাঙের মত পিঠ উঁচিয়ে রেখেছে। কালো। কুৎসিত। ঝোড়ো মেঘের নিচে যেন বিম ধরে রয়েছে।

আঁচিলে বোঝাই ব্যাঙের পিঠ। দুই থেকে তিন মাইল উচু একেকটা আঁচিল। শত শত রয়েছে ওরকম। পৃথিবীতে নিউগিনিই একমাত্র দ্বীপ, যেটাতে এত পাহাড়-পর্বত রয়েছে।

ওসব পাহাড়ের কোলে কোলে মানুষের বাস। সেই আদিম অসভ্যতা রয়ে গেছে এখনও। ইদানীং একটু একটু করে জানতে আরম্ভ করেছে, ওদের উপত্যকার বাইরেও আরেকটা জগৎ রয়েছে। সেই জগতে যাওয়ার কোন উপায় তাদের নেই। বেশির ভাগ অঞ্চলেই পথঘাট নেই। বাইরে থেকে কারও প্রবেশ করাটা ভীষণ কঠিন। কোন কোন উপত্যকায় বিমানের সাহায্যে নামা যায় অবশ্য। সে-সব জায়গা ছাড়া আরও যে সব উপত্যকা রয়েছে, সেগুলোর অধিবাসীরা কখনও শ্বেতাঙ্গ মানুষ দেখেনি, দেখেনি কোন বিদেশীকে। আকাশ থেকে প্যারাসুটে করে কোন শ্বেতাঙ্গ নামলে তার কাপড়-চোপড় খুলে দেখে ওরা, সত্যিই লোকটার চামড়া অন্য রকম কিনা। বিশ্বাস করতে পারে না।

কেঁপে উঠল মুসা। ঠাণ্ডায় নয়। হাড়কাঁপানো কনকনে বাতাস দামাল বেগে বয়ে যাচ্ছে স্কুনার জাতের জাহাজ ‘সাইক্লোন’-এর ডেকের ওপর দিয়ে। ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরে তাকাল সে। অনেক নোনা হাওয়ার ঝাপটা লেগেছে বৃদ্ধ রবাট বাউয়েনের চামড়ায়, সেটা তার মুখ দেখেই অনুমান করা যায়। পঞ্চাশ বছর ধরে এদিকের সাগরে তাঁর যাত্যাত।

‘ওই লোকগুলো,’ মুসা জিজ্ঞেস কলল। ‘নিশ্চয় নরখাদক নয়? কি বলেন? শুধুই গল্প, না?’

‘কোন লোকের কথা বলছ, তার ওপর নির্ভর করে,’ জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। ‘নিউগিনির পুরের অংশ অস্ট্রেলিয়ান সরকারের অধীনে। কড়া শাসন। প্রায় সাফ করে দিয়েছে নরখাদকদের। মানুষ হয়ে মানুষ খাওয়া বন্ধ। কিন্তু পশ্চিম অংশ, যেটা দেখছ এখন, ওটা হাজার বছর আগে যা ছিল, এখনও ঠিক তা-ই রয়েছে। প্রায়ই লড়াই বাধে গোত্রে গোত্রে, এক উপত্যকার লোক আরেক উপত্যকার শক্র। লড়াইয়ে পরাজিত বন্দিদের ধরে খেয়ে ফেলাই রেওয়াজ। কি হলো, ভয় পেলে? না না, ভয়ের কিছু নেই। তোমাকে কিছু করবে না ওরা। মেহামানদের কিছু করে না।’

‘তবে কি পছন্দ করে বলতে চান?’ আশা হলো মুসার।

‘না। তা-ও করে না। বিদেশীদের বরং অপছন্দই করে ওরা। বাইরের কেউ এসে ওদের টামবারানে নাক গলানোটাকে খারাপ চোখেই দেখে বরং।’

‘টামবারান কি?’

‘মৃতের ঘর। লাশের ঘর বললে ঠিক হয়। এক ধরনের সমাধি মন্দির। ভূতের বাসা বলে ওরা। তাকে তাকে মড়ার খুলি সাজানো। ওদের বিশ্বাস প্রতিটি মড়ার মাথায় একটা করে ভূত বাস করে। নানা ধরনের ভূত আছে। একেক ভূতের একেক কাজ। বিদেশী কিংবা অচেনা লোকের ভূত সাংঘাতিক খারাপ। নানা রকম ঝামেলা পাকিয়ে অঙ্গুর করে মারে। কাজেই ওরকম ভূত কাছেপিঠে না থাকলে ওরা খুশি।’

‘তারমানে বিদেশীদের মারে না?’

‘সহজে না। তবে বলা যায় না কিছু। রেগে গেলে তোমার মুণ্ডটা ঠিকই কেটে ফেলবে, কিন্তু টামবারানে রাখার সম্মানটুকু দেখাবে না।’

‘সম্মান না কচু। ওখানে ঢোকার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।’

বন্য উপকূল আর খাড়া হয়ে থাকা কালো পর্বতের দিকে তাকাল আবার মুসা। দেখেই মনে হয় ভয়ঙ্কর বিপদ যেন ঘাপটি মেরে রয়েছে ওখানটায়। এড়ানোর একটাই উপায়। ওই দ্বীপে না যাওয়া।

‘তীরে না নামলেও তো পারি! কিশোর আর রবিনের দিকে তাকাল মুসা। ‘যা যা ধরার পানিতে থেকেই ধরতে পারি। এই যেমন ধরো কুমির, ওগুলো তো আর ডাঙায় যায় না। আরও অনেক জীব আছে পানিতে, ভাল দামে বিকোবে। অথথা নরখাদকদের মাঝে যাই কেন?’

কিশোর হাসল। ‘মুখেই বলছো। আসলে অতটা ভীতু তুমি নও। আর ভুলে যাচ্ছ, শুধু পানির প্রাণীই ধরলে চলবে না। ডাঙার জীব ধরারও অর্ডার নিয়ে এসেছি আমরা। সব ধরতে না পারলে লাভ তো দূরের কথা, এই অভিযানের খরচই উঠবে না।’

‘কি কি যেন ধরতে হবে আমাদের?’ জিজ্ঞেস করল মুসা। ‘অর্ডারটা আরেকবার পড় তো।’

পকেট থেকে কাগজ বের করল কিশোর। পড়ল, ‘কুমির, কমোডো ড্রাগন, বার্ড অভ প্যারাডাইজ, কেঙ্গারি, ক্যাঙ্গারু, ব্যান্ডিকুট, কাসকাস, ফ্লাইং ফ্রন্ট, ফ্যালাঞ্জার, দানবীয় বিচ্ছু, ডাইনোসর গিরগিটি, ডেথ অ্যাডারস, টাইপান, কোয়ালা ভালুক,’ হেসে কাগজটা পকেটে ভরল সে। ‘আর অবশ্যই নরখাদকদের খুলি। মিউজিয়মের জন্যে।’ মুসার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘এখন আমাকে বলো, ডাঙায় না নেমে এসব কি করে পাব? এর কটা জিনিস আছে পানিতে?’

হাসল মুসা। কিশোর ঠিকই বলেছে, অতটা ভীতু সে নয়। যতটা দেখাচ্ছে। ভূতের ভয় ছাড়া আর প্রায় কোন কিছুকেই তেমন ভয় পায় না সে। আরও একটা কথা, নিউ গিনিতে জন্ম-জানোয়ার ধরতে আসার উৎসাহটা তারই বেশ ছিল।

সিডনিতে এসে একটা স্কুনার ভাড়া করেছে তিন গোয়েন্দা, ওটার ক্যাপ্টেনকে সহ। যেমন চমৎকার জাহাজ ‘সাইক্লোন’, তেমনি তার ক্যাপ্টেন রবার্ট

বাউয়েন। পাল শুব ভাল জাহাজটার। সতেরো নট গতিতে ছুটতে পারে, ইঞ্জিন
বাদ দিয়েই। অবশ্যই যদি বাতাস ভাল থাকে।

চতুর্দিক থেকে আসছে টেউ। ভীষণ দুলছে জাহাজ। কালো আকাশ ঝড়ের
অঙ্গ সঙ্গে জানাচ্ছে।

‘বনাম আছে এ সব সাগরের,’ ক্যাপ্টেন জানালেন। ‘ওই বড় বড়
পর্বতগুলো বাতাসকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। বাড়ি খেয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে
বাতাস। ঝালটা মেটায় গিয়ে সাগরের ওপর। এখানেই মাইকেল মারা গিয়েছিল।’

‘মাইকেল কে?’ জানতে চাইল মুসা।

‘মাইকেল রকফেলার। নিউ ইয়র্কের এক সময়ের গভর্নর নেলসন
রকফেলারের ছেলে।’

‘কি হয়েছিল তার?’

‘সে আর তার বন্ধুরা একটা ক্যাটামারান জাহাজ নিয়ে বেরিয়েছিল। বড়
এল। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। গেল জাহাজটা উল্টে। সারা রাত জাহাজের কাঠটাঠ
আঁকড়ে ভেসে থাকল ওরা। ভাবল পরদিন কোন জাহাজ ওদেরকে উদ্ধার করবে।
কিন্তু কেউ এল না বাঁচাতে। শেষে মাইকেল ঠিক করল, ভাঙ্গা জাহাজ আঁকড়ে
ভেসে থাক তার বন্ধুরা, সে দশ মাইল সাঁতরে তীরে গিয়ে সাহায্য নিয়ে
আসবে।

‘একটা জাহাজ বন্ধুদেরকে ঠিকই উদ্ধার করল। কিন্তু মাইকেলকে আর খুঁজে
পাওয়া গেল না। অনেক কারণ থাকতে পারে। দশ মাইল সাঁতরে যাওয়ার
ক্ষমতাই হয়তো হয়নি তার। হাঙ্গর কিংবা কুমিরে খেয়ে ফেলতে পারে। অথবা
তীরে হয়তো সত্যই উঠেছিল, আর উঠেই পড়েছিল নরখাদকদের হাতে।’

‘থবর পেয়ে উড়ে এলেন তার বাবা। অনেক খোঁজখবর করলেন। পাওয়া
গেল না মাইকেলকে। আদিবাসীরা জানাল তারা কিছুই জানে না। মিথ্যে কথা
বলে থাকতে পারে, কে জানে।’

গল্পটা শুনে মন আরও খারাপ হয়ে গেল মুসার। তীরে নামার ইচ্ছে আরও
কমে গেল।

বড় বাড়ছে। সেই সাথে টেউ। পাল নামিয়ে ফেলতে হলো। অঙ্গুলারি
ইঞ্জিন কিছুক্ষণ যুবল টেউয়ের বিরুদ্ধে, তারপর আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল
প্রপেলারের চাপে। অসহায় হয়ে গেল সাইক্লোন। টেউ তাকে ঠেলে নিয়ে চলল
পাথুরে উপকূলের দিকে। ওই পাথরে বাড়ি খেলে চুরমার হয়ে যাবে জাহাজ।
অভিযানের এখানেই ইতি।

তবে পোড় খাওয়া ক্যাপ্টেন এই এলাকার মানচিত্র ভাল করেই জানেন।
বললেন, ‘আইল্যান্ডেন নদীটা বেরিয়ে সাগরে পড়েছে। ওটাতে চুকতে পারলে
বাঁচা যায়। অ্যাহি, এসো, আমাকে সাহায্য করো।’ হইল ধরেছেন তিনি। ধরে
রাখতে পারছেন না। হালের গায়ে প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে টেউ। পাগলা ঘোড়ার মত
খেপে গেছে যেন সাইক্লোন।

তিনি গোয়েন্দা আর ক্যাপ্টেন, এই চার জনে মিলে চেষ্টা করে কোনমতে
জাহাজটাকে নদীর মুখের কাছে নিয়ে আসতে পারল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে

পারল না। কিছু পাল ছিড়েছে। ইঞ্জিন বন্ধ। হাল কাজ করছে না। চোরা পাথরে ঘষা খেয়ে এখন তলাটা ভেঙে গেলেই মোলোকলা পূর্ণ হবে।

ধূঁকতে ধূঁকতে নিজের ইচ্ছেমত ভেসে চলেছে জাহাজ। নদীর তীরে একটা গ্রাম দেখা গেল। অনেকগুলো কুঁড়ে রয়েছে। সব চেয়ে বড় ঘরটা টামবারান, ক্যাপ্টেন বললেন ওটার চেহারা দেখেই। বাড়িটাকে কেমন ভূতুড়ে লাগল মুসার। গায়ে কঁটা দিল। চেউ আর স্রোত ওই গাঁয়ের, দিকেই ঢেলে নিয়ে চলল জাহাজটাকে।

দুই

চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাল গাঁয়ের মহিলা আর বাচ্চারা। লুকিয়ে পড়ল। দ্রিম দ্রিম করে বেজে উঠল কাঠের বিশাল ঢাক। কুঁড়ে থেকে ছুটে বেরিয়ে এল পুরুষ যোদ্ধারা, হাতে বল্লম, পাথরের কুড়াল, তীর আর ধনুক।

ওদের যুদ্ধ-চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল চারপাশের পর্বতে।

ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ মেরুদণ্ড বেঁয়ে নেমে গেল রবিনের, মনে করল নরখাদক। মুসা আর কিশোরও কম ভয় পায়নি। এ রকম আর কখনও দেখেনি ওরা। মানুষের খুলি দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরেছে কেউ কেউ। সবার মাথায়ই বার্ড অভ প্যারাডাইজ পাখির পালক গৌঁজা। শরীরে আঁকা সাপ, কুমির কিংবা শতপদীর ছবি। পরনে কাপড় বলতে কিছু নেই। কেবল ঘাসের তৈরি এক ধরনের মাদুর দিয়ে লজ্জা ঢেকেছে। রং করা মুখগুলো ভয়ঙ্কর। নাক ছিন্দ করে ঢুকিয়ে রেখেছে দাঁতাল শুয়োরের দাঁত। জন্মের মত দেখতে লাগছে মানুষগুলোকে।

কাত হয়ে নূদীর কিনারে চরায় আটকে আছে জাহাজটা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনি অভিযানী। তিনি গোয়েন্দা বুঝতে পারছে না কি করবে। তবে বাউয়েন পারছেন। তিনি জানেন, ভয় পেয়েছেন এটা বুঝতে দেয়া চলবে না ওদের। তাহলে খুন হয়ে যেতে হবে।

হাত তুলে চিৎকার করে বললেন তিনি, ‘থামো!'

নিজেদের ভাষায় কথা শনে থেমে দাড়াল আদিবাসীরা। চেঁচামেচি থামিয়ে দিল।

তবে বন্ধুত্ব করার কোন ইচ্ছে দেখাল না। অস্ত্র হাতে তাকিয়ে রয়েছে আজব মানুষগুলোর দিকে। এর আগে জাহাজ দেখেনি। ভাবল, সাগর থেকে উঠে আসা ভয়াবহ কোন দানব হতে পারে ওটা।

‘আমাদের মত মানুষ বোধহয় দেখেনি আর,’ নিচু গলায় বলল কিশোর।

‘হতে পারে,’ বাউয়েন বললেন। ‘পর্বত থেকে শত শত নদী নেমে গেছে সাগরে। বেশির ভাগ নদীর পাড়েই এখনও সভ্য মানুষের পা পড়েনি।’

‘এখানে আপনি আসেননি আর?’

‘না। বড়ে ঠেলে না আনলে আসতামও না। লোকগুলো কেমন বুঝতে পারছি না। দেখি, কথা বলে।’

স্থানীয় ভাষায় কথা বললেন তিনি। শান্ত হলো না লোকগুলো। রাগত জবাব দিল। এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। জাহাজ থেকে নেমে পড়ল অভিযাত্রীরা। লোকগুলো কাছে এসে ওদেরকে ঘিরে দাঁড়াল।

একজন একটানে রবিনের শার্ট ছিঁড়ে দিল। বিশ্বিউ চি�ৎকার উঠল ওদের মাঝে। ওদের চামড়ার তুলনায় রবিনের চামড়া ধৰ্বধবে সাদা। বাউয়েন সাদা। কিশোরও জংলীদের তুলনায় সাদা। চামড়ার রঙই অবাক করেছে আদিবাসীদের। কালো বলে মুসার দিকে বিশেষ নজর দিল না ওরা। তবে ওর পোশাক-আশাক পছন্দ হলো না ওদের। যেন বুঝতে পারছে না ওদেরই মত কালো এই ছেলেটা সাদাদের পোশাক পরে আছে কেন।

সাদা চামড়া দেখে একটু যেন ঘাবড়ে গেল ওরা। পিছিয়ে শৈল।

‘কুসংস্কারে ভরা ওদের মন,’ বাউয়েন বললেন। ‘ওরা ভাবছে, আমরা হয় দেবতা, নয়তো শয়তান। কিংবা ওরা। ওরাদেরকে যমের মত ভয় করে ওরা।’

‘ভাল! পেয়ে গেছি পথ,’ তুড়ি বাজাল কিশোর। ‘ওরাই সাজব আমরা। একআধুট ম্যাজিক দেখিয়ে ওদেরকে কাবু করা যেতে পারে।’

শন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন বাউয়েন। ‘কি ম্যাজিক দেখাবে? জানো নাকি কিছু?’

‘না। শুরুটা আপনাকে দিয়েই হবে। আপনার সব অলগা দাঁত। ওদেরকে দেখান, কি করে দাঁত খুলে নিয়ে আবার পরতে পারেন আপনি।’

মুচকি হাসলেন বাউয়েন। জংলীদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘শোনো, তোমাদের ওরাকে ডেকে আনো। আমি যে কি করতে পারি দেখাব সবাইকে।’

টামবারানের দিকে ছুটে গেল কয়েকজন লোক। দরজা খুলল। ভেতরটা আবছা অঙ্ককার, দেখতে পেল অভিযাত্রীরা। অসংখ্য তাক বোৰাই মানুষের মাথার খুলি। বেরিয়ে এল একজন বিশালদেহী মানুষ। ওর গায়ে অলঙ্কার আর ছবির পরিমাণ সকলের চেয়ে বেশি।

দাস্তিক ভঙ্গিতে এগিয়ে এল সে। দু’পাশে সরে জায়গা করে দিতে লাগল লোকেরা। সবার চোখেই শুন্দা মেশানো ভয়। রঞ্জ-লাল রঙে আঁকা তার মুখ। ঘন ভুরুর নিচে চোখজোড়া যেন জুলছে। বাউয়েনের মুখেমুখি এসে দাঁড়াল।

যেন দেখেই ছিনে ফেলেছেন ক্যাপ্টেন, এমন ভঙ্গি করে আদিবাসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘খারাপ ওরা ও আছে, ভাল ওরা ও আছে। এই লোকটা খারাপ। ওকে বলো তো, ওর জাদু দেখাক। দেখি দাঁত খুলে নিয়ে আবার লাগাতে পারে কি না।’

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ওরা। অনেক জাদু সে দেখাতে পারে, কিন্তু দাঁত খুলে নিয়ে পরতে পারে কেউ এটা জন্মেও শোনেনি। বলল, ‘কেউ পারবে না।’

ওরা যা যা বলছে, ওদের সঙ্গে যা বলছেন, সব তিন গোয়েন্দাকে অনুবাদ করে শোনাচ্ছেন ক্যাপ্টেন।

‘আমি পারব।’ শান্ত ভঙ্গিতে মুখের ভেতর হাত দিয়ে এক পাটি দাঁত খুলে

আনলেন তিনি।

ভীষণ অবাক হলেও সেটা না দেখানোর ভান করল ওবা। কিন্তু আদিবাসীরা জোর গুঞ্জন করে উঠল। এমন কাণ্ড জীবনে দেখেনি ওরা। পাটিটা হাতে নিল একজন। হাত থেকে হাতে ঘুরতে থাকল। ভয় পেয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। ফেরত যদি না দেয়। তাহলে থেতেই পারবেন না।

তবে দিল ওরা। শেষ লোকটাও দেখার পর ফিরিয়ে দিল। নকী থেকে গিয়ে ভালমত ধুয়ে আবার পাটিটা পরে নিলেন তিনি। কিশোরকে বললেন, ‘এবার তোমার পালা।’

কিশোরের আলগা দাঁত নেই। তাকে অন্য কিছু করতে হবে। বলল, ‘ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আগুন জুলাতে পারে কিনা।’

চিন্কার করে জানাল ওরা, পারে।

‘কত তাড়াতাড়ি পারে?’

‘অনেক তাড়াতাড়ি। এমনকি তোমার চেয়েও।’

‘বেশ, দেখাতে বলুন।’

ওবাৰ-আদেশে দৌড়ে গিয়ে কয়েকজনে একটা বাঁশের টুকরো, কিছু শুকনো ঘাস-পাতা আৱ একটা শুকনো কাঠি নিয়ে এল। এ সব দিয়ে কি করে আগুন ধৰাতে হয় জানা আছে কিশোরের। স্কাউটিং শিখেছে। বাঁশের টুকরোৰ এক জায়গায় ছোট একটা ছিদ্র করে তাৱ ওপৰ শুকনো ঘাসপাতা ছড়িয়ে দিতে হৱ। তাৱপৰ কাঠিৰ চোখা মাথাটা সেই ছিদ্রে বসিয়ে দুই তালু দিয়ে চেপে ধৰে জোৱে জোৱে ডলতে হয়, মত্তন করে দই থেকে মাখন বেৱ কৰা হয় যে ভাৱে সে-ভাৱে। তাতে গায়েৰ জোৱ এবং ক্ষিপ্তা দুইই দৱকাৱ। ডলতে শুৱ কৱল ওবা। মিনিট খানেক পৱেই ধোঁয়া দেখা গেল শুকনো পাতায়, আৱেকেটু পৱে জুলে উঠল।

ব্যঙ্গেৰ হাসি হাসল কিশোৱ। ‘এত দেৱি? আমি এক খোঁচা দিয়েই পারি।’ বলে পকেট থেকে দিয়াশলাই বেৱ কৱল। খস্ কৱে একটা কাঠি জুলে দেখাল।

তাজ্জব হয়ে গেল গায়েৰ লোক। হল্লোড় কৱে উঠল। কিশোৱেৰ হাত থেকে বাঞ্ছটা নিয়ে একজন একটা কাঠি জুলল। দেখাদেখি আৱেকজন জুলল আৱেকটা। তাৱপৰ আৱেকজন। তাড়াতাড়ি কায়দা কৱে বাঞ্ছটা নিয়ে নিল কিশোৱ। নইলে সব কাঠি জুলে শেষ কৱে ফেলবে জংলীগুলো।

কিশোৱকেও অনেক বড় ওবা বলে মেনে নিল ওরা। তাৱপৰ মুসা আৱ রুবিনেৰ দিকে তাকাতে লাগল। কি ভেবে বাদ দিল রুবিনকে। মুসার দিকে নজৰ দিল। বোধহয় কালো হয়ে সাদাদেৱ পোশাক কেন পৱেছে সেই আক্রোশেই তাকে ধৱল ওবা। কিংবা কালো বলে হয়তো কিশোৱে চেয়েও শক্তিশালী ওবা ভাৱল। কাৰণ ওদেৱ দেশেৱ সমস্ত ওবা তো কালোই। তাৱ দিকে আগুল তুলল।

কিশোৱকে জিজ্ঞেস কৱল মুসা, ‘ছোট আঘনাটা হলে কেমন হয়?’

‘কি কৱবে?’

বাউয়েনকে বলল মুসা, ‘ওদেৱকে জিজ্ঞেস করুন, নিজেৱ শুখ দেখতে পারে

কিনা কোন কিছুতে।

জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন। সবাই মাথা নাড়ল, ওঝা বাদে। সে বলল, পারবে। টামবারান থেকে গিয়ে একটা বিশেষ পাত্র আনতে আদেশ দিল একজনকে। দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল লোকটা। আন্ত এক টুকরো চকমকি পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে পাত্রটা। তার মধ্যে পানি ভরল ওঝা। মানুষের চেহারা দেখার আদিম পদ্ধতি। হয়তো দশ হাজার বছর আগে পাথরের মুগে তৈরি করেছিল মানুষ এই জিনিস। এই আদিবাসীদের মধ্যে আজও রয়ে গেছে এই ব্যবস্থা। তাতে চেহারা দেখা যায় বটে, কিন্তু অস্পষ্ট। তার ওপর পানি কাঁপতে থাকলে নাক-চোখ-মুখ আলাদা করে বোঝা যায় না। পাত্রটা মুসার দিকে ঠেলে দিল ওঝা।

দেখে মুখ বাঁকাল মুসা। নিজের ছোট আয়নাটা বের করে দিল ওঝার হাতে। এই বার আর শত চেষ্টা করেও বিশ্বয় চাপা দিতে পারল না লোকটা। হেরে গেল বলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কৃৎসিত চেহারা।

আয়নাটা নিয়ে দেখল আরেকজন। চমকে গেল। কল্পনাই করতে পারেনি কোনওদিন তার নিজের চেহারা এতটা কৃৎসিত। তাড়াতাড়ি ওটা দিয়ে দিল পাশের জনের হাতে। এ ভাবে হাত বদল হতে হতে আবার মুসার হাতে ফিরে এল আয়না। সবাই তাকে মেনে নিল অনেক বড় ওঝা বলে। নিজের চেহারা নিজেকে দেখাতে পারে এত বড় ওঝা আর ক'জন আছে।

রবিনকে দেখিয়ে বাউয়েন জিজ্ঞেস করল, ‘ওর ক্ষমতা দেখানো লাগবে?’

সবাই মাথা নেড়ে জানাল, আর দরকার নেই। চারজনের মধ্যে তিনজনই যখন মন্ত বড় বড় ওঝা, চতুর্থজন তো হবেই।

বাইরের জগৎ থেকে আসা চারজন জাদুকরকে সম্মানিত মেহমান করে নিল আদিবাসীরা। ডেকে আনা হলো মেয়েদের। শুয়ে পড়ার আদেশ দেয়া হলো। পাশাপাশি গা ঘেঁষে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেয়েরা। মানুষের দেহের একটা জীবন্ত রাস্তা চলে গেল একেবারে টামবারানের দরজা পর্যন্ত। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে মেহমানদেরকে এগোতে অনুরোধ করল আদিবাসীরা।

‘কি বলে?’ ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘ওদের গাঁয়ে স্বাগত জ্ঞানাচ্ছে। এটাই ওদের নিয়ম। মহিলাদের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে আমাদের।’

‘বলে কি?’ প্রতিবাদের সুরে বলল মুসা, ‘মেয়েদেরকে মানুষ মনে করে না নাকি?’

‘মনে তো হয় না।’

রবিন বলল, ‘ওদের বলুন আমরা এ কাজ করতে পারব না।’

‘মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে সেটা। ওরা অপমানিত বোধ করবে। ধরো, তোমার বাড়িতে কেউ বেড়াতে এল, তুমি হাত বাড়িয়ে দিলে। হাত মেলাতে অস্বীকার করল সে। কেমন লাগবে তোমার?’

‘তাহলে আপনি আগে যান।’

‘উপায় নেই। বাঁচতে হলে যেতেই হবে।’ জুতো খুলে হাতে নিলেন

বাউয়েন। দ্বিধা করলেন। তারপর উঠে পড়লেন প্রথম মেয়েটার পিঠে। ভাবি
শরীর তাঁর। একটা গোঁজানি শোনা গেল। যতটা সম্ভব হালকা পায়ে হাঁটার চেষ্টা
করলেন তিনি। কিন্তু দেহের পুরোভর ছেড়ে না দিয়ে কি আর হাঁটা সম্ভব। দ্বিতীয়
মেয়েটাও ব্যথায় ককিয়ে উঠল। তবে নড়ল না।

কিশোরকে বলল মুসা, ‘এবার তোমার সম্মানিত হবার পালা।’

‘আমি কেন? তুমি যাও। তোমাকে তো বড় ওঝা ভাবছে ওরা।’

‘পারব না। তুমি আগে যাও।’

আগে হোক পরে হোক যেতেই হবে। অথবা তর্ক করল না কিশোর। জুতো
খুলে নিয়ে পা রাখল প্রথম মেয়েটার পিঠে। প্রচণ্ড খারাপ লাগছে তার।

তারপর এল মুসার পালা। সবশেষে রবিন। সে সবার চেয়ে হালকা। তার
ভাবে গোঁজাল না কোন মহিলা। ককাল না। ওদেরকে আরও কম কষ্ট দিয়ে দ্রুত
পার হয়ে যাওয়ার জন্যে প্রায় দৌড়ে এগোল সে।

তিনি

টামবারানের দরজায় পাহারা দিচ্ছে একজন প্রহরী। সসম্মানে সরে গিয়ে
মেহমানদের ঢোকার জায়গা করে দিল। ঘরে জানালা নেই। খড়ের চালাটা ঢালু
হয়ে নেমে এসে মাটি ছাঁই ছাঁই করছে। ভালমত দেখার জন্যে টর্চ জুলল কিশোর।

কাঠের তৈরি অসংখ্য মূর্তি ঘরে। লাল আর হলুদ রঙ করা। মুখগুলো
ভয়ঙ্কর। কোনটার দাঁত বেরিয়ে আছে, কোনটার রয়েছে জানোয়ারের মত শিং,
আবার কোন কোনটার বিরাট বিরাট চোখ, বিকট লাগে দেখতে।

‘শয়তানের মত করে দেবতা তৈরি করে এরা,’ বুঝিয়ে দিলেন বাউয়েন।
‘ওদের বিশ্বাস, শয়তান হলো মহাশক্তিধর। এ রকম করে তৈরি করার আরেকটা
কারণ আছে। ওঝা চায়, এ রকম বিকট চেহারা দেখে ভয় পাক লোকে। তাকে
মান্য করুক।’

তবে দেখার মত জিনিস হলো তাকে সাজানো খুলিগুলো। লাল, নীল, হলুদ
কিংবা বেগুনী রঙে রঙ করা হয়েছে।

‘শক্র খুলি,’ ক্যাপ্টেন বললেন। ‘যাদেরকে ওরা খুন করেছে।’

কেঁপে উঠল মুসা। ‘জায়গাটা ভাল না! কেমন জানি লাগে।’

‘লাগবেই। ইচ্ছে করেই এই পরিবেশ তৈরি করেছে ওঝা, মানুষকে ভয়
দেখাতে।’

গ্রামবাসীরাও ঢুকল টামবারানে। এক কোণে বড় একটা কাঠের পিপে রাখা
হয়েছে। তার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে ওঝা, যাতে সবাই তাকে দেখতে পারে। সূর্য
ডুবে গেছে। মশাল জ্বলে দেয়া হয়েছে। মশালের কাঁপা আলো, ধোঁয়া, আর
অন্যান্য জিনিস মিলে গা ছুমছমে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ঘরের ভেতরে।

বক্তৃতা দিচ্ছে ওৰা।

বাউয়েন জানালেন ছেলেদের, ‘গায়ের লোককে বোঝানোর চেষ্টা করছে সে, তার মত বড় ওৰা আৱ নেই। অনেক ক্ষমতাশালী সে। মনে কৱিয়ে দিতে চাইছে কাৰও গায়ে একটা আঙুলও না ছুইয়ে কি ভাবে ওদেৱ মেৰে ফেলেছে। সে শুধু ওদেৱকে বলেছে: তুমি মৱবে। কিছু দিন পৱেই মৱে গেছে ওৰা।’

‘সত্যি?’ বিশ্বাস কৱতে পারছে না মুসা। ‘ওৰা সে-কথা বিশ্বাস কৱে?’

‘কৱবে না কেন? নিজেৱ চোখে দেখেছে তো।’

‘তা কি কৱে সম্ভব?’

‘খুব সম্ভব। আসলে ওদেৱ স্নায়ুৰ বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল ও। আতঙ্কিত কৱে দিয়েছিল। অসুখেৱ সময় ডাঙুৱেৱ কাছে গেলে আমাদেৱ কি হয়? যদি ডাঙুৱ বলেন, কিছু না, ভাল হয়ে যাবেন। মনে হয় না সত্যি ভাল হয়ে যাচ্ছিঃ? আৱ ডাঙুৱ যদি বলেন, আপনি শেষ। আৱ তিন হণ্টা টিকবেন কিনা সন্দেহ। রোগীৱ মনে মৃত্যুভয় চুকে যাবে তখন। বাঁচাৱ আশা ছেড়ে দিয়ে খাওয়া-দাওয়াই হয়তো বন্ধ কৱে দেবে। সত্য জগতেই যখন এই অবস্থা, এখানে জংলীদেৱ তো আৱও বেশি আতঙ্কিত হওয়াৰ কথা। ফলে কেউ অসুস্থতায় মৱে, আৱ কেউ মৱে আতঙ্কিত হয়ে, হাল ছেড়ে দিয়ে।’

‘হঁ, যুক্তি আছে আপনাৰ কথায়,’ মুসা মেনে নিল। ‘এখন কি বলছে?’

‘বলছে আমাদেৱ চেয়ে সে বড় জাদুকৱ। প্ৰমাণ কৱে দিতে পারবে।’

চার অভিযাত্ৰীৱ দিকে ফিৱল ওৰা। গম্ভীৱ কঢ়ে যা বলল-অনুবাদ কৱে তিন গোয়েন্দাকে শোনালেন বাউয়েন, ‘যা বলি মন দিয়ে শোনো। শয়তানেৱ সমস্ত শক্তিকে ডেকেছি আমি। তোমাদেৱকে অভিশাপ দিচ্ছি। আজ রাতে টামবাৱানে ঘুমাবে তোমৰা। ঘৰেৱ সমস্ত প্ৰেতাত্মা কুনজৱ দেবে তোমাদেৱ ওপৱ, তোমাদেৱ মৃত্যু কামনা কৱবে। মধ্য রাতে মাৰা যাবে তোমৰা। আমি ঘোষণা দিলাম।’

চারজুনকে মৃতেৱ ঘৰে রেখে বাইৱে থেকে তালা আটকে দিল প্ৰহৱী।

মশালগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টৰ্চ জুলল কিশোৱ। টৰ্চেৱ আলোয় আৱও কিম্বত লাগল মূর্তিগুলোকে। কুৎসিত, নিষ্ঠুৱ, শয়তানীতে ভৱা চেহাৱা।

‘আমৰা বোধহয় মৱেই গেছিঃ না?’ মুসা বলল।

‘মন শক্ত রাখো,’ পৱামৰ্শ দিলেন ক্যাপ্টেন। ‘কিছু হবে না। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।’

শোবাৱ কোন ব্যবস্থা চোখে পড়ল না। বিছানা-টিছানা কিছুই নেই।

‘ঠিক আছে,’ হাত ওল্টালেন বাউয়েন। ‘মেঝেতেই শোব। বালিশেৱ ব্যবস্থা যদি কৱা যেত।’ কিশোৱেৱ টৰ্চ জুলে রেখেছে। বালিশ বানানো যায় এমন কিছু খুঁজতে লাগলেন তিনি। নিদেনপক্ষে এক টুকৱো কাঠ হলেও চলে। কিছুই চোখে পড়ল না। শেষে দৃষ্টি স্থিৱ হলো খুলিৱ ওপৱ।

‘ওতেই চলবে,’ বললেন তিনি। বড় দেখে চারটো খুলি নামিয়ে এনে তিনটো দিলেন ছেলেদেৱকে, একটা নিলেন নিজে।

চিত হয়ে শুয়ে শক্ত হাড়েৱ ওপৱ মাথা রাখাৱ চেষ্টা কৱতে লাগল চার জনে। হচ্ছে না। গড়িয়ে পড়ে যায় মাথা। মুসা তো কিছুতেই পারল না। শেষে দুভোৱ

বলে হাতের ওপরই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। চমকে জেগে গেল একসময়। মানুষের গলা কানে এসেছে।

অঘোরে ঘুমোছে কিশোর আর বাউয়েন। রবিনের নাক ডাকছে মৃদু শব্দে। ঘড়ি দেখল সে। বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। প্রায় মধ্যরাত। কিছু ঘটলে দশ মিনিটের মধ্যেই ঘটবে। কি ঘটবে? কচু, মনকে বোঝাল সে। কিছুই ঘটবে না। ভয় দেখাতে চেয়েছে ওৰা। আবার ঘুমানোর চেষ্টা করতে লাগল সে।

কিন্তু শরীরটা খারাপ লাগছে। মাথা ধরেছে। পেটে ব্যথা। নাড়ি দেখল। অস্বাভাবিক গতিতে চলছে। শীত শীত লাগছে। কিশোরকে জাগাবে? ভীতুর ডিম বলে তাকে টিটকারি দেবে কিশোর, এটা সহ্য করতে পারবে না সে।

আসলে অতটা অবজ্ঞা করা উচিত হয়নি ওৰাকে, ভাবতে লাগল সে। সভ্য মানুষেরা অনেক আশ্চর্য আবিষ্কার করেছে, ঠিক, তার পরেও আজকাল বিজ্ঞানীরা অরণ্যের গভীরে চলে যাচ্ছেন আদিবাসীদের কাছ থেকে ওষুধের জ্ঞান আহরণের জন্য। তাদের ধারণা, ভেষজ ওষুধে অনেক জ্ঞান অসভ্যদের। এমনকি ক্যান্সারের ওষুধও নাকি জানে ওৱা।

তবে কি বিজ্ঞানীদের কথাই ঠিক? ওৰা কিছু একটা করেছে? যার ফলে চাপ পড়েছে তার মগজে? ব্যথা করছে? এতক্ষণে বিশ্বাস করতে আরস্ত করল, কেন ওৰা যখন কাউকে বলে ‘তুমি মরবে’, সে সত্যিই মারা যায়। গুৱাঘাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো তার। করল না। মরলে নীরবে মরবে।

কি যা-তা ভাবছে!—নিজেকে ধূমক লাগাল সে। মরবে না, এ তো জানা কথাই। অন্তত ওই শয়তান ওঝাটার কথায় তো নয়ই। আসলে অতিরিক্ত ক্লান্তি আর উজ্জেব্বলায় এ রকম হচ্ছে। আবার ঘুমানোর চেষ্টা করল সে।

ঘুমিয়ে পড়ল ও, তবে অশান্তির ঘুম। কারণ অস্থিরতা রয়েছে মনের ভেতর। দুঃস্ময় দেখল, সে মারা গেছে, আর তার খুলিটা রঙ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। মন্ত দরজার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। নড়ে উঠল কিশোর আর বাউয়েন। বাইরে অনেক লোকের কলরব। তালা খোলার শব্দ হলো খুলে গেল দরজাটা।

দরজায় দাঁড়িয়ে ওৰা। পেছনে গাঁয়ের লোক। গুলা বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে দেখার চেষ্টা করছে সত্যিই কাজ করেছে কিনা অভিশাপ।

‘মারার অভিনয় করো,’ ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর।

চোখ মুদে পড়ে রইল চার জনে। ভেতরে ঢুকল ওৰা ওৱা ভান করে পড়ে আছে কিনা বোঝার জন্য। জোরে জোরে লাঠি মাঝল পাঁজরে। নড়ল না চারজন যেন মরে শক্ত হয়ে গেছে।

নিজেদের ওৰার প্রশংসা করে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন। মহিলাদের কয়েকজন সহানুভূতি জানিয়ে গোড়াল, কিংবা ককাল।

বাইরে বেরিয়ে কর্কশ কঢ়ে আদেশ দিল ওৰা। ফিসফিস করে বাউয়েন বললেন, ‘আগুন জুলার নির্দেশ দিচ্ছে সে।’

পাথরের কুড়াল দিয়ে ডালপাতা কাটার শব্দ হলো। খসখস, খুটখাট আরও নানা রকম শব্দের পর জুলে উঠল আগুন।

‘পুড়িয়ে মারবে নাকি?’ মুসার প্রশ্ন।

‘চুপ,’ কিশোরের ইচ্ছে বুঝে গেছেন ক্যাপ্টেন। ‘কোন কথা নয়। নড়বে না। হঠাৎ চমকে দেব ব্যাটাদের।’

আবার কড়া গলায় আদেশ দিল ওঝা। কয়েকজন লোক চুকল ঘরে। চারটে ‘লাশকে’ বের করে নিয়ে গিয়ে রাখল আগুনের ধারে। ইতিমধ্যে বেশ জুলে উঠেছে আগুন। বাড়ছে দ্রুত। একটা চক্র তৈরি করে তার ভেতরে রাখা হয়েছে লাশগুলোকে।

জুলতে জুলতে কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে আগুন। আরেকটু এগোলেই কাপড়ে ধরে যাবে, তারপর শরীরে। ইতিমধ্যেই ছাঁকা লাগতে আরম্ভ করেছে। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে ভেজা ঘাসপাতায় আগুন লেগে প্রচুর ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

‘হয়েছে, উঠে পড়ো,’ নির্দেশ দিলেন বাউয়েন। ‘লাফিয়ে বেরিয়ে যাব আগুনের ভেতর থেকে।’

ধোঁয়ার ভেতরে চারটে লাশকে উঠে বসতে দেখে আতঙ্কে চিন্কার শুরু করল জংলীরা। কয়েকজন ছুটে পালাল। ওদের ধারণা ওগুলো ভূত। লাফিয়ে আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল ভূতগুলো। রূপান্তরিত হয়ে গেল জীবন্ত মানুষে

একযোগে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। জীবনে এত বড় জাদু আর দেখেনি ওরা। এর তুলনায় ওদের নি. দের ওঝার জাদু কিছুই না। ওঝা নিজেও স্তম্ভিত। বিশ্বাস করতে পারছে না এ রকম কাণ্ড ঘটতে পারে। বরফের মত জমে গেছে যেন সে। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। ঝুলে পড়েছে নিচের চোয়াল। হয়তো এই প্রথম তার খনের পদ্ধতি কাজ করেনি। অভিশাপ ব্যর্থ।

খানিক আগেও সদস্তে চিন্কার করেছে সে। তার ভয়ে ভীত হয়েছে গাঁয়ের নারী-পুরুষ। এখন তার কর্তৃত শেষ। যে কোন সাধারণ লোকের চেয়ে বেশি কিছু নয় আর সে। লোকে চেঁচামেচি করে বলতে শুরু করল, ওঝাকে এখন আগুনে বাঁপ দিতে হবে। নইলে জোর করে ধরে তাকে ফেলা হবে আগুনে। ভয় কি? সে তো ওঝাই। জাদু জানালে বেরিয়ে আসুক। নয়তো মরুক। ক্ষমতা নেই, এ রকম ওঝার দরকার নেই গাঁয়ের লোকের।

ভড়কে গেল ওঝা। কেউ কিছু বোঝার আগেই ঘুরে দিল দৌড়। এক ছুটে হারিল্লে গেল বনের ভেতরে।

চার

তীরের কাছে নলখাগড়ার ভেতরে দানবটাকে নড়তে চড়তে দেখল মুসা।

হাতে-মুখে কালি ময়লা লেগে আছে, ধুতে এসেছে সে। পানির কাছে এসে ঝুঁকল। পেছনে গাঁয়ের লোকের উত্তেজিত গুঞ্জন শোনা গেল। তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। ‘সাবধান! কুমিরটার চোখ তোমার ওপর। আস্ত

শয়তান। ওরা বলছে ওদের শ'খানেক মানুষকে মোনা। মাসাহু গু।

ফিরে তাকাল মুসা। 'তাই নাকি? মিথো কথা এলাই রাখবা মানুষ
মারলেও ওটাকে মেরে ফেলত ওরা।'

'না, মারেনি তার কারণ ওটাকে কুমির মনে করে না যাব।' মাসাহু
কুমিরের রূপ ধরে এসেছে। ওটাকে মারলে ভেতরের শয়তানটা জো মাসাহু না
উল্টে ভীষণ রেগে গিয়ে পুরো গ্রাম ধ্বংস করে দেবে। তুমি মারতে গোলে, মাসাহু
ওপরও খেপে যাবে ওরা।'

'তাই নাকি?' মুচকি হাসল মুসা। 'তাহলে জ্যান্তই ধরব। চিড়িয়াখানা গো
বড় একটা কুমির চেয়েছে। চমৎকার নমুনা এটা।'

'মাথা খারাপ। এখানকার কুমিরকে তুমি চেনো না। আঁধেকিয় যে সব
অ্যাপিগেটের দেখেছে ওগুলোর সঙ্গে এর অনেক তফাত।'

'ক্যাপ্টেন ঠিকই রাখেছেন,' রবিন বলল। 'কেন, পড়োনি? কুমির হলো
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সরীসূপ। আর নিউগিনির এই দক্ষিণ উপকূলে ছেট
ব্যারিয়ার রীফের ভেতরেরগুলো তো একেকটা দৈত্য।'

'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কুমির,' কিশোর বলল। 'সাংঘাতিক শক্তি এদের
চামড়া। পাঁয়তালিশ বোরের বুলেট হলে হয়তো মারা যাবে। কিন্তু জ্যান্ত ধরা?
অসম্ভব।'

'তারমানে তোমরা চেষ্টা করতেও রাজি নও?' মুসার প্রশ্ন।

নলখাগড়ার বনে কুমিরটার দিকে তাকাল আবার কিশোর। ঘাপটি মেরে পড়ে
রয়েছে। ভাবখানা, কিছু জানে না। পানির কাছাকাছি কোন বাচ্চা কিংবা
মেয়েমানুষ এলে, আর সামান্যতম অসতর্ক হলেই চোখের পলকে এসে কামড়ে
ধরে টেনে নিয়ে চলে যাবে পানির তলায়।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'তুমি ঠিকই বলছ। চেষ্টা করা উচিত।
গাঁয়ের লোকে মারবে না এটাকে। আর এটাও মহা আরামে একের পর এক মানুষ
সাবাড় করতে থাকবে। এই মানুষ খাওয়া বন্ধ করা দরকার।'

'কিন্তু ধরবে কিভাবে?' জিজেস করলেন ক্যাপ্টেন। 'আর ধরে রাখবেই বা
কোথায়?' চরায় আটকা পড়া কাত হয়ে থাকা স্কুনারটার দিকে তাকিয়ে রাখেন
তিনি।

'সেই ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। জোয়ার আসছে। ওটাকে নামানোর
উপযুক্ত সময় এটাই। সাহায্য করার জন্যে অনেক লোক পাবেন এখন। তলাটা না
ভেঙে থাকলেই হয়। আমার বিশ্বাস ভাঙ্গেনি। পানিতে নামাতে পারলেই সব ঠিক
হয়ে যাবে। জলজ জীব রাখার বড় বড় ট্যাংকগুলো নিশ্চয় সহজে ফুটো হবে না।
ওরকম একটাতেই রাখব দৈত্যটাকে।'

'রাখা তো পরের কথা। ধরতে পারো কিনা আগে দেখো। এক টন ওজনের
একটা কুমিরকে কিভাবে ধরো দেখার বড় আগ্রহ হচ্ছে আমার।'

কিশোর ঠিকই বলেছে। লোক জোগাড় করতে অসুবিধে হলো না। তাদেরকে
নিয়ে জাহাজ নামাতে চললেন ক্যাপ্টেন।

কুমিরটার দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাল কিশোর। এতবড় একটা দানবকে কি

করে ধরবে ভাবছে? একশো লোকের শক্তি ওটার গায়ে।

কলরব জুড়েছে বিশজন লোক, যারা বাউয়েনকে সাহায্য করতে গেছে। জোয়ারে বেশ ফুলে উঠেছে পানি। অনেক কায়দা কসরৎ করতে' হলো অবশ্য, তবে অবশ্যে ঠেলে জাহাজটাকে বেশি পানিতে নামানো গেল। এবারেও কিশোরের অনুমান ঠিক। তলাটার কোন ক্ষতি হয়নি। সোজা হয়ে ভেসে রইল সাইক্লোন।

ডেক থেকে চেঁচিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, 'কুমিরটাকে ধরে নিয়ে এসো। আমি জায়গা করে রাখছি। হাহ হাহ।'

'এক বাড়িল দড়ি ছুঁড়ে দিন,' কিশোর বলল।

'কি করবে?' রবিন জানতে চাইল।

'একমাথা ওই গাছের সঙ্গে বাঁধব। আরেক মাথায় ফাঁসি বানিয়ে ল্যাসোর মত ছুঁড়ে মারব কুমিরের মুখে। আটকে দিতে পারলে হাঁ করতে পারবে না। ক্ষতি করার ক্ষমতা অনেকখানি কমবে।'

রবিন চুপ করে রইল। মুসার মনে হলো কাজ হলেও হতে পারে। কুমির ঘাপটি মেরে থাকার সময় অনেক সময় মুখটা ওপর দিকে তুলে রাখে কোণাকুণি করে। ওই সময় তার মুখে ফাঁস পরানো কঠিন নয়।

প্রথমবারের চেষ্টাতেই তার বন্ধ করা চোয়াল আর নাক গলে চোখের কাছাকাছি চলে এল ফাঁস। দড়ি ধরে হ্যাচকা এক টান দিতেই আটকে গেল। মুখ আর খুলতে পারবে না কুমির।

গায়ের লোকে দেখছিল, হল্লোড় করে উঠল। ভীষণ রেগে গেছে কুমির। চোখ জুলছে। তেড়ে এল তিন গোয়েন্দার দিকে। ওরা ভাবছে, ডাঙ্গায় রয়েছে। এখানে নিরাপদ। কিন্তু কুমির পানিতে যেমন বিপজ্জনক, ডাঙ্গায়ও কিছুমাত্র কম নয়। চোখের পলকে কাছে এসে লেজের বাড়ি মেরে গোয়েন্দাদের পানিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। অল্লের জন্যে বেঁচে গেল ওরা। শয়তান খেপেছে ভেবে যে যেদিকে পারল দৌড় মারল গ্রামবাসীরা। তবে দড়িটা শক্ত, আর শক্ত করেই গাছের সঙ্গে বেঁধেছে কিশোর। ছুটাতে পারল না কুমির। আবার তাড়া করল ওদেরকে।

গোছটার দিকে তাকাল একবার কিশোর। ওখানে উঠে রেহাই পাওয়া যায় কিনা ভাবল। উঁহ, হবে না। মুসা আর রবিনকে ছুটতে বলে দৌড় দিল টামবারানের দিকে।

লস্বা দড়ি। পেছন পেছন এল কুমিরটা। যে করেই হোক ধরবেই শয়তান ছেলেগুলোকে। ভাবখানা-এত্ত বড় সাহস! তাকে নিয়ে মজা করে!

প্রায় মাটির কাছাকাছি নেমে আসা চালাটায় উঠতে কোন অসুবিধে হলো না ওদের। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার মত করে এক দৌড়ে উঠে পড়ল। কুমিরটা ও ছাড়ার পাত্র নয়। উঠে পড়ল পেছন পেছন। তিনটে ছেলে উঠেছে, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু একটানী একটা কুমিরের ভার বহন করার মত শক্ত নয় চালাটা। ভেঙে পড়ল।

ছাতের আরেক ঢাল বেয়ে নেমে পড়ল ছেলেরা। মারাত্মক জানোয়ারটা

পেছনে আসছে কিনা দেখারও সময় নেই। একটা ঝোপের ভেতরে লুকানোর পর ফিরে তাকানোর অবকাশ হলো।

টামবারানের ভেতরে তোলপাড় করে ফেলেছে কুমিরটা। মূর্তি উল্টে ফেলেছে। লেজের ঝাপটায় তাক থেকে ঝরবার করে পড়ছে খুলিগুলো। বেরোনোর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ওটা। পথ খুঁজছে।

‘দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে,’ কিশোর বলল। ‘তার আগেই ওটাকে পাকড়াও করতে না পারলে...’

‘ওই দৈত্যটাকে? কি করে?’ মুসা বলল।

‘জাল দিয়ে।’

‘একটা মিনিটও রাখবে না জাল। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে।’

‘হাঙর ধরার তারের জালটা ব্যবহার করা যেতে পারে।’

‘হাঙরের লেজও নেই কুমিরের মত; নখও নেই। আটকানো যায়। কিন্তু কুমিরকে?’

‘দেখতে দোষ কি?’

তা বটে। দেখতে দোষ কি? আর তর্ক করল না মুসা।

‘দৌড়ে যাও। ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলো ওটা ছুঁড়ে দিক।’

টামবারানের ভেতরে ওদিকে নরক গুলজার করছে কুমিরটা। বেরোনোর পথ এখনও খুঁজে পায়নি।

সাংঘাতিক ভারি জাল। ক্যাপ্টেনের একার পক্ষে ওটা ছুঁড়ে দেয়া অসম্ভব। অবশ্যে বারোজন লোকের সহায়তায় ওটা জাহাজ থেকে নামিয়ে টামবারানের দরজা পর্যন্ত বয়ে আনা হলো। ছড়িয়ে দেয়া হলো।

দরজাটা খুঁজে পেল কুমির। লেজের বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলল কাঠ। হড়মুড় করে বেরিয়ে এসেই গুঁতো মারল জালে। জড়িয়ে ফেলল নিজেকে। ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। আরও বেশি করে জড়িয়ে ফেলল নিজেকে। আনন্দে হৈ-হৈ করে চেঁচাতে লাগল কিশোর, মুসা আর রবিন। উত্তেজনায় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেনি, ফাঁস্টা নেমে গেছে নিচে। হাঁ করতে পারছে কুমিরটা, পুরোটা নয় যদিও। তবে ওতেই যথেষ্ট। ধারাল দাঁত দিয়ে দশ সেকেন্ডে তার কেটে পথ বের করে ফেলল। মানুষকে আক্রমণ করতে এল না আর। পানির দিকে ছুটল।

আবার গিয়ে ঢুকল নলখাগড়ার ভেতরে। তার আগের জায়গায়।

দুঃ সংকল্প করে ফেলল দুই এনিমেল ক্যাচার, যে করেই হোক কুমিরটাকে ধরবেই। নদীর ভাটির দিকে নিরাপদ জায়গায় এসে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল। আলোচনা করতে লাগল, কি করে ধরা যায় জানোয়ারটাকে।

‘চমৎকার একটা নমুনা,’ কিশোর বলল আফসোস করে। ‘চিড়িয়াখানার পরিচালকের খুব পছন্দ হত। কম করে হলেও সত্ত্ব আশি হাজার ডলার পাওয়া যেত নিয়ে যেতে পারলে। ধরতেই হবে।’

‘কিভাবে?’ একই প্রশ্ন আরেকবার তুলল মুসা।

পাঁচ

অনেক আলোচনা করেও কোনই উপায় বের করতে পারল না ওরা। অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল পানির দিকে। পানির নিচে আলোড়ন্টা প্রথম চোখে পড়ল মুসার।

‘হচ্ছেটা কি ওখানে?’

কিশোরও তাকাল। নদীর তলায় একটা কাপেটি মত দেখা যাচ্ছে। নড়ছে কাপেটিটা। উজনখানেক চোখও আছে।

‘ফ্ল্যাটফিশ,’ হঠাৎ চিনে ফেলল কিশোর।

‘ফ্ল্যাটফিশ হতেই পারে না,’ মুসা বলল। ‘যদূর জানি ওই ধরনের রে থাকে নোনা পানিতে। সাগরে।’

‘পানিটা মুখে দিয়ে দেখো।’

আঙুল চুবিয়ে জিভে লাগাল মুসা। মুখ বাঁকিয়ে ফেলল। লবণাক্ত।

‘জোয়ার-ভাটা হয় নদীতে, ভুলে গেছো,’ কিশোর বলল। ‘মনে নেই, নদীর মুখ দিয়ে সাগর থেকে ঢুকেছিলাম আমরা? দিনে দু’বার জোয়ার আসে নদীতে। মিষ্টি পানির সঙ্গে মিশে গেছে নোনা পানি, নোনা করে দিয়েছে। যে কুমিরটা ধরার চেষ্টা করছি আমরা ওটাও নোনা পানির জীব।’ ফ্ল্যাটফিশটার দিকে আঙুল তুলল, ‘কোন প্রজাতির রে ওটা, ধরতে পারলে বোৰা যাবে।’

পানি ওখানে কম। নেমে জীবটার লেজ ধরে টান দিল কিশোর। বিদ্যুৎ গতিতে শরীর ঘুরিয়ে ফেলল ওটা। গলার নিচটায় হাত লাগল তার। বৈদ্যুতিক শক খেল যেন সে। তারপর আর সাড়া নেই শরীরের, অবশ হয়ে পেল। স্বাভাবিক হতে কয়েক মিনিট সময় লাগল তার।

‘নামফিশ।’

‘নামফিশটা আবার কি?’

‘ইলেক্ট্রিক রে। মাথার পেছনে রয়েছে ব্যাটারি। ভাগ্য ভাল, ওখানটায় হাত লাগেনি। তাহলে মারাও যেতে পারতাম।’

উজানের দিকে তাকাল মুসা। এখনও একই জায়াগায় নলখাগড়ার ভেতরে শুয়ে আছে কুমিরটা। ‘আচ্ছা, কুমিররা কি এ সব মাছ খায়?’

‘মনে হয়। কুমির অনেকটা উটপাখির মত। যা পায় গিলে ফেলে। সেজন্যেই ওগুলোর পেটে নানা রকম অস্তুত জিনিস পাওয়া যায়। মাছের হাড় আর মানুষের হাড় তো থাকেই, কারণ কুমির সব খায়। মেরে মানুষ খায়, ফলে অনেক ধরনের গহনা পাওয়া যায়। টিনের পাত্র, বাসন-পেয়ালা এমনকি পাথরও পাওয়া যায়।’

চকচক করছে রবিনের চোখ। ‘একটা বুদ্ধি এসেছে। রে-টাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কুমিরকে খাইয়ে দিই না কেন? অবশ হয়ে যাবে না?’

কিশোর-হাসল। 'বুদ্ধিটা মন্দ না। একটাতে কিছু থবে না ওটাৰ। থবে গোঁড়া
কয়েক গিলিয়ে দিতে পাৱলে কাজ হতেও পাৱে।'

এবাব রে-টাৰ লেজ ধৰে টান দিল মুসা। 'বাপৱে, দুশো পাউডেৰ কম থবে
না। এই ধৰো না তোমৱা, হাত লাগাও, আমি একা পাৱব না। ঘাড় আৱ গলাব
কাছে হাত দিয়ো না, সাবধান।'

টেনেটুনে মাছটাকে তুলে এনে কুমিৱেৱ কাছাকাছি ফেলল দু'জনে। তাৱপৱ
দূৰে সৱে গিয়ে দেখতে লাগল কি কৱে।

কয়েক মুহূৰ্ত স্থিৰ দৃষ্টিতে মাছটাৰ দিকে তাকিয়ে রইল কুমিৱ। তাৱপৱ হঠাৎ
ঝাপ দিল সামনে। শক্তিশালী প্ৰপেলারেৰ মত কাজ কৱছে লেজটা। ছুটে গিয়ে
এক কামড়ে গিলে ফেলল রে-টাকে।

নামফিশেৱ অভাব নেই। আৱেকটা ধৰে এনে কুমিৱেৱ সামনে রাখা হলো।
সেটাও গিলে ফেলল কুমিৱ। তাৱপৱ একেৰ পৱ এক ধৰে আনা হতে লাগল আৱ
গেলানো হতে লাগল। আট নম্বৰ মাছটা খাওয়াৰ পৱ অলস হয়ে এল কুমিৱটাৰ
নড়াচড়া। চোখ বুজে এল। মুখ বন্ধ। লেজ নাড়ছে না আৱ। ভাৱি একটা কাঠেৰ
মত নিথৰ হয়ে পড়ে রইল দানবীয় শৱীৱটা।

সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিল দুই গোয়েন্দা। যে কোন সময় সাড় ফিৱে
আসতে পাৱে জেনেও ওটাৰ লেজ ধৰে টেনে নিয়ে চলল জাহাজেৰ দিকে। ক্ৰেণ
নামানো হতে লাগল জাহাজে তোলাৰ জন্যে।

এতই নিথৰ হয়ে আছে কুমিৱটা, শক্তিত হলো মুসা, 'মৱে গেল না তো?'

'এত সহজে? কুমিৱেৱ জান বড় শক্ত। দেখো না, পনেৱো মিনিটেই নড়তে
শুৱ কৱবে। তাৱ আগেই আটকে ফেলতে হবে।'

ক্ৰেণ দিয়ে তুলে বিশাল একটা ট্যাংকে ঢোকানো হলো কুমিৱটাকে। আধ
ঘণ্টা পৱেও যখন নড়ল না ওটা, কিশোৱও ঘাবড়ে গেল।

আৱও পনেৱো মিনিট পৱ সাড় ফিৱল কুমিৱেৱ শৱীৱে নিজেকে বন্দি
অবস্থায় দেখে ভীষণ রেগে গেল। ট্যাংকেৰ ভেতৱে লেজেৰ ঝাপটা মারতে শুৱ
কৱল। ইস্পাতেৱ ট্যাংক, তা-ও ভয় হতে লাগল মুসাৱ, ভেঙ্গে না ফেলে।

কিশোৱ বলল, 'ভয় নেই। বেশিক্ষণ এ রকম কৱবে না। আস্তে আস্তে
অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে। শান্ত হয়ে যাবে। কুমিৱ ওৱকমই। খাবাৱ
পেলেই খুশি থাকবে তখন, আৱ গোলমাল কৱবে না।'

ছয়

অস্ট্ৰেলিয়ান উপকূলেৱ একটা জেলখানা। ৱোদ উঠেছে। কিন্তু কয়েদখানাৰ পুৱৰ
দেয়াল ভেদ কৱে সে আলো পৌছুতে পাৱছে না ভেতৱে। ছাত থেকে ঝুলছে অল্প
পাওয়াৱেৱ একটা বালব।

গায়ে কঁটা দিল বব অ্যাঞ্জেলের। বিশালদেহী শক্তিশালী মানুষ। বসে আছে দেয়ালে পিঠ দিয়ে। গায়ে জড়ানো কালো একটা কম্বলের দুই কোণ এমন ভাবে বেরিয়ে আছে দু'দিক থেকে মনে হয় মস্ত একটা শকুন ওত পেতেছে খরগোশ কিংবা ইঁদুরের ওপর বাঁপ দেয়ার জন্যে।

খাঁচার মত ঘরটার ভেতরে ইঁদুর একজনই আছে, নিরো। ঘূমন্ত। শকুনের নথের কাছেই। নিরো জেলে এসেছে ছুরি মারামারি করে। ছুরি খুব ভাল খেলে তার হাতে।

জেলের ভেতরে এখানে জীবনযাত্রা বড়ই বিষণ্ণ। টেলিভিশন নেই। রেডিও নেই। পড়ার বই নেই। দেয়ালে ঝোলানো ছবি নেই। পাথরের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসে শুধু ঠাণ্ডা ঘামের মত পানি। নাস্তা আসেনি এখনও। তবে সেটা আসার চেয়ে না আসাই ভাল। গেলা যায় না। সারাটা জীবন এভাবেই কাটাতে হবে এখানে থাকলে। কোন বৈচিত্র নেই।

এটা উচিত হয়নি, এতটা শাস্তি-ভাবল বব। অপরাধ সে কিছু করেছে, স্বীকার করে, তবে সেটা আমেরিকায়। এখানে এসে চারটে খুন করার চেষ্টা করছিল, তার মধ্যে মাত্র দুটো সফল হয়েছে। তার জন্যে এই শাস্তি? অন্যায়। একেবারেই অন্যায়।

তবু ভাল যে কথা বলার একজন লোক আছে। তার পাঁজরে লাথি মারল বব। গুঙ্গিয়ে উঠে চোখ মেলল নিরো। বুক ডলতে ডলতে বলল, ‘কি হলো?’

‘কিছু না,’ শুয়োরের মত ঘোৎ-ঘোৎ করল বব। ‘গুড মর্নিং জানালাম।’

‘চোখ মেলেই তোমার চেহারা দেখার কোন ইচ্ছে আমার নেই। অনেক ভাল ছিলাম, কাল সকালে তুমি এখানে আসার আগে। তোমার মত একটা লোককে কেন যে এখানে ঢোকাল।’

‘হয়তো ভেবেছে চমৎকার একটা মানুষের সঙ্গ তোমার দরকার।’

‘এই নরকে মরতে এলে কেন?’

‘আচ্ছা লোক তো! কাগজও পড়ো না নাকি?’ রসিকতা করল বব।

‘কাগজ?’ বিরক্তিতে মুখ বাঁকাল নিরো। ‘ছ’মাস আগে এখানে এনে আমাকে ঢোকানোর পর কাগজ কি জিনিস ভুলেই গেছি।’

‘তাই নাকি? বেশ বেশ। তাহলে তো আমার জীবনের অনেক কিছুই তোমার অজানা রয়ে গেছে। অথচ সবাই জানে।’

‘আমি বাদে। বলো। শুনে কৃতার্থ হই।’

‘বেশ। নিউ ইয়র্কে, গুগামি করতাম বলে জেলে ভরে দেয়া হলো আমাকে। বহু বছর পর বেরিয়ে আবার একটা দল গড়লাম কায়দা করে চাপ দিয়ে কিছু টাকা আদায় করতে চেয়েছিলাম। ভয় দেখিয়েছিলাম না দিলে শহরটা ধ্বংস করে দেব। আবার ধরে জেলে ভরল আমাকে। কত আর জেলে থাকা যায়? ভাল লাগল না। পালালাম একদিন। একটা জাহাজের খোলে তুকে চলে এলাম অস্ট্রেলিয়ায়। জাহাজ থেকে বেরিয়েই দুটো খুন করতে হলো, একটা টাকার জন্যে, আরেকটা আত্মরক্ষার তাগিদে। আরও দুটো করতে চেয়েছিলাম, পুলিশ, মরল না ব্যাটারা। ধরে ফেলা হলো আমাকে। তারপর এখানে না ভরে আর কোথায় ভরবে?’

‘তাই তো। ঠিকই করেছে। এখানে ছাড়া আর কোথায় ভরবে?’

‘তবে আমি ছাড়ব না ওদেরকে!’ রাগে জুলে উঠল ববের চোখ।
‘কাদেরকে?’

‘তিন গোয়েন্দা। আমার বর্তমান অবস্থার জন্যে ওরাই দায়ী। শোধ আমি
নেবই।’ এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, ‘আমি জেনেছি, নিউ গিনিতে এসেছে
ছেলেগুলো। জন্ম-জানোয়ার ধরতে। আমি ছাড়ব না।’

‘কি করে শোধ নেবে? কতদিন জেল হয়েছে তোমার?’

‘যাবজ্জীবন।’

‘তাহলে? পালানোর মতলব করোনি তো?’

‘যত তাড়াতাড়ি পারব পালাব। তারপর রওনা হব নিউ গিনিতে। খুন করো।
আমি জেলে বসে বসে পচব; আর ওরা আরামে ঘুরবে, তা হবে না।’

‘কিন্তু বেরোবে কি করে এখান থেকে?’

‘ব্যবস্থা একটা করবই। আমাকে আটকে রাখতে পারবে না।’

মুচকি হাসল নিরো। ‘একেবারে সময়মত এসেছ।’

ঝাট করে তার দিকে তাকাল বব। তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ‘মানে?’

‘না, কিছু না।’

কালো হয়ে গেল ববের মুখ। ধাঁ করে লাথি মেরে বসল নিরোর বুকে। গলা
টিপে ধরে কঠিন কঢ়ে বলল, ‘জলদি বল! নইলে শেষ করে ফেলব।’

ভয় দেখা দিল নিরোর চোখে। বুকল মুখ ফসকে বলে ফেলে মস্ত ভুল করে
ফেলেছে। এখন আর সব না বলে পারবে না। তাকে ছেড়ে দেয়ার ইশারা করল।
ছেড়ে দিল বব। ‘বল।’

গলা ডলল নিরো। বিড়বিড় করে বলল, ‘মানুষ না, দৈত্য।’

‘কি বললে?’ ধমকে উঠল বব।

‘বলছি, বলছি।’ তাড়াতাড়ি গলায় হাত দিল নিরো। আরেকবার লোহার মত
আঙুলগুলোর স্পর্শ পেতে চায় না। ফিসফিস করে বলল, ‘কাল রাতে আমরা
কয়েকজন পালাব। আমাদের সঙ্গে আসতে চাও?’

কুৎসিত হাসি ফুটল ববের মুখে। ‘তাহলে কি বললাম এতক্ষণ? এটাই তো
চাই আমি।’

‘তাহলে মুখ বন্ধ রাখবে। টুঁ শব্দটি করবে না। কেউ যেন কিছু বুঝতে না
পারে। কথা দাও।’

‘দিলাম। কিন্তু বেরোবেটা কি করে?’

‘পাশের সেলে কয়েক মাস ধরে খুঁড়ছে ওরা। ছোট একটা ছুরি জোগাড়
করতে পেরেছিল, তাই দিয়ে। তবে এখন এত বড় করে ফেলেছে, হামাগুড়ি দিয়ে
চুকে বেরিয়ে যেতে পারবে।’

‘গার্ড-টার্ড নেই?’

‘আছে। কাছাকাছি মাত্র একজন। তার ব্যবস্থা করা যাবে। তারপর বাইরের
দেয়ালের দিকে রওনা দেব। দেয়ালের দুই কোণে দুই টাওয়ারের মাথায় দু’জন
গার্ড আছে। তবে আমাদের সেল থেকে অনেক দূর। পাচশো গজ হবে। ওরা কিছু

করার আগেই দেয়াল টপকাব আমরা।'

খুব সহজ, ভাবল, বব। বেশি সহজ। এত সহজে কাজ হয়ে যাবে আশা করতে পারল না সে। তবে সেকথা বলল না। বলল, 'দারুণ বুদ্ধি করছে। আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে।'

'প্রতিজ্ঞা করো, হয় পালাব, নয় মরব।'

'করলাম। হয় পালাব, নয় মরব।' তবে মরার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ববের। সে শুধু পালাতেই চায়।

ভাবতে লাগল বব। যতই ভাবল, ততই দুর্বলতাগুলো পরিষ্কার হতে লাগল তার কাছে। যে লোকটা প্রথম বেরোবে, সে বেরিয়েই গার্ডের মুখোমুখি পড়বে। বাধা দেয়ার আগে হৃষিসেল বাজাবে। গার্ড খুন হয়ে যাওয়ার আগেই। তার বাঁশি বাজানো ঠেকানো যাবে না। সতর্ক হয়ে যাবে অন্য গার্ডেরা। ছুটে আসবে চারদিক থেকে। সার্চ লাইট এসে পড়বে আসামীদের ওপর। টাওয়ার থেকে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ শুরু করবে ওখানকার গার্ডেরা। দেয়াল পেরোনোর চেষ্টা যে-ই করবে তখন, বাঁশিরা করে দেয়া হবে গুলিতে।

নাহ, এটা কোন বুদ্ধিই হলো না। পালাতে গেলেই মরবে। ভাবতে ভাবতে শেষে এক চিলতে হাসি ফুটল তার মুখে।

খুশি হয়ে নিরো বলল, 'তাহলে বুদ্ধিটা পছন্দ হয়েছে তোমারও।'

'হয়েছে। চমৎকার প্ল্যান। কাজ হবেই।'

তবে সে তার নিজের প্ল্যান করছে মনে মনে তার একলার জন্যে, ওই বোকাগুলোর তাতে লাভ হবে না। জিজ্ঞেস করল, 'শোয়ারের মত এই খৌয়াড়েই ভরে রাখবে নাকি সারাদিন?'

'না, তা রাখবে না। বের করবে গতর নাড়ানোর জন্যে।'

'গতর নাড়ানো?'

'চতুরে একটু হাঁটাহাঁটি আরকি।'

'অ। কখন?'

'এগারোটার দিকে।'

এগারোটার সামান্য পরে তালা আর লোহার দরজা খোলার ঝনঝন শব্দ হলো। একজন গার্ড উঁকি দিয়ে হকুম দিল, 'এই, বেরোও।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নিরো। বব নড়লও না।

'এসো,' হাত নেড়ে তাকে ডাকল নিরো।

'তুমি যাও,' বব বলল। 'আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। যেতে পারব না।'

নিরোকে নিয়ে চলে গেল গার্ড। খানিক পরে আরেকজনকে টহল দিতে দেখে ডেকে বলল বব, 'আমি একটু ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'তাই, না? ওয়ার্ডেন ব্যস্ত। তোমার মত ডাকাতের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর নেই।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল বব। একটা দৈত্য যেন। গার্ড তার চেয়ে অনেক খাটো। 'দেখো, আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলবে না। তাহলে রিপোর্ট করব বলে দিলাম। জেলের আর দশটা সাধারণ কয়েদীর মত চোরছ্যাচড় নই আমি। অত্যন্ত জরুরী

একটা কথা বলার আছে আমার ওয়ার্ডেনকে। তাঁর জন্যে জরুরী, আমার নয়।'

'তা এত জরুরী কথাটা কি, শুনি?'

'তোমাকে বলা যাবে না। শুধু তাঁকেই। আর বেশি বকবক করতে পারছি না। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার। জলদি যাও।'

চলে গেল গার্ড। ফিরে এল কয়েক মিনিট পরে। ডাকল, 'বেরিয়ে এসো। ওয়ার্ডেন তোমাকে এক মিনিট সময় দিতে রাজি হয়েছেন।'

পথ দেখিয়ে ববকে জেল-প্রধানের কাছে নিয়ে এল গার্ড। ডেঙ্কের কাগজপত্রের স্তুপ, তার ওপাশে প্রায় হারিয়ে গেছেন ওয়ার্ডেন। আসামীর দিকে একবার তাকিয়ে ছেউ একটা শব্দ করেই আবার কাজে মন দিলেন। এক মিনিট কথা বলার জন্যে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ববকে। বসার জন্যে একটা চেয়ার খুঁজল।

হিসিয়ে উঠল গার্ড! 'দাঁড়িয়ে থাকো!' চলে গেল সে।

আরও দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ববকে। তারপর মুখ তুলে তাকালেন ওয়ার্ডেন। এই প্রথম যেন দেখতে পেলেন ববকে। 'হ্যা, বলো,' অধৈর্য কঠে বললেন তিনি। 'কি চাও? দেখছ না আমি ব্যস্ত? কেবল নালিশ নালিশ আর নালিশ! শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছি! খাবার খারাপ? গরম? সহ্য করোগে, যাও।'

'আমি নালিশ করতে আসিনি, স্যার।'

'সব এক রকম। নালিশ করতে আসিনি বলে এখনই ককাতে শুরু করবে। যাও, এক মিনিট সময় শেষ। বেরোও। তোমাদেরকে চিনি আমি।'

দাঁড়িয়ে রইল বব। শান্তকর্ত্ত্বে বলল, 'অপমানিত হতে আসিনি আমি এখানে, স্যার।'

জুলে উঠল ওয়ার্ডেনের চোখ। 'বেশি কথা বললে ভাল হবে না। জলদি বলো কি জন্যে এসেছে?'

'বললামই তো নালিশ করতে আসিনি। বরং আপনার একটা উপকার করতে এসেছি।'

হেসে উঠলেন ওয়ার্ডেন। 'চমৎকার! কার মুখ দেখে যে আজ ঘুম ভেঙ্গেছিল আমার। ব্যাটা এক কয়েদী এসেছে আমার উপকার করতে। নাম কি?'

'রেভারেন্ড বব অ্যাঞ্জেল।'

'ও, মনে পড়েছে তোমার কেস। আহারে, কি আমার পাদ্রী। নাম্বার ওয়ান খুনী। নিশ্চয় ধর্মের কথা শোনাতে এসেছে। বেরোও। দরজার কাছেই একজন গার্ড পাবে। সে তোমাকে তোমার সেলে নিয়ে যাবে।'

'তা তো যাবাই। ঢবে যাবার আগে আপনার টেবিলের ওপরে একটা বোমা ফেলে যেতে চাই।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ওয়ার্ডেন। পিছিয়ে গেলেন এক পা। ভয়ে ভয়ে তাকালেন ববের দিকে। বোমাটা কোথায় দেখতে চাইলেন।

হেসে ফেলল বব। 'ওই বোমা নয়। কথার বোমা। আমি বলতে এসেছি, পালানোর চেষ্টায় আছে কয়েকজন কয়েদী। ওরা সফল হলে হয়তো চাকরিটাই

খোঁয়াবেন আপনি। ভাল একজন নাগরিক আর ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান হিসেবে আপনাকে ছুঁশিয়ার করে দেয়াটা দায়িত্ব মনে করলাম, তাই এসেছি।'

হঠাতে বদলে গেল ওয়ার্ডেনের আচরণ। মিষ্টি হেসে বললেন, 'আগে বলতে হয়। আমাকে তাহলে একথা বলতে এসেছ?'

'হ্যাঁ, এসেছিলাম, কিন্তু আপনি শুনতে চাইলেন না। বরং অপমান করলেন। চলি।' ঘুরে দরজার দিকে রওনা হলো বব।

'এই শোনো শোনো, ভুল করেছি আমি। তোমাকে চিনতে পারিনি।'

'ঠিক আছে, যান, মাপ করে দিলাম।'

'তুমি ঠিকই বলেছ, অঘটনটা ঘটে গেলে চাকরি খোয়াতে হতো আমাকে। আমার অনেক বড় উপকারই করতে এসেছ তুমি। তা কখন ঘটেছে ঘটনাটা?'

'কাল রাতে।'

'ক'জন?'

'তা বলতে পারব না। তবে বেশ কয়েকজন মনে হয়। আমাকেও পালানোর দাওয়াত করা হয়েছে।'

'কে করেছে?'

'একজন চমৎকার ভদ্রলোক। আন্ত একটা ইঁদুর। আমার সেল-মেট। নিরো।'

'কি করে বেরোবে?'

'সেলের নিচ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বের করে নিয়ে গেছে চতুরে। বাইরে বেরিয়েই আগে ওখানকার গার্ডকে খুন করবে। তারপর দেয়াল টপকে বেরিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ। তাহলে তোমাকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। সেটা না রেখে তুমি এসেছ আমাকে বলে দিতে। যাবজ্জীবন হয়েছে তোমার। ইচ্ছে করলে পালিয়ে যেতে পারতে কালকে। তবে না গিয়ে ভাল করেছ, ঠিক কাজটাই করেছ। একজন ভাল মানুষের কাজ করেছ।'

'আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করলাম, লজিত কঢ়ে বলল বব।'

'দায়িত্বের কথাটা যদি এখানে আসার আগে মনে থাকত, তাহলে আর আসতেই হত না।'

'তা ঠিকই বলেছেন,' অনুশোচনায় যেন দক্ষ ইচ্ছে ববের অন্তর। 'আগে ভাবিনি, শয়তান ভর করেছিল মাথায়। জেলে ঢোকার পর থেকেই ভাবছি। অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছি এতদিন। শয়তানের প্ররোচনায়। আর করতে রাজি নই। আসলে আমার চলা উচিত ছিল বাইবেলের নির্দেশমত, এখন থেকে তা-ই চলব। ফিরে যাব ঈশ্বরের পায়ের কাছে।'

ববের অভিনয়ে একেবারে মজে গেলেন ওয়ার্ডেন লোকটা যে ভাল হতে চায়, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই দিয়েছে। পালানোর লোভ সংবরণ করে তাঁকে খবর দিতে এসেছে। 'বেরোক সুড়ঙ্গ থেকে। তারপর দেখবে কারা দাঁড়িয়ে আছে ওদের অপেক্ষায়। তোমার কথা যদি ঠিক হয়, তোমাকে একজন ট্রাস্ট করব আমি।'

চোখ মিটমিট করল বব। যেন অশ্রু ঠেকানোর চেষ্টা করছে। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, ওয়ার্ডেন। আমি আপনাকে বলেছি, কিছু চাইতে কিংবা নালিশ জানাবে

আসিনি। তারপরেও একটা জিনিস চাইব।'

'কী?'

'একটা বাইবেল। সেলের ভেতরে ওটাই হবে আমার একমাত্র ভরসা এবং সঙ্গী।'

নাহ, লোকটা সত্যি সত্যি বদলে গেছে। বুককেসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ছোট এককপি বাইবেল বের করে আনলেন।

এমন ভঙ্গিতে হাত পেতে নিল বব, যেন অযূল্য কিছু নিচে। 'আপনি বুঝবেন না, ওয়ার্ডেন, কি জিনিস আমাকে দিলেন!' শেষ দিকে সামান্য কেঁপে উঠল তার গলা। বাইবেল বুকে চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে।

করিডর ধরে গার্ডের সঙ্গে চলতে হাসিতে ফেটে পড়ল সে। দারুণ, ওহ, দারুণ হয়েছে! তার ভাগ্য বলতে হবে। আসামীরা পালাতে পারবে না কিছুতেই এখন। তবে তার যা লাভ হওয়ার হয়ে গেল। তাকে ট্রাস্ট করবেন ওয়ার্ডেন। বিশ্বাস করবেন। জেলের ভেতরে যেখানে খুশি যেতে আসতে পারবে এখন সে। পালানোর সুযোগ করে নিতে অসুবিধে হবে না।

ফিরে এসে নিরো দেখল, দেয়ালে হেলান দিয়ে কিম মেরে রয়েছে বব। সহানুভূতির সুরে বলল, 'ভেবো না। কাল বেরিয়ে যেতে পারলেই অনেকখানি সেরে উঠবে তুমি। মন ভাল হয়ে যাবে।'

অনেক কষ্টে যেন মুখ তুলল বব। 'ভাল বুদ্ধি বের করেছ। আমাকে যে দলে নিয়েছ এজন্যে আমি কতজ্ঞ। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। নিউ গিনির দিকে খুব শীত্রি রওনা হতে পারব আমি।'



সাত

একটা রাত গেল, একটা দিন গেল। তারপর এল জেল থেকে পালানোর সময়।

'অন্যদিনের মতই রাতের খাবার খেতে যাব আমরা,' নিরো বলল। 'তবে এই সেলে আর ফিরব না। পাশের সেল দিয়ে সুড়ঙ্গে চুকে পড়ব।'

তার কথা যেন শুনতেই পায়নি বব। শরীর মোচড়াচ্ছে আর গোঙাচ্ছে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল নিরো।

'প্রচঙ্গ পেটব্যাথা। অ্যাপেনডিসাইটিস হয়ে গেল কিনা কে জানে। এতবড় একটা সুযোগ পেয়েও হারালাম। তোমরা যাও। আমি বোধহয় আর পারলাম না।'

'খাওয়ার পর ঠিক হয়ে যেতে পারে। এসো।'

'না, আমি খেতেই পারব না। উহ, বাবারে! নড়তেই পারছি না! যাও, বক্স, যাও, তোমার কথা মনে থাকবে আমার। অনেক ধন্যবাদ। আমার কপালে কষ্ট আছে। তুমি আর কি করবে।'

নিরো বেরিয়ে যেতেই চুপ হয়ে গেল বব। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল

কখন ঘটে ঘটনা। লোকগুলো খাবার পর এসে পালানোর চেষ্টা করবে তো?

রাতের খাবারের পর কয়েদীরা যার যার সেলে ফিরে যায়, এই স্বাধীনতাটুকু আছে। তখন আর ওদের সঙ্গে গার্ড থাকে না। ইচ্ছে করলে কিছুক্ষণ সোশ্যাল রুমেও কাটাতে পারে। অনেক পরে এসে সেলের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে যায় গার্ড।

বেশ কিছুক্ষণ পর করিডরে পায়ের শব্দ শুনতে পেল বব। ফিরে আসছে কয়েদীরা। সে জানে, ওদের অনেকেই আর নিজের সেলে ফিরে যাবে না। যেটাতে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছে সেটাতে ঢুকবে।

প্রায় দম বন্ধ করে রাইল বব। কান পেতে শুনতে লাগল। সেলের পুরু দেয়ালের জন্যে পাশের সেলে কি হচ্ছে তা-ও কানে আসছে না। পরে সব জানতে পারল সে। সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়েছিল কয়েদীরা। একজন গার্ডকেও চতুরে দেখতে পায়নি। এতে বরং ঝুশিই হয়েছিল তারা, যদিও কিছুটা অবাক হয়েছিল। সব যখন বেরোল সুড়ঙ্গ থেকে, চারপাশ থেকে ছুটে এল লুকিয়ে থাকা গার্ডেরা। ধিরে ফেলল। কয়েকজন কয়েদী দৌড় দিল দেয়ালের দিকে। তাদের ওপর এসে পড়ল সার্চলাইটের আলো। দেয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরল তিনজন। বাকিদেরকে ধরে বকরির মত খেদিয়ে এনে ভরা হলো একটা ঘরে। পরে সলিটারিতে পাঠানো হবে।

আধুনিক পরে একজন গার্ড এসে উঁকি দিল ববের ঘরের শিকের ফাঁক দিয়ে। সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে তালা লাগিয়ে দিল।

‘নিরো কোথায়?’ জানতে চাইল বব।

‘মারা গেছে।’ বলে চলে গেল গার্ড।

মুচকি হাসল বব। যাক, একটা কাজ সারা হলো। এই সেলটা এখন শুধু তার একলার। কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। নিরো আর তার বোকা দোষগুলো বোকামির সাজা পেয়েছে। পালাতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে, ধরা পড়েছে। কিন্তু বব গোলমালও করবে না, ধরাও পড়বে না।

সকালে তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। আগের বার যখন এসেছিল, তাকে দেখেও দেখেননি ওয়ার্ডেন। এইবার ঢোকামাত্র স্বাগত জানালেন। উঠে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ববের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, ‘মিস্টার অ্যাঞ্জেল, আমার আর এই জেলখানার জন্যে যা করলেন আপনি, তার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না। আমার বিশ্বাস, সেল-মেটদের পালানোর খবরটা বলতেও অনেক কষ্ট হয়েছে আপনার, ওদের জন্যে, কিন্তু উচিত কাজটা করতে কিছুতেই পিছপা হননি আপনি।’

চোখে পানি এসে গেল ববের। হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, ‘আর বলবেন না। ওদের মৃত্যুর সংবাদ শুনে কি যে কাতর হয়ে গেছে মনটা। তখন থেকেই নিরো আর তার দুই সঙ্গীর জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। ঈশ্বর ওদের আত্মার শান্তি করুন।’

‘তা তো করবেনই, আপনি যে রেভারেন্ড। কেন পুরস্কারই আপনি চাননি আমার কাছে, তবু আপনাকে পুরস্কৃত করতে চাই।’

‘না না,’ জোর প্রতিবাদ করল বব। ‘আমি কিছু চাই না। লোকগুলো মারা, গেল আমার কারণে, এই দুঃখই ভুলতে পারব না। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি শুধু, এর জন্যে পুরস্কার নিতে পারব না।’

হাসলেন ওয়ার্ডেন। ‘ঠিক এই কথাই আশা করেছিলাম আমি। আপনার মত একজন ভাল মানুষকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে গবেষ হচ্ছে আমার। আপনাকে বিশ্বাস করা যায় এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন আপনি। খোঁয়াড়ে বন্দি হয়ে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই আপনার। অফিসের পাশের ঘরটা আপনার জন্যে ঠিক করে দিয়েছি আমি। শুধু যে ট্রাস্ট হিসেবে কাজ করবেন, তা ময়, আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট বানিয়ে নিলাম আমি আপনাকে। আপনি একজন কয়েদী, এ কথাটা মনে রাখতেই হচ্ছে আমাকে। তবে অন্য সব কয়েদীর মত ব্যবহার করা হবে না আপনার সঙ্গে। অনেকখানি স্বাধীনতা দেয়া হবে। তেমন প্রয়োজনে আপনাকে শহরেও পাঠাব আমি। জানি, ফিরে আসবেনই। পালানোর এতবড় সুযোগ যে লোক হাসিমুখে ছেড়ে দিতে পারে তাকে বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই আমার। এখন আসুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।’

একটা দরজা খুলে দিলেন তিনি। সরে দাঁড়ালেন ববের ঢোকার জন্যে। ঘরটা অফিসের চেয়ে ছোট, তবে ববের সেলের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বড়। জানালায় শিক নেই। দেয়ালে ছবি ঝোলানো রয়েছে, মেঝেতে কাপেট। ইলেক্ট্রিক ইটার আছে, একটা রেডিও আছে, আর আছে কফির জন্যে একটা হট-প্লেট। ইজি চেয়ার আছে। বেশ বড় একটা ডেস্কের ওপাশে রয়েছে সুইভেল চেয়ার। ঘরটা ববের অফিস। পাশে আরও একটা ঘর। সেটা বেডরুম। লাগোয়া বেশ সুন্দর একটা বাথরুম আছে।

‘পছন্দ হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করলেন ওয়ার্ডেন।

‘আমার জন্যে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে,’ গন্তব্য হয়ে বলল বব। ‘আমি এ সব চাই না।’

ফুলে উঠলেন ওয়ার্ডেন। এই লোকটার আচরণ ক্রমেই মুক্ত করছে তাকে। ‘আর কিছু করতে হবে কিনা আপনার জন্যে তা-ই বলুন।’

‘আরও? এর বেশি আরও? তবে হ্যাঁ, একটা কাজ করতে পারেন।’

‘কি?’ আগ্রহী হয়ে জানতে চাইলেন ওয়ার্ডেন।

‘আম্মাকে এখানে পাদ্রীর কাজ করার সুযোগ দিলে বাধিত হব। আমার সঙ্গী আসামীদেরকে আমি ঈশ্বরের বাণী শোনাতে চাই। তাদের মনে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে চাই। আমার বিশ্বাস,’ বাইবেলটা বুকে চেপে ধরল বব। ‘এর ভেতরের ভাল ভাল কথা শুনলে ওরাও অনেক ভাল হয়ে যাবে।’

‘অবশ্যই শোনাবেন,’ অনুমতি দিয়ে দিলেন বব। ‘ওই চোর আর ডাকাতগুলো যদি কিছুটা ভাল হয়, আমার ক্ষতি কি?’

সন্তুষ্ট হয়ে অফিসে রওনা হতে গিয়ে ঘুরলেন ওয়ার্ডেন। বললেন, ‘ও, হ্যাঁ, আরেকটা কথা। আপনার ডেস্কে একটা বোতাম লাগানো রয়েছে। টিপলেই একজন গার্ড আসবে। আপনার যে কোন আদেশ পালন করার নির্দেশ দিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।’

দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন ওয়ার্ডেন।
সুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসল বব। বোতাম টিপল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল
গার্ড।

‘আমার নাস্তা,’ বব বলল।
‘কফি আর রোলস?’
‘না। রুটি আর পানি।’

হাঁ হয়ে গেল গার্ড। একটা মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইল কয়েদীর দিকে।
তারপর বেরিয়ে এল। তার ওপর আদেশ রয়েছে ওয়ার্ডেনের, এই কয়েদী যা চায়
তাই দিতে হবে।

কৃৎসিত মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়ে আরাম করে চেয়ারে হেলান দিল বব।
নিজের চালাকির প্রশংসায় নিজেই পঞ্চমুখ হলো মনে মনে। আসল কাজটা হয়ে
গেছে। এইবার শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা।

শুকনো রুটি কোনমতে চিবিয়ে পানি দিয়ে গিলল বব। বেরতে হলে এ ভাবে
আরও কিছুদিন কষ্ট করতে হবে তাকে। নিরোকে না পেলে এখানে পৌছতে
পারত না সে। নিরো তাকে সাহায্য করতে চেয়ে মন্ত ভুল করেছিল। জীবন দিয়ে
তার প্রায়শিক্ত করতে হয়েছে। তাতে কিছুই এসে যায় না ববের। ওয়ার্ডেনকে
জানিয়ে দিয়ে ঠিক কাজটাই করেছে। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। নিরো মরলেই
তার কি, তার সঙ্গীরা সলিটারিতে গেলেই বা তার কি?

সলিটারি হলো একটা জীবন্ত কবরখানা। ওখানে যাদেরকে পাঠানো হয়,
তারা কোন সঙ্গীর মুখ দেখে না, কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না, যে ঘরে রাখা
হয় সেটা একজন মানুষের জায়গা হয় ওরকম একটা বাক্সের সমান, শুধু রুটি আর
পানি খেয়ে বাঁচতে হয়। পালানোর চেষ্টা করা একটা সাংঘাতিক অপরাধ। ওরকম
অপরাধীদের কোন সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় না। এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচার একটাই
উপায়। পাষাণ দেয়ালে বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে আত্মহত্যা করা।

এ সব ভাবনা একটুও বিচলিত করল না ববকে। হেলান দিয়ে আয়েশ করছে
চেয়ারে। তবে যত আরামেই থাকুক, সে এখনও কয়েদী। আর তার শক্তিরা
রয়েছে মুক্ত। আরামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হোক না সেটা নিউ গিনিতে। দাঁতে দাঁত
চেপে আরেকবার প্রতিজ্ঞা করল বব, যে করেই হোক, বেরিয়ে যাবেই সে।
প্রতিশোধ নেবেই। তিন গোয়েন্দাকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত শান্তি নেই তার।

দু'দিন পরে ওয়ার্ডেন ববকে ডেকে পাঠালেন। শহরে গিয়ে কয়েদীদের রেশন
নিয়ে আসতে বললেন।

চোখ পড়ল ববের পোশাকের ওপর। ‘ওসব কয়েদীর পোশাক খুলে ফেলুন
তো,’ বললেন তিনি। ‘আমার এক সেট কাপড় দিচ্ছি। দেখুন, লাগে কিনা
ছোটই হবে।’ ববের বিশাল কাঠামোর ওপর চোখ বোলালেন তিনি নিজেও বেশ
বড় শরীরের মানুষ, তবে ববের চেয়ে ছোট, কোন সন্দেহ নেই। ‘এই যে লিস্ট,
আর এই যে টাকা। পাঁচশো লোকের খাবার আনতে হবে।’

অনীহা দেখিয়ে বলল বব, ‘এত বড় দায়িত্ব দিচ্ছেন আমাকে?’
‘আপনি আমার অ্যাসিস্টেন্ট।’

‘তা হোক। টাকাটা আমাকে নিতে বলবেন না, প্রীজ। লোভ জাগানোর মত কোন জিনিসেই আর হাত ছোঁয়াতে চাই না আমি। চিঠি লিখে দিন, জিনিস নিয়ে আসি। বিল দিয়ে টাকা নিয়ে যাক ওরা।’

‘হাত ছোঁয়ালেও কোনদিনই আর খারাপ হবেন না আপনি,’ হেসে বললেন ওয়ার্ডেন। টাকা নিয়ে যান। বাকিতে কেনার নিয়ম নেই জেলখানার।’ এক টুকরো কাগজ ববের দিকে বাঢ়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘আর এটা আপনার পাস। গেটে দেখালেই গার্ডেরা ছেড়ে দেবে। জিনিস কিনতে যত দেরি হয় হোক। তাড়াভুড়া করবেন না। দরকার হলে একটু আনন্দও করে আসতে পারেন। এই যেমন সিনেমা দেখা...’

‘তওবা! তওবা!’ আধ হাত জিভ বের করে ফেলল বব। দাঁতে কাটল। শিউরে উঠল। ‘ওরিক্বাবা, আর বলবেন না! মাপ চাই! যে জীবন ফেলে এসেছি, আর কোনদিন তাতে চুকতে চাই না। ঠিক আছে, দিন, কি কি আনতে হবে। চট করে গিয়ে নিয়ে আসি। বাইরের চেয়ে এখন ঘরে বসে থাকতেই ভাল লাগে আমার। বাইবেল আর স্টীলের যে এত আনন্দ, আগে যদি জানতাম!’

সেদিন বাজারে গেল আর এল বব। জেল থেকে বেরোতেই অবশ্য পেছনে যে চর লেগেছে টের পেয়েছে। ওয়ার্ডেন লাগিয়েছেন, বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। তাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা দেখতে চেয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস পুরোপুরি অর্জন করল সে।

আট

কয়েক দিন পর এল পালানোর সুযোগ। ববকে আবার বাজারে যেতে বললেন ওয়ার্ডেন। গেটে পাস দেখিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে জেলখানার সীমানা থেকে বেরিয়ে এল বব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি নেয়ার ভুলটা করল না। আধ মাইল পায়ে হেঁটে এগোল। কেউ অনুসরণ করছে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল। তারপর একটা বাস্তু চৌরাস্তার কাছে এসে ট্যাক্সি নিল। এয়ারপোর্টে যেতে বলল। আরাম করে হেলান দিয়ে বসল সীটে। পকেটে হাত বোলাল একবার। ফুলে রয়েছে নোটের বাংল।

এয়ারপোর্টে পৌছে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে তেতরে চুকে গেল সে। সোজা ৮লে এল কাউন্টারে। জিঞ্জেস করল, ‘পোর্ট মর্সবির প্লেন কখন?’

ডিপারচার বোর্ডের দিকে তাকিয়ে ক্লার্ক জানাল, ‘পনেরো মিনিটের মধ্যেই গাড়বে।’

‘ফাস্ট ক্লাসের একটা টিকেট, প্রীজ।’

‘নাম?’

‘হামবার ডাবলিন।’

বানান করে করে লিখল ক্লার্ক। 'লাগেজ?'
'নেই।'

মুখ তুলল ক্লার্ক। অবাক হয়েছে। বব বুঝতে পারল, ব্যাখ্যা দরকার। কিছুটা কৈফিয়তের সুরেই বলল, 'আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ও। ভাল।' টিকেটের দাম জানাল ক্লার্ক। মিটিয়ে দিল বব। গুনে নিয়ে টিকেট দিয়ে ক্লার্ক বলল, 'প্লেনে লোক ওঠানো শুরু হয়েছে। ছন্দোর গেট দিয়ে চলে যান।'

গেট পেরিয়ে ওপাশে এসে হেঁটে চলল বব। ফিরে তাকিয়ে দেখল মেইন গেটের কাছে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে ট্যাক্সি চালক, তার ফেরার। একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না বব। দ্রুত চতুর পেরিয়ে এসে উঠে পড়ল বিমানে।

জানালার ধারে সীট পড়েছে ববের। তাকিয়ে দেখল, আর ধৈর্য রাখতে পারেনি ট্যাক্সি চালক। ভেতরে ঢোকার জন্যে তর্ক করছে গেটম্যানের সঙ্গে। কিন্তু টিকেট ছাড়া তাকে কিছুতেই চুক্তে দিতে রাজি নয় গেটম্যান। মুখ তুলে তাকিয়ে ববকে দেখতে পেল ড্রাইভার। ঘুসি দেখাল। মুচকি হেসে হাত নাড়ল বব।

আকাশে উড়ল বিমান। মুখ ঘোরাল উত্তরে, ছেট ব্যারিয়ার রীফের দিকে। অনেকগুলো দ্বীপ পেরিয়ে এল বিমান। তারপর যেন মেঘের ভেতর থেকে উদয় হলো বিশাল পর্বতের চূড়া। নিউ গিনি। উপকূলের পোর্ট মর্সবি শহরের বিমান ঘাঁটিতে ল্যান্ড করতে চলেছে বিমান। বব বুঝতে পারছে, তার দেরি দেখে এতক্ষণে নিশ্চয় ভাবনা শুরু হয়ে গেছে ওয়ার্ডেনের। আরেকটু পরেই পুলিশকে সতর্ক করে দেবেন তিনি। খোজাখুজি শুরু হয়ে যাবে।

মর্সবি শহরটা চেনে বব। আগে এসেছিল। পুলিশের ভয় না থাকলে সোজা হোটেলে চলে যেত সে। এখন সেটা উচিত হবে না। সকালের আগেই হোটেলে হানা দেবে পুলিশ।

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল বব।

'কোন হোটেল? জানতে চাইল ড্রাইভার।

'হোটেল নয়। বন্দরে।'

মেরিনার একধারে অসংখ্য ছোট ছোট জলযান মোঙ্গর করে আছে। চাঁচার অফিসে এসে চুকল বব। 'একটা স্পীড বোট চাই। হাই পাওয়ারড ইঞ্জিন। কেবিন থাকতে হবে।'

'ওই যে, ওটা হলে কেমন হয়?' হাত তুলে দেখাল ক্লার্ক।

'দেখতে তো ভালই। স্পীড কত?'

'বিশ নট।'

'ট্যাংক বড় তো?'

'কত দূর যাবেন?'

'ট্রোব্রিয়ান্ড আইল্যান্ড,' মিথ্যে কথা বলল বব।

'যেতে পারবেন। ট্যাংক ভরা আছে।'

'ভাড়া কত?'

'রোজ ষাট ডলার।'

‘ফেয়ার এনাফ। তবে আগে একবার চালিয়ে দেখতে চাই। সম্ভব?’

‘আধঘণ্টা সময় দিতে পারি। তাতে যদি হয় নিয়ে যেতে পারেন। কি নাম আপনার?’

‘রেভারেন্ড হামবার ডাবলিন।’

‘ও, আপনি পাদ্রী,’ শুন্ধা দেখা দিল ক্লার্কের চোখে। ‘তাহলে তো কথাই নেই। নিয়ে যান, ফাদার। যতক্ষণ খুশি চালিয়ে দেখুন। পছন্দ হলে তবেই নেবেন।’

বোটে উঠল বব। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। যানটাকে বের করে নিয়ে এল জেটির বাইরে। সরে চলে এল অনেক দূর। যখন মনে করল ক্লার্ক আর দেখতে পাবে না তখন মুখ ঘুরিয়ে চলতে শুরু করল ট্রোবিয়ান্ড আইল্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে। নিউ গিনির উপকূল ধরে কোরাল সাগর দিয়ে।

এখন তার একমাত্র চিন্তা, অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ-পেট্রলের আওতার বাইরে চলে যাওয়া। নিউ গিনির এই পূব অংশটা অস্ট্রেলিয়ান সরকারের দখলে। পশ্চিম অংশ ইন্দোনেশিয়ার। ওখানে চুকে পড়তে পারলে আর ভাবনা নেই। এতই বুনো জায়গাটা, ইন্দোনেশিয়ান পুলিশ আসেই না। আর অস্ট্রেলিয়ান পুলিশেরও ঢোকা ওখানে বেআইনী।

সে নিশ্চিত, তিন গোয়েন্দারা ওদিকেই গেছে। কারণ ওরা নানারকম জীব-জন্ম ধরতে চায়। ওসব জানোয়ার ওদিকটাতেই বেশি। তা ছাড়া আমেরিকা থেকে বেরোনোর আগে খোঝখবর করে যা বুঝেছে, তাতে কিশোর, মুসা আর রবিনের ওদিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অস্ট্রেলিয়ার এই অঞ্চলে যৌবনে বহুদিন কাটিয়ে গেছে বব। ভালমতই চেনে এদিকের অঞ্চল। স্থানীয় আদিবাসীদের ভাষাও জানে। বিশ মাইল গতিতে বাইশ ঘণ্টার মত লাগবে তার ইন্দোনেশিয়ার সীমান্তে পৌছতে। তারমানে সেদিন সারারাত চলতে হবে, পরদিনও প্রায় সারাদিন। ঘুম এখন তার জন্যে হারাম।

আরেকটা ব্যাপার। খাবার। বোটে নেই। বাইশ ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে হবে তাকে। ইন্দোনেশিয়ায় চুকে আদিবাসীদের কোন গ্রামে চুকতে পারলে তারপর খাবার জুটবে কপালে। গ্রামে ঢোকাটা ওখানে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। জংলীরা অনেক জায়গায়ই নরখাদক রয়ে গেছে আজও। অস্ট্রেলিয়া আর ইন্দোনেশিয়ান সরকার মিলে অনেক চেষ্টা করেও পুরোপুরি ঠেকাতে পারেনি। কাজেই খাবার জোগাড় করতে গিয়ে নিজেই খাবার হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। তবে একটা ভরসা, তাকে খাবার না-ও বানাতে পারে। কারণ সে বয়স্ক। মাংস তেমন ভাল হবে না। শ্বেতাঙ্গরা বেশ নোনতা। তার ওপর রয়েছে তামাকের কড়া গন্ধ। খুব একটা পছন্দ করে না জংলীরা, জানা আছে তার। তবু, বলা যায় না, বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে থাকে যদি ওরা...

রাতে ঘুম তাড়ানো একটা মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়াল তার জন্যে। তবু, সজাগ রাইল। বোট চালাল একনাগাড়ে। দুপুরের দিকে চুকল টোরেস স্ট্রেইটে। থার্সডে আইল্যান্ড পেরিয়ে এল। বিকেলের দিকে স্বন্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পৌছে গেছে অ্যারাফুরা সাগরে। এটা ইন্দোনেশিয়ার সীমানা। মেরাউকে তেল নেয়ার জন্যে

থামল সে। তবে খাবার কিনে আনার সময় নেই। অস্ট্রেলিয়ার সীমান্তের বেশি কাছাকাছি রয়েছে। বলা যায় না, ইন্দোনেশিয়ান পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে হানা দিয়ে বসতে পারে অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ। তেল ভরেই বন্দর থেকে পালাতে হলো ববকে।

আরেকটু এগিয়ে অনুমান করল, এখানে আশেপাশেই কোথাও রয়েছে কিশোররা। অনেক নদী আছে এখানে। ওগুলোরই কোনওটা ধরে চুকেছে ধীরে ধীরে বোট চালাল সে। প্রথম যে গ্রামটা চোখে পড়বে তাতেই নামবে। বিয়ান পেরিয়ে এসে একটা ছোট গ্রাম দেখতে পেল। ওখানকার গ্রামবাসীরা তার সাদা চামড়া আর বোটের দিকে এতই কৌতুহলী চোখে তাকাতে লাগল, জিজ্ঞেস না করেই বুঝতে পারল ওখানে আসেনি তিন গোয়েন্দা। তাকে ওরা দেবতা ভেবে বসল। কাজেই ববও এমন আচরণ করতে লাগল যেন সে সত্যিই দেবতা। ওদেরকে বোঝাল দেবতারও খাবার দরকার হয়। ওদের খাবার আনার নির্দেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে খাবার নিয়ে হাজির হলো ওরা। খাবারের চেহারা দেখেই খিদে নষ্ট হয়ে গেল ববের। ধোঁয়ায় সেন্দু করা ঘাসফড়িং। রক্তে ভিজিয়ে সেন্দু করা শুঁয়াপোকা। পচা গাছের গুঁড়িতে এক রকম কিলবিলে সাদা পোকা পাওয়া যায়, কয়লায় ঝলসে এনেছে ওগুলোও। রক্তের যে ঝোলটা করা হয়েছে, সেটা মানুষের না জানোয়ারে তা-ও বোঝার উপায় নেই।

তবু খিদে হলো খিদে। খালি পেটে থাকার চেয়ে ওসবই খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বব। চোখ বন্ধ করে কোনমতে গিলে নিল নদীর পানি দিয়ে। জেল থেকে বেরোনোর পর এই প্রথম তার মনে হলো, যতটা ভেবেছে আসলে ততটা বুদ্ধিমান বোধহয় নয় সে। তাহলে জেলখানায়ই থাকত, আর ইচ্ছেমত খাবার খেতে পারত। অখাদ্য কুখাদ্য এই তো সবে শুরু, আরও কত গিলতে হবে কে জানে।

এখানে থাকার আর কোন মানে নেই। দেবতা চলে যাচ্ছে দেখে তাকে ঠেকাতে উদ্যত হলো লোকেরা। তাদেরকে ভজিয়েভজিয়ে অনেক কষ্টে এসে বোটে উঠল সে। তারপর আর একটা মুহূর্তও ওখানে নয়। সরে চলে এল যত দ্রুত পারল।

রাতে নদীর মাঝখানে বোট নোঙ্র করে ঘুমাল। ভোরের দিকে মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হলো। উঠে পড়ল বব। আবার রওনা হলো। নদীর তীরে যত গ্রাম দেখল সবগুলোতে থেমে কয়েকজন বিদেশীর খোঁজ নিল। পাওয়া গেল না। যতক্ষণ না নদীর পাড়ে একজন ওঝার সঙ্গে দেখা হলো।

আদিবাসীদের ভাষায় জিজ্ঞেস করল বব, ‘কয়েকজন বিদেশী মানুষকে দেখেছ? একটা জাহাজে করে এসেছে?’

সরু হয়ে এল ওঝার চোখের পাতা। ‘কি দরকার তোমার? ক্ষতি করবে না ভাল করবে?’

একটু ভেবে জ্বাব দিল বব, ‘ক্ষতি।’

হাসল ওঝা। ‘তাহলে বলতে পারি। এর পরের উপত্যকাটায় রয়েছে ওরা। আইল্যান্ডের নদীর উজানে।’

‘তুমি কি করে জানলে?’

‘আমি ওদের দেখেছি। ওই গাঁয়ের ওঁকা ছিলাম আমি। গাঁয়ের লোককে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে ওরা। ফলে আমাকে পালাতে হয়েছে। ওদেরকে কি করতে চাও তুমি?’

‘খুন।’

‘ভাল। মন্ত্র পড়ে তোমাকে ফুঁ দিয়ে দেব আমি যাতে কোন ক্ষতি না হয় তোমার। ওদেরকে তো অভিশাপ দিয়েই রেখেছি। কুড়াল আর তীর-ধনুকও দেব, আর একটা বল্লম।’

একটা রিভলভার পেলে এখন সব চেয়ে বেশি খুশি হত বব। নেই যখন কি আর করা। ওসব অন্ত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পাথুরে উপকূল ধরে আইল্যান্ডে নদীর উজানে চলল সে।

পথে আর কোন গ্রাম চোখে পড়ল না। প্রথম যেটা দেখা গেল সেটা অনেক বড়। দূর থেকেই লোকের কলরব কানে এল। একটা খাঁড়ির ভেতরে বোট চুকিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গুড়ি মেরে এগোল বব।

গাঁয়ের কাছাকাছি এসে নদীর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল জাহাজটা। সাইক্লোন।

না, আর কোন সন্দেহ নেই। ওঁকা ঠিকই বলেছে।

যাক, অবশ্যে শেষ হলো তার খোঁজা। শক্রদের পেয়েছে। এখন প্রতিশোধ নিতে হবে। আরাম করে একটা ঝর্নার ধারে লুকিয়ে বসে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শুরু করল সে।

নয়

‘ভাবতেই জানি কেমন লাগে,’ কিশোর বলল। ‘এই যে মানুষগুলো, আমাদেরই মত হাত-পা-চোখ-মুখ। অথচ স্বভাব সেই দশ হাজার বছর আগের পাথরের যুগের মানুষের মত। আমাদেরই জাতভাই, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।’

‘না হলেও করতেই হবে,’ রবিন বলল।

নদীতে সাঁতার কাটছে দু’জনে। সামান্য দূরে পানিতে মুখ ডুবিয়ে ভেসে গয়েছে মুসা। কুমিরের ভয় আর করে না এখন ওরা। অভ্যাস হয়ে গেছে। সহজ সরল আদিবাসীদের সহজ ভাষা অনেকখানি শিখে নিয়েছে। তাদের সঙ্গে এখন নথা বলতে পারে। গাঁয়ের মোড়ল নগোর সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। ওরা যে জন্ম-জানোয়ার ধরতে এসেছে, প্রয়োজন, এ কথাটা অনেক কষ্টে তাকে বোঝাতে পেরেছে কিশোর।

পর্যাদন নগো আর তার কয়েকজন লোক নিয়ে জানোয়ার ধরতে বেরোল তিন গোয়েন্দা।

বাইরের জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানে না নগো। কিন্তু তার নিজের এলাকা খুব ভাল চেনে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে প্রতিটি গাছের নাম, ফুলের নাম বলে যেতে থাকল তার নিজের ভাষায়। বলে আর সেটার ইংরেজি নাম জিজ্ঞেস করে কিশোরকে, বলে দেয় কিশোর। লোকটার স্মরণশক্তি খুব ভাল। ঠিক মনে রাখছে। কিছু কিছু নামের উচ্চারণ নিয়ে অবশ্য অসুবিধে হচ্ছে, এই যেমন ইউক্যালিপ্টাস। অনেক কষ্টে বলতে পারছে আইক-আ-লুপ-টাস। তবে কিশোরের ধারণা, ভালই বলতে পারছে নগো। কারণ সে নিজেও স্থানীয় নাম নিয়ে অসুবিধেয়ই পড়ে যাচ্ছে, যেমন, ‘প্যারাফিটিকাপ’ উচ্চারণ করছে যেটাকে সেটাকে অন্য ভাবে উচ্চারণ করে জংলীরা।

জানোয়ার ধরার জন্যে নানা রকম সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে ওরা। বস্তা, দড়ি, শক্ত জাল। বন্দুক আনেনি। ওরা ধরতে এসেছে, খুন করতে নয়। তবে একটু পরেই আনেনি বলে আফসোস করতে লাগল কিশোর-মুসা, যখন নিউ গিনির ভয়ঙ্কর দুই প্রাণীর সামনে পড়ল।

একটার নাম তাইপান। নিউ গিনির দেড়শো প্রজাতির সাপের মধ্যে সব চেয়ে বিষাক্ত এবং বৃহত্তম সাপ।

আরেকটা তো যেন উঠে এসেছে রূপকথার বইয়ের পাতা থেকে, কিংবা প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবী থেকে। জীবন্ত এক দ্রাগন। সবই ঠিক আছে, পারে না শুধু রূপকথার গল্পের মত মুখ দিয়ে আগুন বের করতে। প্রথমবার দেখে বিজ্ঞানীরা তো বিশ্বাসই করতে পারেননি ওই জীব আজও বেঁচে আছে পৃথিবীতে। ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে পদচারণা ছিল ওই জীবের, জানতেন তাঁরা, ফসিল পেয়েছেন। একসময় অনেক জায়গাতেই বাস করত ওরা। এখন নিউ গিনির দু'চারটে জায়গা বাদে আর কোথাও ওদের দেখা মেলে না। প্রথম দ্রাগনটা আবিশ্কৃত হয় কমোডো নামে ছোট একটা দ্বীপে, সে-জন্যেই নামকরণ করা হয়ে যায় কমোডো দ্রাগন। গিরগিটির এক দানবীয় প্রজাতি।

তবে বন্দুক আনলেও লাভ হত না। ওই জীবকে মারতে আসেনি ওরা, ধরতে এসেছে। নিয়ে যেতে পারলে অনেক দামে বিক্রি করতে পারবে।

মানুষের দিকে ফিরেও তাকাল না জীব দুটো। একে অন্যকে খুন করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় ব্যস্ত।

সাপটার শরীর বাদামী আর হলুদ। দশ ফুট লম্বা। পেঁচিয়ে ধরেছে দ্রাগনের শরীর। নরম একটা জায়গা খুঁজছে যেখানে ছোবল দিতে পারে। কিন্তু সে-রকম জায়গা পাচ্ছে না। শক্ত অঁশে ঢাকা দ্রাগনের চামড়া। প্রায় ইস্পাতের মতই শক্ত। দেখতে কুমির আর বিশাল গুঁইসাপের মিশ্রণ। সাপের জিভের মত চেরা হলদে রঙের জিভটা বার বার বিদ্যুৎ স্ফূলিঙ্গের মত যেন ছিটকে বেরোচ্ছে আর চুকচ্ছে মুখের ভেতরে। বড় বড় চোখা দাতগুলো কাঁমড় বসাতে চাইছে সাপের পিছিল শরীরে। কুমিরের মতই মাংসাশী। সাপটাকে মারতে পারলে চমৎকার একটা ডিনার হবে।

সাপটা যতই ছোবল মারছে ততই রেগে যাচ্ছে দ্রাগন। ভীষণ হিসিয়ে উঠে বাতাস গিলে ফুলিয়ে প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলেছে শরীরটা। বিশাল লেজটা নাড়ছে

এদিক ওদিক। সাপের চামড়ায় দাঁতের সঙ্গে সঙ্গে নখও বসাতে চাইছে।

ভালমত লড়াই চালানোর জন্যে পেছনের পা আর লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ড্রাগন। বারো ফুট উঁচু। সহজেই হরিণ কিংবা বড় বুনো শুয়োরকে খুন করে ফেলতে পারে ওরা। তাইপানের ভাগ্য অনিশ্চিত। হেরে যাওয়ার সঞ্চাবনাই বেশি। তবে এখনও বলা যায় না কিছুই।

‘কেউ কাউকে ছাড়বে না,’ কিশোর বলল। ‘তার আগেই আলাদা করে দেয়া দরকার। চারজনে সাপের লেজ চেপে ধরবে, আর চারজনে ড্রাগনের। টেনে সরিয়ে নিতে হবে ওগুলোকে। মুসা, তুমি আর রবিন সাপটাকে বস্তাস্থ ভরার চেষ্টা করো। আমি ড্রাগনের দায়িত্ব নিচ্ছি।’

কয়েকবার করে নির্দেশ দিল নগো। কিন্তু নড়ছে না লোকগুলো। মারাত্মক জানোয়ারগুলোকে যতটা ভয় তার চেয়ে বেশি ভয় ওগুলোর ভেতরের শয়তান প্রেতাত্মাকে। ওদের কাছে যে কোন খারাপ জীবের মানেই হচ্ছে ওর ভেতরে দুষ্ট প্রেত রয়েছে।

ওদের ভয় ভাঙ্গানোর জন্যে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। দু’জন চেপে ধরল সাপের লেজ, আরেকজন ড্রাগনের। টানতে শুরু করল।

আবার নির্দেশ দিল নগো। ভয় পুরোপুরি কাটল না লোকগুলোর। ভয়ে ভয়ে এগোল জীবদুটোর দিকে।

শক্তিশালী লোক ওরা। কিন্তু টেনে আলাদা করতে পারছে না জীব দুটোকে। যেন আঠা দিয়ে সেঁটে দেয়া হয়েছে পরম্পরার শরীর। মিনিট দশেক টানাটানির পর সরে এসে বিশ্রাম করতে বসল লোকগুলো। হাঁপাচ্ছে।

ধরে রেখেছে এখনও কেবল কিশোর, মুসা আর রবিন। মুসা আর রবিনের অতটা ভয় নেই, কারণ সাপের লেজ বিপজ্জনক নয়। বিপদটা হলো কিশোরের। ড্রাগনের লেজ আর মুখ দুইই সমান ভয়ঙ্কর। এ হলো কুমিরের জাতভাই, যে কুমিরের লেজের এক বাড়ি সহজেই চিত করে দিতে পারে মানুষকে। লেজ দিয়ে বাড়ি মেরে গঙ্গারকেও নদীর কিনার থেকে পানিতে ফেলে দিতে পারে কুমির। সুতরাং ড্রাগনের লেজের ক্ষমতাও অনুমান করা যায়।

একেবারে নিখর হয়ে মাটিতে পড়ে আছে লেজটা। চেপে ধরে টানছে কিশোর। শান্ত হয়ে অনেকক্ষণ একভাবে পড়ে থাকায় আরও ভাল করে ধরতে গেল সে, আর তখনই তাকে চমকে দিয়ে নড়ে উঠল ওটা। এমন জোরে বাড়ি মারল উড়ে গিয়ে মাটি থেকে আট ফুট উঁচু একটা ডালের ওপর পড়ল কিশোর।

ডাল থেকে ময়দার বস্তার মত মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। শ্বাস নিতে পারছে না, হাঁ করে রয়েছে। শরীরের অনেক জায়গায় ছিলেছড়ে গেছে ড্রাগনের লেজের আঘাতে আর ডালের খোঁচায়। মনে হলো জ্বান হারিয়ে ফেলবে। হারাল না কেবল মনের জোরে। উঠেও দাঁড়াল একসময়। ভারী নিঃশ্বাস ফেলছে। টিপেটুপে দেখতে লাগল হাড় ভেঙেছে নাকি কোথাও। মনে মনে বলল, ভাগিয়স, মাত্র বারো ফুট লম্বা ওটা। ছয় কোটি বছর আগের জাতভাইদের মত চৰিশ ফুট নয়। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে দোতলার সমান হয় না। ওরকম দানবের মেজের বাড়ি থেলে আর বাঁচতে হত না এতক্ষণ।

তবে এই একতলার সমানটাই যেন খুন করে ফেলতে পারে তাকে, আন্দাজ করতে পারেনি। কেবল সাপটার সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত রয়েছে বলেই এদিকে নজর দিতে পারছে না। নইলে এটাও সহজেই খুন করে ফেলতে পারে তাকে।

দুর্বল ভঙ্গিতে একটা ডাল আঁকড়ে ধরে চোখ মুদল কিশোর। মাথা পরিষ্কার আর স্নায়ুগুলোকে শান্ত করতে চাইছে। দৌড়ে এল মুসা আর রবিন।

মুসা জিজ্ঞেস করল, ‘এখানে এলে কি করে?’ সাপের লেজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ব্যাপারটা ওদের চোখে পড়েনি।

‘আমি কি আর আসতে চেয়েছি। ড্রাগনটা পাঠাল।’

‘লাগেনি তো কোথাও?’

‘না, এই একটু আঁচড়। তেমন কিছু না।’

একটা বুনো খেজুর গাছ খুঁজে পেয়েছে গাঁয়ের লোকে। বিশ্রাম নিতে বসে সেই ফল খেতে লাগল। কিশোরদের কাছে কয়েকটা ফল নিয়ে এল নগো। খেয়েদেয়ে শরীরে শক্তি করে নিয়ে আবার আগের কাজে ফিরে গেল সবাই।

আন্তরিক ইচ্ছে থাকলে হয়তো কাজটা এত কঠিন লাগত না গাঁয়ের লোকের কাছে। ভয়টা বেশি পেয়েছে তার কারণ মেঘে ঢেকে ফেলেছে আকাশ। ওদের ধারণা মেঘের মধ্যে রয়েছে হাজারো শয়তানের বাস। রোদ ঢেকে দেয়াতে বিচ্ছিন্ন হায়া পড়েছে বনতলে। আধো অঙ্ককারে ওই দুই ‘প্রেতের’ সঙ্গে যুদ্ধ করা এখন একটা ভয়ানক ব্যাপার।

তব আর শয়তান তাড়ানোর জন্য গলা ফাটিয়ে গান শুরু কুরল লোকগুলো। সেই সঙ্গে অহেতুক চিৎকার। তার সাথে মিলিত হলো সাপ আর ড্রাগনের হিসহিসানি। এরকম অস্তুত কলরব কমই শুনেছে ছেলেরা।

একসারিতে লেজ চেপে ধরে ওগুলোকে টানছে সবাই। দড়ি টানাটানির মত করে। কাজেই আলাদা যখন হলো জীবদুটো, সারির একেবারে মাথার কাছে পেল কিশোর আর মুসাকে। পলকে ড্রাগনের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মুসার ওপর। তীক্ষ্ণ হিসহিসানি তুলে খাড়া হয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল তাকে। পিঠে বিঁধে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ নখ। টেনে তুলে নিল ওপরে। চোখে চোখে তাকাল।

মুসার মনে হলো কৃৎসিত হাসিহাসছে ড্রাগনটা। জিভ বের করে দিচ্ছে।

‘বেশ,’ মুসা ভাবল। ‘তুমি পারলে আমি পারব না কেন?’ সে-ও জিভ বের করে দিল ড্রাগনের দিকে। জীবটার একফুট লম্বা জিভের কাছে তারটা হাস্যকর রকম খুদে দেখাল।

ভারি মজা তো! তাকিয়ে রয়েছে গাঁয়ের লোকে। মানুষ আর ড্রাগনে এরকম ঝগড়াবাঁটি। দাঁত দেখাল জীবটা। দুই ইঞ্চি লম্বা একেকটা দাঁত, তীক্ষ্ণধার। নিজেরগুলো দেখিয়ে আর লজ্জা পেতে চাইল না মুসা। ওই দাঁতের সঙ্গে তার দাঁতের কোন তুলনাই হয় না। তবে একটা কাজ সে করল। আরেকবার ড্রাগনটা তার দিকে জিভ বের করে দিতেই কামড়ে ধরল সেটা।

জীবনে অনেক লড়াই করেছে জীবটা, অনেক ভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তবে এরকম হেনস্তা আর হয়নি। বাহুর বাঁধন চিল হয়ে গেল ওটার। মাটিতে খসে পড়ল মুসা। ড্রাগনটা ও হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে শুরু করল।

এত কষ্ট করার পর এত সহজে ছাড়ার ইচ্ছে নেই মুসার। নগোর সাহায্যে তারের একটা জাল খুলে নিয়ে চড়িয়ে দিল দানবটার ওপর। জালের একমাথা বেঁধে ফেলল গাছের সঙ্গে।

এত জোরে হিসহিস করতে শুরু করল দ্রাগনটা, এক মাইল দূর থেকেও শোনা যাবে। কামড়ে, দাপাদাপি করে জাল ছাড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। জালটা যেমন শক্ত, গাছটা আরও শক্ত।

‘ধরেছি! ধরেছি!’ কথাটা শেষ করতে পারল না মুসা। পিঠে এসে আঘাত করল কি যেন। তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যথা। পড়ে গেল সে।

দশ

এসব দেখার অবসর নেই কিশোরের। সে তখন লড়াই করছে সাপটার সঙ্গে। তাইপানের ঘাড় চেপে ধরে বস্তায় ঢোকানোর চেষ্টা করছে। তাকে সাহায্য করছে রবিন। কিন্তু দ্রাগনের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা রাখে যে জীব তাকে কি আর সহজে কজা করতে পারে? দু’জনেরই হাত গলেই অন্তুত কায়দায় পিছলে যাচ্ছে ওটা। একবার হাত থেকে ফসকালে আর বাঁচতে পারবে না জানে ওরা। বিষাক্ত ছোবলে মারা পড়বে। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে উঠল কিশোর। সাহায্য আসতে সময় লাগল। এরকম একটা ‘প্রেতে’র মুখোমুখি হতে চাইছে না কেউ।

শেষমেষ সাহস করে পাথরের কুড়াল হাতে এগিয়ে এল একজন। এক কোপে সাপের মাথাট আলাদা করে দেবে।

‘না না!’ চিৎকার করে উঠল কিশোর। ‘মেরো না! জ্যান্ত ধরব! বস্তায় ভরতে হবে!'

অবাক হলো লোকটা। এই বিদেশীগুলোকে বুঝতে পারে না। কি যে করতে চায় ওরা! তার মতে সবচেয়ে সহজ কাজ হলো এখন কোপ মেরে সাপের মাথা আলাদা করে ফেলা। তারপর ধড়টাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ঘলসে খেয়ে ফেলা। অনেক মাংস হবে। সারা গাঁয়ের লোক খেতে পারবে। তা না করে ওটাকে জ্যান্ত বস্তায় ভরার কি মানে?

কিছুই করছে না লোকটা। ওদিকে মুসা আর রবিনের অবস্থা কাহিল। কিছুতেই কাবু করতে পারছে না সাপটাকে। যে কোন মুহূর্তে হাত থেকে ছুটে গিয়ে ছোবল মেরে বসতে পারে। অবশ্যে ওদের সাহায্যে এগিয়ে এল ডিয়া। ওদেরই বয়েসী এক কিশোর। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

গাঁয়ের আর সবার মতই তাইপানকে ভয় করে সে। তবে তাই বলে এন্দেরকে তো আর মরতে দিতে পারে না।

সাপের লেজটাই বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে। চেপে ধরল ডিয়া। দ্রাগনের লেজের মধ্য এত শক্তিশালী নয় তাইপানের লেজ। তবু মানুষের জন্যে অনেক বেশি।

হঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিল ডিয়ার হাত থেকে। পর মুহূর্তে তার গোড়ালি পেঁচিয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা শুরু করল।

সাপের সঙ্গে আগে আর এভাবে লড়াই করেনি ডিয়া। ঘাবড়ে গেল। তবে পিছিয়ে এল না। দ্বিগুণ বিক্রমে প্রতিযোগিতা করতে লাগল। টেনে পা থেকে লেজটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল বস্তার ভেতরে। ছাড়ল না। ঠেলে ঢোকাতে শুরু করল বাকি শরীরটা। তাকে সাহায্য করল রবিন। সাপও কম যায় না। বস্তার ভেতরে চাবুকের মত বাড়ি মারতে লাগল লেজ দিয়ে। বস্তার ভেতরে-বাইরে জমে থাকা ধুলোর মেঘ উড়তে লাগল।

চুপ করে দেখছে গাঁয়ের লোক। সাহায্য করতে এগোচ্ছে না। বোকা ছেলেগুলো বোকামি করে যদি মরেই যায় তাতে তাদের কি, ভঙ্গিটা এমন।

সাপের শরীরের আরেকটু ওপরে চেপে ধরল ডিয়া। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বস্তার ভেতরে। বস্তার মুখটা ফাঁক করে রেখেছে রবিন। ঘাড় চেপে ধরে রেখেছে কিশোর। সাপের লেজটা আর বিরক্ত করতে পারছে না তাকে। শরীরটা আরেকটু ঢোকার অপেক্ষা করল সে। তারপর কায়দা করে মাথাটাও ঠেলে দিল বস্তার ভেতরে।

এরপর আর বিশেষ সুবিধে করতে পারল না তাইপান। বস্তার ভেতরে ঢুকতেই হলো তাকে। যতই লেজ নাড়ুক, হিসহিস করুক, কোন কিছুরই তোয়াক্তা করল না কিশোর, রবিন বা ডিয়া।

কাজ হয়ে গেছে ভেবে মুহূর্তের ঝন্মে ঘাড়ে তিল দিয়েছিল কিশোর, পলকে বস্তার ভেতর থেকে মুখ রের করে ফেলল তাইপান। ছোবল মারল কিশোরকে সই করে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে চট করে হাতটা বাড়িয়ে দিল ডিয়া। সাপের দাঁত এসে বিঁধল তার তালুতে।

ঘাড় ধরে টেনে সাপের মুখটা সরানোর চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। বেশির ভাগ সাপ ছোবল মারার পর মুখ সরিয়ে নেয়। কিন্তু তাইপান তা করে না। দাঁত বিঁধিয়ে রাখে। শক্তর শরীরে যত বেশি বিষ ঢালতে পারে ততই যেন আনন্দ।

আবার এগিয়ে এল কুড়ালওয়ালা লোকটা। কিশোর প্রায় বলেই ফেলেছিল কোপ মেরে শয়তানটার মাথা 'আলাদা' করে দিতে। কিন্তু বলল না। সাপটাকে সামলানোর শেষ চেষ্টা করল। পুরো শরীরটা তো প্রায় ঢুকিয়েই ফেলা হয়েছে, এখন শুধু মাথাটা আবার ঢোকাতে পারলেই হয়। টান দিয়ে ডিয়ার হাত থেকে ছাড়িয়ে আনল দাঁতগুলো। দাঁতের মাথা থেকে ফেঁটা ফেঁটা বিষ ঝরছে। ঠেলে আবার মুখটা বস্তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ধরে রাখল। যেটুকু শরীর বেরিয়ে ছিল সাপটার, মোচড়াতে গিয়ে সেটুকুও ঢুকে গেল বস্তার ভেতরে। একটা মুহূর্ত দেরি করল না আর কিশোর। বস্তার মুখ আটকে বেঁধে ফেলল।

ভেতরে শরীর শক্ত করে ফেলেছে সাপটা। অনেকটা রিঙের মত হয়ে গেল। গড়াতে শুরু করল বস্তাটা। গড়িয়ে চলল লোকগুলোর দিকে। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে দিশেহারার মত ছুটে পালাতে লাগল ওরা। তবে বস্তার ভেতরে অঙ্ককার। আর সাপকে শান্ত করতে হলে অঙ্ককারই প্রয়োজন। বেশিক্ষণ আর গোলমাল করল না ওটা। চুপ হয়ে গেল।

উদ্বিগ্ন হয়ে ডিয়ার ক্ষত পরীক্ষা করতে বসল কিশোর।

‘ও কিছু না,’ ডিয়া বলল। সামনের দিকে চোখ পড়তে চেঁচিয়ে উঠল, ‘আরে, দেখো না!'

উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল মুসাকে। বেহঁশ মনে হচ্ছে। পিঠ থেকে সোজা হয়ে রয়েছে তিন ফুট লম্বা একটা জিনিস। পেছনে পাখির পালক লাগানো একটা তীর। মাথাটা গেঁথে গেছে মুসার পিঠে।

চুটে গেল ডিয়া। তীরটা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। জোরে টান দিলে মাঃস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। সেটা করাই প্রয়োজন, গেঁথে আটকে থাকার চেয়ে। যত বেশিক্ষণ থাকবে তত বেশি বিষ ছড়াবে রঞ্জে।

হ্যাচকা টানে তীরটা খুলে আনল সে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রঞ্জ। ওই রঞ্জপাত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করতে না পারলে রক্তক্ষরণেই মরে যাবে মুসা। অসহায় দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল ডিয়া। মেডিসিন কিট সাথেই রাখে। বিপজ্জনক কাজে এসেছে। দরকার পড়তেই পারে। তাড়াতাড়ি রবিনকে সেটা খুলতে বলল। তাতে ব্যান্ডেজ খুঁজল কিশোর। নেই। পরিষ্কার কাপড় হলেও চলত। কোথায় পাবে? শার্ট পরে আসেনি। গাঁয়ের লোকেরা কিছুই পরে না।

এই সময় সাহায্য করতে এগিয়ে এল একজন লোক। তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটা দান করে দিল মুসার ক্ষত বাঁধার জন্যে। জিনিসটা মুসারই ছিল, চুরি করে কেটে নিয়েছিল লোকটা, পছন্দ হয়ে যাওয়ায়। মুসার প্যান্টের একটা পা। প্যান্টটা ধূয়ে রোদে শুকাতে দিয়েছিল সে, কেটে নিয়েছিল লোকটা। নেয়াতে ভালই হয়েছে, কাজে লেগে গেল এখন। একটুকরো দড়ির সাহায্যে ওটা দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধল কিশোর আর ডিয়া মিলে।

হঁশ ফিরছে মুসার। চোখের পাতা নড়ছে।

জরুরী একটা কাজ শেষ। বাকি রয়েছে আরেকটা। ডিয়ার হাতের ব্যবস্থা করা। সেদিকে মন দিল কিশোর। কনুইয়ের নিচে আর ওপরে পেঁচিয়ে দড়ি বেঁধেছে, যাতে বিষ আর ওপরে উঠতে না পারে। অ্যানটিট্রিন বের করে সিরিঞ্জে ভরে ইনজেকশন দিল।

চকচকে বাদামী ছিল মুখটা ফ্যাকাসে ধূসর হয়ে গেছে ডিয়ার। কষ্ট ভারী, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না ঠিকমত। মাতালের মত টলছে।

গুঙ্গিয়ে উঠল মুসা। জ্বান ফিরে আসছে। উঠে বসল। মাথা ঘুরছে। যে কোন সময় আবার পড়ে যেতে পারে।

তীষ্ণ দুর্বল লাগছে ডিয়ারও। মনে হচ্ছে বেহঁশ হয়ে যাবে। বমি পাচ্ছে। ঝুলে পড়েছে চোখের পাতা। বড় হয়ে যাচ্ছে চোখের মণি। যতই বড় হচ্ছে, দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছে তার।

‘নার্ভাস সিসটেমকে অকেজো করে দিচ্ছে বিষ,’ কিশোর বলল। ‘রঞ্জ জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ডিয়া, শয়ে পড়ো। চুপ করে শয়ে থাকো কিছুক্ষণ।’

শয়ে পড়ল ডিয়া। বলল, ‘আমাকে নিয়ে অথবা ভাবছ। আমি ভাল আছি।’ বলল বটে, কিন্তু জিভ এত ভারী হয়ে উঠেছে, নড়াতেই পারছে না।

কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়ে থেকে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু এমন করে টলে

উঠল, কিশোর আর রবিন তাকে ধরে না ফেললে পড়েই যেত।

‘ওকে গাঁয়ে নেব কি করে?’ নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।

‘বয়ে নেব,’ নগো বলল।

তাহলে ড্রাগনটার কি হবে? ওটাকে বয়ে নেবে কে? ভাবল কিশোর। এত কষ্ট করে ধরা হয়েছে। জাহাজে নিয়ে যাওয়া দরকার।

সমস্যার সমাধান করে ফেলল মনে মনে। চারটে দড়ি হলেই হয়ে যাবে। ছুরি দিয়ে বড় একটা দড়িকে চার টুকরো করে ফেলল। প্রতিটা বিশ ফুট লম্বা।

এইবার জীবটাকে বাঁধতে হবে। ভয়ানক বিপজ্জনক কাজ। ওটার লেজ আর দাঁত এড়িয়ে কাজটা করা খুবই কঠিন। তবু করতে হবে।

জালের নিচ দিয়ে দড়ি ঢুকিয়ে দিল কিশোর। অনেক চেষ্টার পর ড্রাগনের কাঁধের কাছে পেঁচিয়ে ফেলল। তার হাত কামড়ে দিতে চাইল ড্রাগনটা বার বার, পারল না। কারণ জালের নিচে মাথাটা প্রায় নাড়তেই পারছে না। যেটুকু সরাতে পারছে তাতে কিশোরের হাত পর্যন্ত পৌছাচ্ছে না তার মুখ।

আরেকটা দড়িও ওটার কাঁধে পেঁচাল কিশোর। দুটো দড়ির মাথা দু’পাশ দিয়ে বের করে রাখল।

কাঁধ বাঁধা শেষ। এইবার বাঁধতে হবে লেজের গোড়া। কাঁধ বাঁধার চেয়ে কঠিন।

তবে কঠিন কাজটাও শেষ হলো। সঙ্গে আসা লোকগুলোকে ডেকে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল কিশোর। প্রতিটি দড়ির মাথা ধরতে হবে দু’জন করে লোককে। আটজন লোক মিলেও যদি একটা জীবকে সামলাতে না পারে তাহলে আর কিছু করার নেই।

‘শক্ত করে ধরে রাখো,’ বলল সে। ‘আমি জাল সরিয়ে নিচ্ছি।’

ভারী জালটা সরাতে অনেক কসরত করতে হলো তাকে। ভাঁজ করল। ভাবছে, ওটা কে বয়ে নেবে? ড্রাগন সামলাবে সাতজন লোক। নগো আর আরেকজন লোক বয়ে নেবে ডিয়া ও মুসাকে। তাকে আর রবিনকে মিলে বইতে হবে সাপের বোঝা। তাহলে?

জাল বইবার আর কেউ নেই। হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এল তার। মুচকি হাসি ফুটল মুখে। অত চিন্তার কি আছে। ড্রাগনটাকেই তো ব্যবহার করা যায়।

গাঁয়ে ফিরে চলল দলটা। চারটে দড়ির রাশ দানবটাকে সোজা পথে চলতে বাধ্য করল। যদিও প্রতি মুহূর্তেই চেষ্টা করছে লোকগুলোকে তার পথে সরিয়ে নেবার জন্যে।

ডিয়াকে বয়ে নিতে দরদর করে ঘামছে নগো। ছেলেটা প্রায় তার সমান ভারী। মুসাও কম ভারী না। তাকে বইতে হিমশিম খাচ্ছে দশাসই জংলী লোকটা। শেষে তার কাঁধ থেকে নেমে পড়ল মুসা। লোকটার হাত ধরে আন্তে আন্তে হেঁটে চলল। কাঁধে চড়ার চেয়ে এটাই বরং ভাল লাগছে তার।

ড্রাগনের পিঠে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ভাঁজ করা জাল। আরও অনেকখানি জায়গা খালি রয়ে গেছে। নগোর মনে হলো অহেতুক নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান জায়গা। ডিয়াকেও ওটার পিঠে চাপাল সে। ভাবখানা, আমাদেরকে যখন কষ্ট দিচ্ছ, তুমি

মিয়া আরামে যাবে কেন? তবে এসব ওজন যেন ওজনই নয় ড্রাগনটার কাছে। দিব্যি বয়ে নিয়ে চলেছে। ড্রাগনের পিঠে সওয়ার হওয়াটা কেমন মজার সেটা উপভোগ করার মত অবস্থা নেই এখন ডিয়ার। ধরে রাখার শক্তিও নেই। কাজেই পাশে পাশে হাঁটতে হচ্ছে নগোকে, তাকে ধরে ধরে। যাতে পিঠ থেকে পড়ে না যায়।

অল্পক্ষণেই বুরো গেল, এর চেয়ে বয়ে নেয়াটা অনেক সহজ এবং আরামের ছিল, এতই যন্ত্রণা দিচ্ছে ড্রাগনটা।

গাঁয়ের কাছে পৌছল অস্তুত মিছিল। দানবটাকে দেখার জন্যে বেরিয়ে এল গ্রামবাসীরা।

ডিয়াকে ঘরে নিয়ে যেতে চাইল তার বাবা-মা। কিশোর বাধা দিয়ে বলল, ‘আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ জাহাজে থাকুক। ভাল হোক, তারপর নিয়ে যেও।’

ডিঙিতে করে তীরে এসে নামলেন ক্যাপ্টেন বাউয়েন। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ড্রাগনটার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘জাহাজে নিয়ে যেতে হবে নাকি! সর্বনাশ! দুই টনের কম হবে না! কি করে নেব! তুলবই বা কি করে? ক্রেনের শক্তিতে কুলাবে না।’

এবারও বুদ্ধি বের করল কিশোর। সে শুনেছে, কমোডো ড্রাগন খুব ভাল সাঁতরাতে পারে। সেই আটজন লোককেই দড়ি ধরে সাতরে নিয়ে যেতে বলল।

কুমিরেরা কৌতৃহলী হয়ে দেখতে এল। জাতভাইকে চিনতে পেরেছে মনে হয়। তবে ঝগড়া বাধানোর কোন চেষ্টা করল না।

সাপটাকে ডিঙিতে করে বয়ে আনলেন ক্যাপ্টেন। জাহাজে তোলা হলো ওটাকে। একটা খাঁচায় ভরে দেয়া হলো। তাইপানকে নিয়ে খুব একটা ঝামেলা হলো না।

ক্যাপ্টেনের ভয় ছিল ড্রাগনটাকে তোলা নিয়ে। কিন্তু ওটার ভার সহ্য করে ঠিকমতই যখন তুলে নিল ক্রেন, অবাক হলেন তিনি। তারপরের সমস্যা, ওটাকে কোথায় রাখা হবে?

কিশোর বলল, ‘তেমন শক্ত খাঁচা তো আর নেই, কুমিরেরটা বাদে। একসাথেই রাখা হোক দুটোকে। আমার মনে হয় না ঝগড়া করবে। কেউ কাউকে তো আর খেতে পারবে না। অথবা মারামারি করে লাভ কি।’

ঠিকই অনুমান করেছে সে। ঝগড়া তো করলই না দুই দৈত্য, বরং ভাবছ করে নিল যেন।

একটা বাংকে আরাম করে শুইয়ে দেয়া হলো ডিয়াকে। তার চিকিৎসা পরে করতে পারবে, কারণ অ্যান্টিট্রিন দেয়া আছে; মুসারই কোন ব্যবস্থা হয়নি। তার চিকিৎসা আগে করা দরকার।

শক্ত করে প্যান্টের পা বাঁধা থাকায় রক্ত বন্ধ হয়ে গোছে তার। সেটা খুলে নিয়ে ক্ষতস্থান স্টেরিলাইজ করে নিয়ে ভাল মত ব্যান্ডেজ করে দিল কিশোর আর রবিন মিলে।

অনেকটা সুস্থ বোধ করল মুসা।

এরপর ডিয়ার দিকে মন দিল কিশোর আর রবিন। কথা বলার মত যখন

অবস্থা হলো ডিয়ার, প্রথমেই জানতে চাইল মুসা কেমন আছে।

‘দুর্বল,’ মুসাই জবাব দিল। ‘তবে আরও অনেক খারাপ হতে পারত।’

‘তা পারত। যে লোকটা তীর মেরেছে সে তোমাকে খুন করার উদ্দেশ্যেই মেরেছিল।’

‘কে হতে পারে বুঝতে পারছি না। তোমাদের গাঁয়ের কেউ।’

‘না। আমাদের গাঁয়ের কেউ তোমাকে খুন করার চেষ্টা করবে না।’

‘তাহলে অন্য গাঁয়ের কেউ? অন্য কোন গোত্রের হতে পারে।’

‘তারা কেন ওকে মারতে চাইবে?’ কিশোরের প্রশ্ন। ‘উহু, অন্য কেউ। যার রাগ আছে তোমার ওপর।’

‘কে সেই লোক? কার পাকা ধানে মই দিলাম?’

‘ওঝাটা হতে পারে। তার পাকা ধানে তো অবশ্যই মই দিয়েছি আমরা। তাকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করেছি।’

‘দুঃজনেই ভুল করছ তোমরা,’ ডিয়া বলল। ‘কারণ একটা জিনিস চোখে পড়েছিল আমার।’

‘কি জিনিস?’ জানতে চাইল কিশোর।

‘গাছের নিচে তখন বেশ অঙ্ককার ছিল। তবু মনে হলো লোকটাকে দেখেছি। ধনুক হাতে। ওঝা নয়। তোমাদেরই মত পোশাক পরা।’

হেসে উঠল মুসা। ‘এখানে ওরকম কে আসবে? একমাত্র বাউয়েন ওরুকম পোশাক পরেন। তিনি তো আর আমাকে খুন করতে চান না। তুমি ভুল দেখেছ। তা দেখতেই পারো। সাপের বিষ মাথা খারাপ করে দিয়েছিল তোমার। দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। নাও, এখন ঘুমাও। ঘুমালে ভাল লাগবে।’

কিশোর বলল ডিয়াকে, ‘তোমাকে একটা ধন্যবাদ দিতে চাই, ডিয়া।’

‘কিসের জন্যে?’

‘আমার জীবন বাঁচানোর জন্যে। আমাকেই কামড়াতে চেয়েছিল সাপটা। তুমি হাতটা বাড়িয়ে না দিলে...’

‘বাদ দাও ওসব কথা।’ চোখ মুদল ডিয়া। ঘুমিয়ে পড়ল।

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। নিচুস্বরে বলল, ‘ভাল একটা বেকায়দায় পড়া গেল। মুসা খেয়েছে তীর। ডিয়া সাপের কামড়। সারতে কত সময় লাগবে কে জানে! আদৌ সারবে কিনা সেটাও বুঝতে পারছি না।’

এগারো

পরদিন সকালে নাস্তা নিয়ে এল নগো। ওদের দেশের সবচেয়ে ভাল খাবার। সাধারণত মুসাই নাস্তা বানায়। আজ কিছু বানাতে পারবে না আন্দাজ করতে

পারল মোড়ল। কারণ পিঠে তীর খেয়েছে। শরীর খারাপ। তাই বৌকে দিয়ে খাবার রান্না করে কলাপাতায় জড়িয়ে জাহাজে এসে হাজির হলো।

আসলেই শরীর খারাপ মুসার। শুয়ে আছে। তবে ডিয়া অনেকখানি সেরে উঠেছে। খিদেও পেয়েছে। খাবার দেখে চোখমুখ উজ্জ্বল হলো তার।

খিদে মুসারও পেয়েছে। কিন্তু খাবারের চেহারা দেখে মুখ বাঁকাল সে।

এত খুশি হয়ে যা এনেছে নগো, তা হলো বিশাল এক বাদুড়, সেদ্ধ করা। ক্যাপ্টেন একবার তাকিয়েই বিড়বিড় করলেন, ‘ঈশ্বর!’

এ ধরনের কথাবার্তা শোনেনি নগো। মনে করল, বাউয়েনও খুশি হয়েছেন খাবার দেখে।

‘আমি খাবনা,’ রবিন বলল।

‘না না,’ তাড়ুতাড়ি বলল কিশোর। ‘এভাবে মানা করলে নগো কষ্ট পাবে। গাঁয়ের মোড়ল সে। তাকে কোনভাবেই চটানো যাবে না। কি আর হবে বাদুড় খেলে। ওরা মানুষ, আমরাও মানুষ। ওদের কিছু না হলে আমাদেরও হবে না।’

সাধারণ বাদুড় নয় ওটা। এক ডানার প্রান্ত থেকে আরেক ডানার প্রান্ত কম করে হলেও পাঁচ ফুট হবে।

‘এত কুৎসিত জিনিস জীবনে দেখিনি আমি,’ রবিন বলল। ‘আর এটাকে কি বাদুড় মনে হচ্ছে নাকি? ডানা না থাকলে তো একটা শেয়াল। পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে চেহারা বিকৃত করে দেয়া হয়েছে।’

হাসল কিশোর। ‘এ জন্যেই এটাকে বলে ফ্লাইং ফন্স, অর্থাৎ উড়ুক্কু বাদুড়। ফুট ব্যাটও বলে, কারণ ফল ছাড়া কিছুই খায় না এরা। আমাদের তালিকায় ফ্লাইং ফন্সের নামও আছে। ধরে নিয়ে যেতে হবে। নগো হয়তো বলতে পারবে কোথায় পাওয়া যায় এগুলো।’

বুঝতে পারল নগো। বলল, ‘জানি, কোথায় পাওয়া যায়। অনেক দূর। বড় একটা গুহার ভেতরে। চলো না, আজকেই যাব।’

*

মুসা যেতে পারল না। ডিয়াও পারল না। তবে কিশোর ‘আর রবিন সুস্থিত আছে। শেষ বিকেলে নগোর সঙ্গে ওরা চলল বাদুড় ধরতে।

জাহাজে থাকতে ভাল লাগছিল না ডিয়ার। বাংকে থাকার অভ্যাস নেই। তাই ওদের সঙ্গে নেমে এল। নিজের বাড়িতেই থাকবে। তাকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে ধনের পথ ধরল গোয়েন্দারা।

চলতে চলতে আচমকা থেমে গেল কিশোর। পেছন ফিরে তাকাল। কেন যেন তার মনে হয়েছে, ওদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু কাউকেই চোখে পড়ল না। কোন শব্দ নেই, শুধু গাছের পাতায় বাতাসের শিরশিরি কাঁপন।

গাড়ীর একটা উপত্যকা ধরে চলল ওরা। দুই পাশে বড় বড় গাছ। সামনে পাহাড়ের গায়ে বিরাট এক গুহামুখ। যেন পাহাড়টা তার কালো মুখ হাঁ করে রেখেছে। হঠাৎ সেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা কালো প্রাণী, ওদের মাথার ওপর দিয়ে দাঁড়কাকের মত ধীরে ধীরে ডানা দুলিয়ে উড়ে চলে গেল। চিনতে অসুবিধে হলো না ওদের। সকালে যাকে ধরে নাস্তা বানিয়ে খেয়েছে তারই

স্বজাতি। মুখটা শেয়ালের মুখের মত। চোখা কান। বড় বড় চোখ। ফ্লাইং ফন্ড।

আরেকটু এগোতে মাথার ওপরে খসখস শোনা গেল। গাছের ডাল থেকে মাথা নিচের দিকে করে ঝুলে রয়েছে হাজার হাজার বাদুড়। জোরে চিংকার করে উঠল মুসা। ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল বাদুড়গুলো। আকাশ কালো করে দিল ওগুলোর ছড়নো ডানা।

কিছুক্ষণ পর আবার এসে এক এক করে ঝুলতে শুরু করল ডালে।

সাথে করে খাবার নিয়ে আসা হয়েছে। ব্যাগটা রবিনের হাতে। বের করতে বলল কিশোর। নগোকে নিয়ে খেতে বসল ওরা। খাওয়া শেষ হলে মোড়ল বলল, ‘গুহার ভেতরে ঢুকতে হবে। বৃষ্টি আসছে।’

সঙ্গের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকল ওরা। সমান একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল। রাতে ঘুমাতেও পারবে এখানে। বসে বসে কথা বলল খানিকক্ষণ। তারপর শুয়ে পড়ল।

হঠাতে চমকে জেগে গেল রবিন। হাতে কিসে যেন কামড়ে দিয়েছে। ব্যথাটা অদ্ভুত। যেন জুলন্ত সিগারেটের আগুন চামড়ার কাছাকাছি ধরে রাখা হয়েছে, তারই আঁচ লাগছে চামড়ায়। চট করে কথাটা মনে পড়ে গেল তার। বাদুড়! নিশ্চয়ই ভ্যাম্পায়ার ব্যাট! অনেক অভিযান্ত্রীরই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে, বইয়ে পড়েছে সে। রক্ত খেতে এসেছে বাদুড়টা।

আস্তে করে আরেক হাত তুলল রবিন। যেখানে আঁচ লাগছে দ্রুত সে-জায়গাটায় নামিয়ে আনল হাতটা। আশা করেছিল বাদুড়টাকে ধরতে পারবে। নেই ওটা। চটচটে আঠাল তরল পদার্থ লাগল হাতে। তারমানে রক্ত! এ ভাবেই রক্ত পান করে রক্তচোষা বাদুড়। এত সাবধানে চামড়ায় ফুটো করে ফেলে টেরও পায় না তার শিকার। তারপর চেটে চেটে রক্ত খায়। তখনও টের পায় না শিকার। খুবই বিস্ময়কর! রক্তচোষা বাদুড় নাম না রেখে রাখা উচিত ছিল রক্তচাটা বাদুড়। যা-ই হোক, কথা হলো, ভ্যাম্পায়ার ব্যাট বাস করে আমাজানে। নিউ গিনিন্তে আছে বলে শোনেনি। ...যাকগে, ওসব পরে ভাবা যাবে। আপাতত রক্তক্ষরণ বন্ধ করা দরকার। নইলে বিপদ হয়ে যাবে। নাগোকে ডাকল সে।

ডাকাডাকিতে মোড়লের সঙ্গে সঙ্গে কিশোরও জেগে গেল।

মোড়ল দেখেটেখে বলল, ‘কই, রক্ত কই?’

‘এ তো পানি। বৃষ্টির পানি পড়েছে। ঘুমাও।’

পরদিন সকালে রহস্যের সমাধান হলো। রাতে তাকে কিসে কামড়েছিল জানতে পারল রবিন। এক ধরনের পিংপড়ে। আগুনে পিংপড়ে বলে ওগুলোকে। কাছেই বাসা দেখা গেল। পিংপড়ের জগতের দৈত্য বলা যায় এদেরকে। দুই ইঁকির বেশি লম্বা।

দ্রুত নাস্তা শেষ করে গুহা থেকে বেরোল ওরা। এবার আসল কাজ। বাদুড় ধরতে হবে। বৃষ্টি থেমেছে। ডালে ঝুলে রয়েছে বাদুড়গুলো। রবিন আর কিশোর তাকিয়ে আছে ওগুলোর দিকে।

কিন্তু সেদিকে চোখ নেই নগোর। সে তাকিয়ে রয়েছে নিচের দিকে। মাটি পরীক্ষা করছে। বলল, ‘রাতে কেউ এসেছিল।’

মাটিতে পায়ের ছাপ দেখতে পেল দুই গোয়েন্দাও। অস্পষ্ট ছাপ।

কিশোর জিজেস করল, ‘তোমাদের গাঁয়ের কেউ?’

‘না। গাঁয়ের লোকেরা তোমাদের মত জুতো পরে না।’

‘জুতো শুধু আমাদের তিনজনের পায়ে আছে। আমাদেরই কারও হবে ওই ছাপ।’

মাথা নাড়ল নগো। পরিষ্কার একটা ছাপ দেখিয়ে বলল, ‘ওখানে তোমাদের পা রাখো তো।’

ছাপটার ওপর একে একে জুতো রাখল কিশোর আর রবিন। নিজেরাই দেখতে পেল তফাংটা।

‘দেখলে?’ নগো বলল। ‘অনেক বড়। তোমাদের চেয়ে অনেক বড় কোনও মানুষ। আমার ধারণা বিদেশী মানুষ। সে-ই তোমার বন্ধুকে তীর মেরেছিল।’

‘কিন্তু আমাদের পিছু নেবে কেন?’ নিজেকেই প্রশ্নটা করল কিশোর। ‘আর যদি নিয়েই থাকে, তাহলে ক্ষতি করার ইচ্ছে তার নেই। এই লোক মুসাকে তীর মারেনি। আমাদের খুন করার ইচ্ছে থাকলে কাল রাতে গুহায় ঢুকে সে-চেষ্টা করত।’

‘চেষ্টা করেনি তা বলতে পারো না।’

‘মানে?’

রবিনের দিকে তাকাল নগো। ‘পিংপড়েগুলো বাঁচিয়ে দিয়েছে তোমাদেরকে। রাতে ঠিকমত ঘুমাতে দেয়নি। এই লোকটা বৃষ্টির মধ্যে বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমরা গভীর ভাবে ঘুমালেই ঢুকে পড়ত। তারপর খুন করত তোমাদের। আমি বলছি, আবার চেষ্টা করবে সে।’

দিনটা চমৎকার। ঝকঝকে রোদ। রাতে আতঙ্কের ছিটেফোঁটাও নেই আর কিশোরের মনে। কাজেই ভয় পেল না সে। বরং রাতে বাদুড়ে কামড়েছে বলে ভয় পেয়েছিল ভেবে লজ্জাই লাগছে। নগোকে বলল, ‘তোমার কথা ঠিক না।’

‘আমি বলছি ঠিক। তোমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে।’

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। সব জংলী মানুষদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনেক বেশি প্রখর। বলতে গেলে অনেকটা এই ইন্দ্রিয়ের গোরেষ বেঁচে থাকে ওরা এ সব মারাত্মক বিপজ্জনক জঙ্গলে। আর তর্ক করল না সে। এমন, ‘ঠিক আছে, থাকব। এখন বাদুড় ধরা দরকার।’

‘থাওয়ার জন্যে?’ জানতে চাইল নগো। ‘না নিয়ে যাওয়ার জন্যে?’

‘যোয়ার জন্যে। জ্যান্ত ধরতে হবে। মারা চলবে না।’

এই জন্ত-জানোয়ার ধরার ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারেনি নগো। ওরাও ধরে, ঠাণ্ডা মারে। তবে স্লেটা একটা কারণে, থাওয়ার জন্যে। আরও একটা কারণে, আত্মরক্ষার তাগিদে। কিন্তু শুধু শুধু এভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে থাঁচায়, নরে গাখান মানে সে বুঝতে পারে না।

গোগান চেষ্টাও করল না। মাথা ঝাঁকাল শুধু।

*
‘বাদুড়’ মাথার জন্যে সঙ্গে করে থলে নিয়ে এসেছে কিশোর।

মাটি অনেক ওপরে, পর্ণশ ফুট ওপরের ডালে ঝুলে আছে ওগুলো। ধরবে কি করে?

সমাধান করে দিল নগো। তীর দিয়ে বাদুড় মারা সবচেয়ে সহজ। জ্যান্ত ধরতে হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে একটা গাছে উঠে গেল নগো। চিতার মত নিঃশব্দে হামা দিয়ে এগিয়ে গেল একটা ডাল বেয়ে। ফ্লাইং ফ্লাই ভীষণ চালাক, একেবারে শেয়ালের মতই। সামান্যতম শব্দ পেলেই উড়ে যাবে। আস্তে করে উঠে বসল নগো। তারপর পাথর ছুঁড়ল। ডানা ঝাপটে উড়ে গেল বাদুড়ের দল। কিছু কিছু রয়ে গেল। সেগুলো সবই বাচ্চা। একটা বাচ্চাকে সই করে আবার পাথর ছুঁড়ল সে। লাগাতে পারল না। ততীয়বারের চেষ্টায় লাগল বাচ্চাটার গায়ে। ডাল থেকে খসে গেল ওটার নখ। মার্টিতে পড়ে গেল। ধরে ফেলল কিশোর।

নেমে এল নগো। জানাল, বাচ্চাটাকে খোলা জায়গায় ফেলে রাখলে ওটাকে তুলে নেয়ার জন্যে নেমে আসবেই মা। মাটিতে বাদুড়ের অসহায়, ভাল হাঁটতে পারে না। পাখির মত ঝট করে উড়েও যেতে পারে না। বোপের ভেতরে লুকিয়ে থাকতে হবে। যেই মা-টা নামবে অমনি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ওটার ওপর। ধরে ফেলতে হবে। বাদুড় ধরার আদিম পদ্ধতি এটা।

বাচ্চাটাকে একটা জায়গায় রাখল নগো। যাতে নড়তে না পারে সেজন্যে এক ডানা ছড়িয়ে তাতে পাথর চাপা দিয়ে দিল। কাছাকাছি একটা ঝোপ আছে। তাতে চুকে পড়ল কিশোর আর রবিন। আরেকটাতে চুক্ল নগো। কিশোররা যেটাতে চুকেছে, তাতে কঁটা আছে। খোঁচা লাগল চামড়ায়। কিছু করার নেই। কোন ঝোপই এখানে কঁটাশূন্য নয়। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

মা নামছে না। কিশোরের মনে হতে লাগল, নামবে না। হয়তো এখানে কাজে লাগবে না আদিম পদ্ধতি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, না লাগার কোন কারণ নেই। বাদুড়দের স্বভাব নিশ্চয় বদলে যায়নি।

যায়নি যে তার প্রমাণ পেল শিগ্গিরই। ডানা ঝাপটে নেমে এল মা। বাচ্চাটার ওপর বসে ওটাকে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। কঁটার পরোয়া করল না আর কিশোর। ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল। ধরে ফেলল বড় বাদুড়টাকে। রবিনও বেরিয়ে এসেছে তার পিছু পিছু। তার হাতের থলেতে পুরল। বাচ্চাটাও জীবিতই আছে। ব্যথা পেয়েছে, তবে মরেনি। সেবায়ত্ত করে সুস্থ করে নেয়া যাবে ভেবে ওটাকেও নিয়ে নেয়া হলো।

একটা বাদুড়ই যথেষ্ট। অযথা বেশি ধরার দরকার নেই। নগোকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। বেশ ওজন বড় বাদুড়টার। অনেক বড়।

নগোর হৃশিয়ারি মনে আছে তার। অসাবধান হলো না গোয়েন্দারা। বিশাল পায়ের ছাপের অধিকারী মানুষটার ব্যাপারে সতর্ক রইল।

প্রায় দুই ঘণ্টা হয়ে গেল। তবু লোকটার দেখা নেই। সতর্কতায় টিল পড়ল দু'জনেরই। এই সময় ঘটল ঘটনা। অতর্কিতে। আগে আগে হাঁটছে নগো। ঠিক তার পেছনেই রয়েছে কিশোর। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, বড় একটা কি যেন গাছ থেকে পড়ছে নগোর ওপর। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। এক

ধাক্কায় সরিয়ে দিল মোড়লকে ।

অনেক ভারী একটা ডাল । মাথায় পড়লে মারা পড়ত নগো । তাকে সরাতে গিয়ে ডালটা লাগল কিশোরের গায়ে । আঘাত মারাত্মক না হলেও মাথার একপাশ আঁচড়ে গেল তার, ডান পায়ে ব্যথা পেল ।

ওকে জড়িয়ে ধরল নগো । কৃতজ্ঞতায় । দু'জনেই তাকিয়ে রইল ডালটার দিকে । যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ঘটনাটা ঘটেছে ।

‘নিচয় কাল ঝড়-বৃষ্টিতে ভেঙে ঝুলে ছিল,’ আন্দাজ করল রবিন । ‘এখন খসে পড়েছে ।’

মানতে পারল না নগো । আশপাশের মাটিতে পরীক্ষা করতে করতে আঙুল তুলল । এক জায়গায় চ্যাপ্টা হয়ে রয়েছে ঘাস ।

‘বড় পা,’ বলল সে ।

‘জানোয়ার-টানোয়ার হতে পারে,’ রবিন বলল ।

‘না । জানোয়ার নয় । মানুষ ।’

কি করে বুঝল নগো? রবিনের মনে তাঁর ধারণাই বদ্ধমূল রইল-আগের দিন ঝড়ে ভেঙে আটকে ছিল ডালটা । এখন খসে পড়েছে । কাকতালীয় বলা যায় ব্যাপারটাকে, তবে তা-ই ঘটেছে ।

কিন্তু কিশোরের সন্দেহ হলো । চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার । ডালটা পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ‘দেখো!’

দেখল রবিন । আর স্বীকার না করে পারল না যে ঝড়ে ভাঙ্গেনি । কুড়ালের স্পষ্ট কোপ রয়েছে ডালের গায়ে । ওপরে তাকিয়ে দেখল, যেখান থেকে ভেঙে পড়েছে সেখানেও কুড়ালের কোপের দাগ । মানুষের কাজ, বোঝাই যায় । একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না, একেবারে সময়মত কি করে ওদের ওপর খসে পড়ল ওটা ।

রহস্যের সমাধান করে দিল নগো । রাস্তার ওপর একটা লম্বা লতা পড়ে রয়েছে । একটা মাথা হারিয়ে গেছে খোপের ভেতরে । ট্রিগারের কাজ করেছে ওটা । মৃত্যুফাঁদ পেতে রেখেছিল কেউ । আগে আগে চলছিল নগো । তার গায়ে বেধে টান লাগতেই খসে পড়েছে ডালটা ।

মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল কিশোরের । চারপাশে তাকাল । বিপজ্জনক ফিছুই চোখে পড়ল না । গাছের পাতায় রোদ । একজোড়া ঘুঘু ডাকছে ডালে । খিমোচ্ছে একটা বার্ড অভ প্যারাডাইস । চমৎকার শান্ত পরিবেশ । সুন্দর । এ একম একটা জায়গায় খুনের পরিকল্পনা করেছে কেউ ভাবাই যায় না ।

আবার চলতে শুরু করল দু'জনে । মৃদু খোঁড়াচ্ছে কিশোর । তবে ব্যথাটা ভুলে গয়েছে । মন জুড়ে রয়েছে বিরাট পা-ওয়ালা রহস্যময় মানুষটা । যতই এগোচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে উঠছে শরীর ।

৬০’রা বোঝা বইতে বইতে রবিনও ক্লান্ত । কয়েকবার করে ওটা নিয়ে নিতে চেয়েছে নগো । দেয়নি রবিন । শেষে প্রায় কেড়ে নিল থলেটা । কাঁধে তুলে নিল । বোঝামুঝ হয়ে শখন কিশোরকে হাঁটতে সাহায্য করল রবিন । মাটিতে পড়ে থাকা মরা গাছগুলো ডিঙাতে অসুবিধে হচ্ছে কিশোরের ।

অবশ্যে গায়ে পৌছল ওরা । উত্তোজিত হয়ে আছে গ্রামবাসী । বুনো নাচ জুড়েছে কয়েকজনে । ব্যাপার কি জানার জন্যে কৌতুহল হচ্ছে কিশোরের, তবে আগে বাদুড় দুটোকে জাহাজে চালান করা দরকার ।

সাইক্লনের ডেকে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন বাউয়েন । ডিঙ্গি নিয়ে তীরে চলে এলেন । ‘থলেতে কি?’

‘বাদুড়,’ কিশোর বলল ।

‘ঘান্না করে খেতে চাইলে আলাদা কথা । কিন্তু জ্যান্ত বাদুড় এনে আমার জাহাজে তুলবে, সেটি হবে না ।’

তর্ক শুরু করল কিশোর । শেষে তার কথা মানতেই হলো ক্যাপ্টেনকে । বড় বাদুড়টাকে আগে খাঁচায় ভরল কিশোর । বাচ্চাটা ভালই আছে, ওটাকেও ভরল । তারপর মুসা কেমন আছে দেখতে গেল ।

‘আমার জন্যে ভেবো না,’ কিশোরকে বলল মুসা । ‘দু-এক দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাব ।...তোমার পায়ে কি হলো? খোঢ়াছ কেন?’

‘কিছু না । একটা ডাল পড়েছিল ।’

মুসার শরীর এমনিতেই ভাল না । সত্যি কথাটা বলে তাকে আরও দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাইল না কিশোর । মৃত্যুর মুখ থেকে যে ফিরে এসেছে জানাল না সে-কথাটা । জিজ্ঞেস করল, ‘গায়ে কি হয়েছে? মানুষগুলো তো সব পাগল হয়ে গেছে মনে হয় ।’

বারো

‘তোমরা যাওয়ার পর অনেক ঘটনা ঘটেছে,’ মুসা জানাল । ‘একজন লোক খুন হয়েছে ।’

‘বলো কি! গায়ে?’ রবিনের প্রশ্ন ।

‘না, জঙ্গলে । বল্লম নিয়ে নাকি একটা মানুষ আক্রমণ করেছিল তাকে । টলতে টলতে গায়ে ফিরল লোকটা । মরার আগে সব কথা বলে গেছে । পেছন থেকে এসে বল্লম মেরেছিল খুনী । পড়ে গেল লোকটা । পলকের জন্যে দেখেছে, যে মেরেছে তার পা কুচকুচে কালো ।’

‘তা কি করে হয়? এখানকার মানুষ তো কালো নয় । বাদামী ।’

‘ও যা বলেছে তাই বলছি আমি । লোকটা বলেছে, খুনীর পায়ের হাঁটু থেকে নিচের অংশটা কালো ।’

‘লোকটা কে, চিনতে পেরেছে?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর ।

‘বল বছর ধরে পাশের গায়ের লোকের সঙ্গে এখানকার লোকের বনিবনা মেই । শক্রতা । যে লোকটা মারা গেছে, তার ধারণা, খুনী পাশের গায়েরই লোক । গায়ের লোকে তখন আমার সঙ্গে কথা বলতে এল । যখন দেখল, আমার শরীর

খুব খারাপ, সাহায্য করতে পারব না, তখন ক্যাপ্টেন বাউয়েনকে নিয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করোগে, সব বলবেন।'

দরজায় গিয়ে ডাক দিল কিশোর। কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন।

'কাল নাকি কে মারা গেছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল?'

'কি আর বলব,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'চিকিৎসা করার জন্যে নিতে এল আমাকে। আমি তো আর ডাক্তার নই। গাঁয়ের লোকের চাপাচাপিতে গেলাম। কোনমতে রক্তটা বন্ধ করতে পারলাম শুধু। 'বড়বিড় করে কালো পায়ের কথা বলল লোকটা। তারপরই মরে গেল।'

'তারপর?'

'ভীষণ খেপে গেল এখানকার লোকে। কুড়াল, বল্লম বের করে নিয়ে এল। পাশের গাঁয়ের লোকের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে চাইল তখনি। একজন নেতা গোছের লোক বলল, অন্ধকার হলে যাওয়া উচিত। গিয়ে হঠাতে করে হামলা চালাবে।

'আমাকেও সঙ্গে নিতে চাইল ওরা। লড়াই করার জন্যে নয়। জানু দিয়ে কাজ সারার জন্যে। আমি গেলে নাকি ওদের ভাগ্যপ্রসন্ন থাকবে। না বলতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে সঙ্গে গেলাম।

'পথ খুবই খারাপ। পাহাড় পেরিয়ে ওপাশের উপত্যকায় নামলাম। আমার তো অবস্থা কাহিল, কিন্তু লোকগুলোর কিছুই হলো না; এ সব পথে চলতে চলতে অভ্যেস হয়ে গেছে ওদের।

'অন্তুত এক গ্রাম দেখতে পেলাম। ছয় ফুট উচু খুঁটির ওপর তৈরি করা হয়েছে কুড়েগুলো। মই দিয়ে ওঠার ব্যবস্থা। বোধহয় নিরাপত্তার জন্যেই অত উচুতে ঘর করেছে ওরা। বুনো জানোয়ার আর পাশের উপত্যকার লোকের হঠাতে আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে।

'একটা ঘরে আলো দেখা গেল। অনেক মানুষের কথাবার্তা শোনা গেল ভেতরে। পা টিপে টিপে এগোলাম আমরা। আলোচনা সভা বসেছে। গাঁয়ের লোক এসে মিলিত হয়েছে ওখানে, মোড়লের ঘরে। আলোচনা করছে, পাশের গাঁয়ের, অর্থাৎ আমরা যেখানে উঠেছি সেখানকার একটা মানুষকেও ছাড়া হবে না। শুন্দেরকেও না। সব খুন করে ফেলা হবে। এমনকি চারজন বিদেশীকেও ছাড়া হবে না।

'কৌতূহল হলো। ঘরের একেবারে নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম ভাল করে শোনার জন্যে। কেন খুন করতে চায় ওরা? ওদের আলোচনা থেকে বোৰা গেল, রহস্যময় কালো পাওয়ালা একজন মানুষ ওদের গাঁয়েরও একজনকে খুন করেছে। আমাদেরকে কেন মারতে চায়, বুঝতে পারলাম। কালো পা মানে, জুতো পরা পায়ের কথা বলছে ওরা। ওদের ধারণা, আমাদেরই কেউ ওদের লোককে খুন করেছে। কাজেই আমাদেরকে মারবে ওরা। আর যেহেতু গাঁয়ের লোকে আমাদেরকে ঠাই দিয়েছে, তাদেরকেও ছাড়বে না। তবে ভয়ও পাচ্ছে, ওদের কথা থেকে বোৰা গেল। আমরা যে সাংঘাতিক ক্ষমতাশালী ওৰা, এ কথা ওদেরও কানে গেছে।'

‘হঁ!’ আনমনে মাথা দোলাল কিশোর। তাবছে, তাকে যে লোক খুন করতে চেয়েছিল, এই দুই উপত্যকার মানুষ খুনের পেছনে তার কোনও হাত নেই তো? জিজ্ঞেস করল, ‘তারপর? লড়াই হলো?’

‘নাহ। যাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম, তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফেরত নিয়ে এলাম। শুনতে কি আর চায়? ভয় দেখালাম। বললাম, সময় হয়নি, এখন লড়াই করলে ওদের পরাজয় হবে। কারণ শয়তান এখন ওদের বিপক্ষে। শয়তানের ভয়েই ফেরত এসেছে ওরা।’

‘আর অন্য গাঁয়ের লোক? ওরা কখন লড়াই করতে আসবে?’

‘যে কোনও সময় চলে আসতে পারে। না-ও আসতে পারে। কারণ অনেককেই মনে হলো আমাদের ভয়ে ভীত। যা-ই হোক, ছশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। যদি আসে, দুটো দলকে থামানোর একটাই উপায়। রহস্যময় সেই জুতোওয়ালাকে খুঁজে বের করা। প্রমাণ করতে হবে, কে খুনটা করেছে।’

‘এ কাজ কেন করল লোকটা?’

‘একটাই জবাব। দুটো গাঁয়ের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়া। যাতে একদল আরেক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সোজা কথা, প্রতিশোধ নিতে চায়।’

‘কার সঙ্গে ওদের শক্রতা? আমার তো একটা লোকের কথাই মনে পড়ছে, এ গাঁয়ের সেই শো। কিন্তু সে জুতো পাবে কোথায়?’

‘কাল থেকে এ কথাই ভাবছি আমিও,’ মুসা বলল।

*

পরদিন সকালে দুঃসংবাদ নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন বাড়্যেন। ‘নগোর শরীর খারাপ।’

‘কি হয়েছে?’ জানতে চাইল কিশোর।

‘ঠিক বলতে পারব না। হাঁটতে গিয়েছিলাম ডাঙায়। নগোর একজন স্বী বেরিয়ে এসে বলল তার স্বামীর শরীর খারাপ। দেখতে গেলাম। সাংঘাতিক পেট ব্যথা করছে লোকটার। গড়াগড়ি করছে। সারারাতই নাকি এমন করেছে বলল তার বউ। তাকে ভাল করে দিতে অনুরোধ করল। কিন্তু আমি তো ডাঙ্গার নই।’

‘কিশোরও ডাঙ্গার নয়। তবে ওষুধ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে। ‘দেখি, আমি গিয়ে দেখি একবার।’ কিন্তু পায়ে যে রকম ব্যথা আর ফুলে উঠেছে পা-টা, হাঁটতে পারবে কিনা ভরসা পেল না।

মুসা বলল, ‘আমি ভাল হয়ে গেছি, আমি যাব।’

‘কিন্তু উঠে বসতে গিয়েই ধপ করে পড়ে গেল আবার বিছানায়। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা করে উঠল। শক্ত কাঠ হয়ে গেছে যেন। নড়াতেই পারে না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘নাহু আমি আর পারলাম না।’

‘থাক থাক, তুমি শুয়ে থাকো। উঠতে না পারলে অকারণে জোর করছ কেন?’
রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। ‘আমাদের ওষুধের বাস্তু ইমেটিক আছে না?’

‘মাথা দোলাল রবিন। ‘আছে।’

‘আমার মনে হচ্ছে বিষ। ওকে গিয়ে ইমেটিক দাও।’

‘টিমেটিকটা কি?’ জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

‘টিমেটিক নয়, ইমেটিক। পাকস্থলীতে বিষ থাকলে বেরিয়ে যাবে। রাত থেকেই ব্যথা করছে, বেশি দেরি হয়ে গেল কিনা কে জানে। তবু চেষ্টা করতে হবে। পেটের বিষ রক্তে ছড়িয়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না। আপনিও যান রবিনের সঙ্গে। ওর স্ত্রীকে গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে গেলাতে বলুন। গলা পর্যন্ত।’

‘কিন্তু কে বিষ খাওয়াতে যাবে?’ মুসার প্রশ্ন। ‘নিজে নিজে তো আর থাবে না। বনের সমস্ত লতা-পাতা-ফল চেনে সে। বিষাক্ত কিছুই থাবে না।’

‘চুরি করে তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে হয়তো কেউ। অচেনা কাউকে কাছেপিঠে ঘুরঘুর করতে দেখেছে কিনা তার বউকে জিজ্ঞেস করতে হবে। রবিন, জিজ্ঞেস কোরো।’

নগোর চিকিৎসা করতে গেল রবিন আর বাউয়েন। শক্তিশালী মানুষটা অল্প কয়েক ঘণ্টায়ই কি রকম কাহিল হয়ে পড়েছে দেখে অবাকহ লাগল রবিনের। চেহারাই বদলে গেছে। তার সব বউয়েরা ঘিরে বসে বিলাপ শুরু করেছে, যেন ইতিমধ্যেই মরে গেছে নগো।

তাদেরকে শান্ত হতে বললেন ক্যাপ্টেন। লবণ পানি গরম করে আনতে বললেন। একজন গিয়ে গরম করে আনল। ইমেটিক দিতে বসল রবিন। মোড়লকে জোর করে গুরুত্ব পানি গেলাতে শুরু করল সে আর ক্যাপ্টেন মিলে। যখন আর গিলতে পারল না নগো, তখন তাকে ধরে উপুড় করে শোয়ানো হলো। পিঠে চাপ দিতেই মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল পানি, পেটের ভেতরে যা ছিল সব নিয়ে।

আরও দু'বার তাকে পানি খাওয়ানো হলো। পেটের ভেতরে যা ছিল সব বেরিয়ে এল। আর এক বিন্দু শক্তি মেই নগোর শরীরে। একেবারে নেতিয়ে পড়ল। তবে পেট চেপে ধরে তার চেঁচানো বন্ধ হলো। তাকে আরাম করে শুইয়ে দিতে বললেন তার বউদেরকে ক্যাপ্টেন।

শোয়ানো হলো। চোখ মেলে রেখেছে নগো। তবে কিছু দেখে বলে মনে হয় না। একেবারে শূন্য দৃষ্টি।

বউদের জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, ‘সন্দেহজনক কাউকে কাল ঘরের কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখেছ?’ চুপ হয়ে গেল সবাই। শেষে একজন বলল, ‘ঠিক বলতে পারব না। আমরা এখানে থাকি না। সব বউয়েরই আলাদা কুঁড়ে আছে। এখানে শুধু মোড়ল থাকে। কালকে তো ও ছিলই না। ওর সঙ্গে বনে গিয়েছিল, মুসাকে দেখাল সে। ‘ঘরটা খালি’ ছিল। তখন কেউ আসতে পারে। চুকলেও কেউ দেখার নেই।’

‘আমার মনে পড়ছে,’ আরেকজন বলল। ‘একটা লোককে দেখেছি। বনের ভেতরে লাকড়ি কুড়াতে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে ভালমত দেখা যায় না ঘরটা। তবে মনে হলো কে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে।’

‘দেখতে কেমন?’

‘ভাল করে দেখিনি। তবে আমাদের গাঁয়ের পুরুষদের মত নয়। তোমাদেরই মত কাপড় পরনে ছিল মনে হলো। কি জানি। ভুলও হতে পারে আমার।’

আর কেউ কিছু বলতে পারল না। মোড়লকে চিকিৎসা যা করার করা হয়েছে। এর বেশি আর কিছু করার নেই। কিশোরকে খবরটা জান্তে জাহাজে ফিরে চললেন ক্যাপ্টেন আর রবিন।

*

‘যা যা করতে বলেছ করেছি,’ কিশোরকে বলল রবিন। ‘আর কিছু করার নেই। ভাল তো মনে হলো না।’

‘তার মানে বিষই। ছড়িয়ে পড়েছে শরীরে। তার বউদেরকে জিজেস করেছ?’

‘করেছি। একজন বলল, আমাদেরই মত পোশাক পরা একজন লোককে নাকি মোড়লের ঘর থেকে বেরোতে দেখেছে।’

‘হ্যাঁ!’ চিন্তিত ভঙ্গিতে বাউয়েনের দিকে তাকাল কিশোর। ‘কে হতে পারে?’

‘কি করে বলব?’

‘আমি একটা কথা ভাবছি,’ দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। ‘অতিকল্পনাও বলতে পারো।’

‘কি?’ জানতে চাইল মুসা আর রবিন।

‘আমাদের কোন পূর্বশক্ত না তো? প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এখানে এসে হাজির হয়েছে, করছে এ সমস্ত।’

‘কি জানি! রবিন বলল। ‘এতই রাগ আমাদের ওপর যে এখান পর্যন্ত ধাওয়া করে আসবে?’

‘আসতেও পারে। ভেবে দেখো সব। মুসার পিঠে তীর মারা হলো। আরেকটু হলেই মাথায় ডাল পঁড়ে মরতে বসেছিলাম আমি। এখানে আমাদের সব চেয়ে বড় বন্ধু নগোকে বিষ খাওয়ানো হলো। যাতে আমাদের সাহায্য করতে না পারে।’

‘অসম্ভব না,’ মুসা বলল। ‘এতকাল গোয়েন্দাগিরি করে শক্ত তো কম তৈরি করিনি।’

*

ঘণ্টা দুয়েক পর সাঁতার কেটে নদী পেরিয়ে গৃসে জাহাজে উঠল নগোর একজন স্ত্রী। কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়াল। কেঁদে কেঁদে চোখ লাল।

‘কি হয়েছে?’ জিজেস করল কিশোর।

‘আমার স্বামী মারা গেছে।’

কয়েক সেকেন্ড স্তন্ধ নীরব হয়ে রইল ঘরটা। তারপর কিশোর বলল, ‘আসছি আমরা। ওকে কবর দেয়ার সময় হাজির থাকব।’ এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারল না সে।

‘কবর দেয়া হয়ে গেছে।’

‘এত তাড়াতাড়ি?’

বুঝিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন, ‘এখানে একেক গোত্রে একেক নিয়ম। কেউ কেউ লাশ রেখে দেয় উঁচু একটা মঞ্চে। রোদে শুকিয়ে ধীরে ধীরে মামি হয়ে যায় লাশটা। কেউ আবার সঙ্গে সঙ্গে কবর দিয়ে ফেলে। মরার পর আর এক মুহূর্ত দেরি করে না। এরা সেই দলের। চলো, তার কবরটাই বরং দেখে আসি।’

ডিঙিতে করে তীরে রওনা হলো ওরা। কিশোরের সঙ্গে চলল রবিন আর

গাউয়েন। মুসা এবারেও ওঠার চেষ্টা করে পারল না।

মোড়লের ঘরে নিয়ে আসা হলো ওদের। এক জায়গায় গোল হয়ে বসে বিলাপ করছে স্ত্রীরা। বেড়ার ধারে নতুন মাটি খোঁড়া।

অবাক হলো কিশোর। ‘ঘরের ভেতরই কবর দিয়েছ?’

‘কেন দেব না?’ কানাজড়িত কঢ়ে বলল একজন স্ত্রী। ‘বেঁচে থাকতে আমাদের প্রিয় স্বামী ছিল সে। মরার পর কি পর হয়ে গেল? কেন বাইরে ফেলে দেব? তা ছাড়া এটা তারই ঘর।’

কবরের পাশে দাঁড়াল কিশোর, রঁবিন আর ক্যাপ্টেন। আরেকটা ব্যাপার অবাক করল কিশোরকে। কবরের এক মাথায় একটা গর্ত। ওটা দিয়ে নগোর মুখটা বেরিয়ে আছে। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে জিজেস করল, ‘ব্যাপার কি?’

‘নেতা গোছের কোনও ভাল মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার মুখের কাছে ওরকম গর্ত করে রাখা হয়।’

‘কারণটা কি?’

‘যাতে পচে যাওয়ার পরে তার খুলি নিঃশেষ গিয়ে টামবারানে সাজিয়ে রাখতে পারে।’

‘আমি তো মনে করেছি শুধু শক্রদের মাথা রাখে।’

‘না। যে কোনও নেতা যে কোনও বিজ্ঞলোকের মাথা রাখে। মৃতের প্রতি সম্মান এভাবেই দেখায়। তারা বিশ্বাস করে, মরে গেলেও খুলির ভেতরে থেকে যায় মানুষের আত্মা। ওই সব ভাল খুলির সামনে গিয়ে তাতে হাত রেখে নত হয়ে শুধু জানায়। প্রার্থনা করে। যাতে ওগুলো থেকে কিছু “ভাল” তাদের ভেতরেও ঢোকে।’

‘অদ্ভুত ইচ্ছে! তবে ইচ্ছেটা ভাল। এভাবে ভাল হতে চাওয়াটাও ভাল।’

‘আরও একটা ভাল ব্যাপার, মৃতকে মনে রাখে ওরা। আমরা তো কবর দিয়ে এসেই সব ভুলে যাই। এরা ভোলে না। একজন মানুষ যে ছিল ওদের মাঝে, সব সময় মনে রাখে।’

তৃতীয় দিনে কবর থেকে বেরিয়ে এল নগো। এতে অবাক হলো না গাঁয়ের লোক। সমস্ত কুসংস্কার আর জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ওরা। তা ছাড়া কবর থেকে উঠে আসার ঘটনা আরও শুনেছে ওরা। কোথায় নাকি কোনও এক শ্বেতাঙ্গ মিশনারীকে কবর দেয়া হয়েছিল। তিন দিনের দিন কবর থেকে উঠে এসেছিল সেই লোক।

কিন্তু কেবিনের দরজায় লোকটাকে দেখে তাজব হয়ে গেল কিশোররা। গাছের ছাল জড়িয়ে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল নগোকে। তেমনি জড়ানোই আছে এখনও। মাটি লৈগে রয়েছে। বিকেল হয়ে এসেছে। কেবিনের দরজায় আলো কম। তাই দেখে প্রথমে বিশ্বাসই কুরতে পারল না ওরা। মুসা তো ‘ভূত ভূত’ করে চেঁচাতে লাগল।

কথা বলে উঠল ভূতটা, ‘কয়েকটা দিন তোমাদের কোন সহযোগিতাই করতে পারিনি। দুঃখিত। কি করে করব? আমি যে মরে গিয়েছিলাম।’

‘তার মানে মরেননি,’ বিড়বিড় করল কিশোর।

‘নিশ্চয় মরেছি। কয়েক দিন ধরে মরে থেকেছি। বিদেশী মানুষের দেশে চলে

গিয়েছিলাম। ঘুরে এসেছি সে-সব দেশ। ওখানে সবাই সাদা পোশাক পরে। আমার মরে যাওয়া পুরানো বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। তারপর মহান আত্মা আমাকে এখানে ফেরত পাঠিয়ে দিল। চলে এলাম। আবার বেঁচে উঠলাম।'

'কবর থেকে বেরোলে কি করে?'

'রোজই আমার বউয়েরা দেখতে আসে। একজন এসে দেখলি আমি যাথা নাড়ছি। অন্যদেরকে ডেকে আনল সে। মাটি সরিয়ে আমাকে বের করল।'

'কি হয়েছে বুঝতে পারছি,' বাউয়েন আর দুই সহকারীকে বলল কিশোর। নগো মরেই গিয়েছিল। সাংঘাতিক কাহিল হয়ে বেহ্শ হয়ে গিয়েছিল। বউয়েরা মনে করেছিল মরে গেছে। কবর দিয়ে দিয়েছিল। ভাগিয়স ওই অস্তুত নিয়ম-কানুন চালু রয়েছে ওদের, মৃতের মুখের কাছে গর্ত রেখে দেয়া। তাই শ্বাস নিতে পেরেছিল সে। তিনদিন অচেতন থাকার পর বিষের ক্রিয়া শরীর থেকে শেষ হয়ে গেলে হুঁশ ফিরেছে।'

উঠে গিয়ে টিন আর হাঁড়িপাতিল নাড়তে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। 'ভূত না হলে তো তার খাবার লাগবে। একদিন না খেয়ে থেকেছে। পেটের মধ্যে নিশ্চয় ছুঁচো নাচছে।'

'আমার সন্দেহ আছে,' কিশোর বলল। 'সাধারণ বেহ্শ নয়, কমায় চলে গিয়েছিল সে। অনেকটা হাইবারনেশন বলা চলে। শীতকালে শীতপ্রধান অঞ্চলের অনেক প্রাণী গুহায় চুকে যে অবস্থায় কাটায়, তেমনি তাতে খিদেটিদে পায় না। শরীরে জমানো চর্বির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। শীতের শেষে গুহা থেকে যখন বেরোয়, রোগা হয়ে যায় শরীর, কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ থাকে। জন্ম-জানোয়ার যদি এভাবে কয়েক মাস না খেয়ে ঠিক থাকতে পারে, তিনচারদিন না খেয়ে মানুষ পারবে না কেন?' মোড়লের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খিদে পেয়েছে?'

'না।' কিন্তু যখন সামনে খাবার দেয়া হলো, সুগন্ধ নাকে চুকল, মোচড় দিয়ে উঠল পেট। সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেল নগো। গোগোসে গিলতে শুরু করল। খাওয়া শেষে আরাম করে কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে স্বপ্নের কথা বলতে লাগল। 'চমৎকার একটা দুনিয়া, বুঝলে। আবার আমি যেতে চাই ওখানে। তবে এবার আর ফেরার ইচ্ছে নেই। এত আরামের জায়গা ছেড়ে কে আসতে চায়?'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল রবিন। 'লোকটা সত্যিই মনে করছে সে মরে গিয়েছিল!'

তেরো

মেজাজ খিচড়ে গেছে বব অ্যাঞ্জেলের।

এত চেষ্টা করছে, অথচ কিছুতেই মারতে পারছে না ছেলেগুলোকে। তার কাজ সে ঠিকমতই করছে, কিন্তু কপাল জোরে যেন অলৌকিক ভাবে বেঁচে যাচ্ছে

ওরা। মরেও মরে না, কি কাও! ফসকে বেরিয়ে যায়!

খুনগুলোকে দুঃঢ়িন্না হিসেবে সাজানোর চেষ্টা করছে সে। জানে, ছেলেগুলো মারা গেলে তদন্ত হবেই। কিভাবে মৃত্যু ঘটেছে, বের করার চেষ্টা করবে পুলিস। যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করে বসে খুন হয়েছে ওরা, বব অ্যাঞ্জেলের কপালে দুঃখ আছে। এমনিতেই জেল থেকে পালানোর অপরাধে পুলিস লেগে আছে পেছনে। তার ওপর যদি নতুন করে ওই খুনের অপরাধ প্রমাণ করে ফেলে, তাহলে দুনিয়ার কেউ বাঁচাতে পারবে না ওকে। সেজন্যেই অনেক ভেবেচিস্তে হিসেব করে পা ফেলছে সে। নইলে তো এই জঙ্গলে সহজেই খুন করে ফেলতে পারত তিনি গোয়েন্দাকে।

মুসাকে তীর মেরেছে। বোঝাতে চেয়েছে, তীরটা সে নয়, মেরেছে কোনও আদিবাসী। কিন্তু জান খুব শক্ত ছেলেটার। বেঁচে গেল। কিশোরকে মারতে চেয়েছে মাথায় ডাল ফেলে। ওটাও বেঁচে গেল। আর তৃতীয় ছেলেটাকে মারার কোন সুযোগই করতে পারেনি। তা ছাড়া যেন অদৃশ্য কোনও হাত সাহায্য করছে ওদেরকে। গাঁয়ের লোককে বিস্রূত করে জেলার জন্যে নগোকে বিস্থ খাওয়াল। ওই লোকটাও তিনদিন পরে উঠে চলে এল কবর থেকে। কি করে উঠল, বুঝতেই পারছে না সে। ভেবে অবাক হচ্ছে। তবে কি সত্যি কোনও জাদু জানে লোকটা? যা-ই হোক, গাঁয়ের দু'জন লোককেও খুন করেছে বব। লড়াই লাগিয়ে দিতে চেয়েছে। সেটাও এখন পূর্ণস্ত সাফল্য আনেনি। লড়াই লাগলে গোলমালের ফাঁকে তীর কিংবা বল্লম দিয়ে মেরে ফেলতে পারত ছেলেগুলোকে। দোষটা পড়ত আদিবাসীদের ঘাড়ে।

বব অ্যাঞ্জেল কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তার মনে হতে লাগল, এ সবের পেছনে নিশ্চয় জাদুবিদম কাজ করছে। কোনও অলৌকিক ক্ষমতা সাহায্য করছে ছেলেগুলোকে। আর মোড়লটারও কোনও ক্ষমতা আছে। ওসব নষ্ট করতে না পারলে কিছুই করতে পারবে না বব। সে নিজে জাদু জানে না। কাউকে দিয়ে করাতে হবে। কাকে?

ভাবতে গিয়ে একটা লোকের কথাই মাথায় এল তার। আইল্যান্ডেন গাঁয়ের ওঝা। গাঁয়ের পুবে পর্বতের দিকে চলে গেছে সে। খুঁজে বের করতে হবে তাকে। তবে তার আগে আরেকটা কাজ জরুরী হয়ে পড়েছে। খাবার জোগাড় করা। পাওয়া যাবে এখানেই, গাঁয়ে। গিয়ে খাবার চাইতে পারবে না। জেনে যাবে তিনি গোয়েন্দা।

চুরি করতে গেলও বিপদ হতে পারে। ধরা পড়ে যেতে পারে সে। অহেতুক ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। গ্রাম আরও আছে পর্বতের ওধারে। সেখানে গিয়ে চেয়ে দেখতে পারে। ওরা আইল্যান্ডেনদের শক্ত। ওখান থেকে কথাটা ফাঁস না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

খাড়ির কাছে চলে এল সে। গাছপালার আড়ালে লুকানো বোটটায় উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। নদী বেয়ে বের করে নিয়ে এল সাগরে। তারপর ঘুরে আরেকটা নদী দিয়ে চলে এল পর্বতের অন্যপাশের গ্রামটার কাছে। বোট ভিড়িয়ে নেমে নড়ল।

তাকে ছেঁকে ধরল গ্রামবাসীরা। তাদের মধ্যে দেখতে পেল সেই ওঝাকে। ভালই হয়েছে। খুশি হলো বব। এক কাজে দুই কাজ হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে ওঝার মুখে থুথু ছিটাল সে। ওঝাও তার মুখে থুথু ছিটাল। এটা আন্তরিকতা জানানোর রীতি এখানে।

‘তোমার সঙ্গে কথা আছে,’ বব বলল। ‘একা বলব।’

‘আমার ঘরে এসো।’

কুঁড়েতে চুকে দরজা লাগিয়ে দিল ওঝা। চকচক করছে চোখ। ‘ছেলেগুলোকে খতম করার খবর দিতে এসেছ নিশ্চয়?’

‘না। আমি খাবারের জন্যে এসেছি। বুনো জানোয়ারের মাংস ও ফল খেয়ে আর চলছে না। অন্য কিছু চাই। ব্যবস্থা করতে পারবে?’

‘পারব। কিন্তু আমার শক্রদের কি হবে? তাদেরকে মারলে না কেন?’

‘অনেক চেষ্টা করলাম, মরে না। তীর মেরেছি একটাকে, বেঁচে গেল। আরেকটার মাথায় ডাল ফেলে মারতে চাইলাম, পড়লই না। নগোকে বিষ খাওয়ালাম। মারা গেল সে। কবর ঢেয়া হলো...’

‘যাক, একটা তাহলে গেছে।’

‘না, যায়নি। তিন দিনের দিন কবর থেকে উঠে পড়ল।’

চমকে গেল ওঝা। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রাইল ববের দিকে।

‘বলো কি? মরে গিয়ে বেঁচে উঠেছে!’

‘হ্যাঁ, তাই।’

‘খারাপ জাদু,’ মাথা নাড়তে লাগল ওঝা। ‘খুব খারাপ। তার মানে প্রচণ্ড ক্ষমতা পেয়ে গেছে নগো। মরে গিয়ে যদি বেঁচে উঠতে পারে, আরও অনেক কিছুই করতে পারবে সে। সাংঘাতিক অভিশাপ দিয়ে বসতে পারে তোমাকে।’

মাথা ঝাঁকাল বব। ‘এই ভয়টাই আমি করছি! ধরো, আমাকে অভিশাপ দিয়েই বসল নগো, ক্ষতি করতে চাইল, তুমি কি ঠেকাতে পারবে? কিছু করতে পারবে আমার জন্য?’

‘অভিশাপটা অকেজো করে দিতে পারি,’ ওঝা বলল। বুনো শুয়োরের শির দিয়ে তৈরি একটা মালা বের করল। লকেটের জায়গায় বুলছে একটা কুৎসিত দর্শন মরা, শুকনো বিছু। ‘নাও, গলায় পরো। এটা খুব শক্তিশালী তাবিজ। যে কোনও অভিশাপ দূর করে দিয়ে সৌভাগ্য আনতে পারে।’

বিধা করতে লাগল বব। শেষে পরল ওটা, ঝুলিয়ে দিল শাটের ওপরে।

‘না, ওভাবে না,’ বিধা দিল ওঝা। ‘ভেতরে পরতে হবে। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। নইলে কাজ হবে না।’

অগত্যা ভেতরেই ঢোকাল বব। জ্যান্তই হোক আর মৃতই হোক, কাঁকড়া বিছেকে দারুণ ভয় করে সে। ওটার হুল ফোটানোর ক্ষমতা এখন নেই, তবু খোঁচা লাগতে পারে। সেটাও মারাত্মক হতে পারে। কাজ উদ্ধারের জন্যে এখন সব অসুবিধে মেনে নিতে রাজি আছে সে। ওঝাকে বলল, ‘পরের বার ভাল খবর নিয়ে আসব।’

‘দাঢ়াও, জিনিস দিয়ে দিচ্ছি। যাতে কেবল ভাল খবরই আনতে পারো।’

একটা চামড়ার থলে বের করল সে। পেট্টা ফোলা। মুখ খুলে ধরে ভেতরে তাকাতে বলল ববকে। ভেতরে কিছু ডিম দেখতে পেল বব।

‘এই ডিম দিয়ে কি করব?’

ববের তাচ্ছিল্য দেখে হেসে উঠল ওবা। ‘তুমি ভাবছ পাখির ডিম? তা না। সাপের। কেউটে সাপ। ফোটার সময় হয়ে এসেছে।’

ভারত আর ইন্দোনেশিয়ার মত নিউ গিনিতেও প্রতি বছর বহুলোক মারা যায় এই সাপের কামড়ে। বাঁচার জন্যে দেবতা হিসেবে পূজা করে এই সাপকে। কামড়ে দেয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায় মানুষ-তবে সেটা বড় সাপের হলে, বাচ্চা সাপের নয়, ববের সে-রকমই ধারণা।

থলেটা ঠেলে সরিয়ে দিল সে। ‘এ দিয়ে আমার কোনও কাজ হবে না। এগুলোর বড় হওয়ার জন্যে পাঁচ বছর বসে থাকতে পারব না। ডিমফোটা বাচ্চার বিষই বা ক্ষতিই বা কি করবে।’

‘তুল করছ। ডিম থেকে বেরিয়েই খুন করার ক্ষমতা পেয়ে যায় এই সাপ। জাহাজটায় নিয়ে গিয়ে টেলে দিয়ে এসো, পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে। এখনই নিয়ে যাও। ডিম ফোটার সময় হয়ে গেছে। আজ রাতেই তোমার শক্রুরা যখন ঘুমিয়ে পড়বে টেলে দিয়ে আসবে ডিমগুলো। তারপর দেখবে কি কাণ্টা ঘটে। কালাকেই রওনা হয়ে যেতে পারবে দেশের উদ্দেশে, এখানে আর বসে থাকা লাগবে না।’

শেষ বিকেলে আবার এনে আগের জায়গায় বোট্টা লুকাল বব। খাবার বোঝাই করে নিয়ে এসেছে। তবে এ সব খাবার তার পছন্দ নয়। দেশে থাকতে যে-সব জিনিস খেত, তা নয়। তবু খাবার তো। খেয়ে বাঁচতে হবে। ওবা নিজে যা খায়, তাই দিয়েছে। শামুক, গোবরে পোকার বাচ্চা, কেঁচো, শুঁয়াপোকা, পাখির মাংস আর মগজ, ঘাসফড়িং, ঝিঁঝি পোকা, মাকড়সা, ব্যাঙ, বান মাছ, বাদুড়, ইন্দুর, গিরগিটি, বুনো জানোয়ারের মাংস, আর জানোয়ারের তাজা রক্ত।

কোনমতে এসব গিলতে হবে ববকে। বেঁচে থাকার জন্যে। তার শক্রদের শেষ করার জন্যে।

থলের মুখ খুলে আরেকবার ভেতরে তাকাল সে। ডিম ফুটে ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে একটা বাচ্চা। পুঁতির মত নিষ্প্রাণ চোখ মেলে চেয়ে রইল তার দিকে ফুটখানেক লম্হা বাচ্চাটা।

থলের মুখ বন্ধ করে দেয়ার আগেই পিছলে বেরিয়ে গেল সাপটা। গোখরোরই অনেক প্রজাতি আছে যেগুলো ছাড়া পেলেই পালাতে চায়। কিন্তু কিংকোবরা বা কালকেউটের স্বভাব অন্য রকম। দুনিয়ার সব কিছুর প্রতিই ওগুলোর ঘৃণা। পালাল না বাচ্চাটা। রুখে দাঁড়াল। ফণা তুলে ঘনঘন বের করতে লাগল ছোট কালো জিভটা। চোয়াল ফাঁক করে দেখিয়ে দিল মারাঞ্চক বিষদাঁত।

তায় পেল বব। পাওয়ার মতই বটে। কেবিনের দরজার দিকে পিছিয়ে গেল সে। বেরিয়ে গেল ডেকে। তাকে অনুসরণ করল সাপটা। লেজ ধরে ওটাকে তোলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু প্রতিবারেই তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল ওটা।

মহা শয়তান তো! ভাবল বব। সাপটার ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে ধীরে

ধীরে গায়ের জ্যাকেট খুলল। ওটা দিয়ে সাপটাকে চেপে ধরে ছুঁড়ে ফেলল
পানিতে। যাক, গেল! ডুবে মরবে।

কিন্তু ববকে অবাক করে দিয়ে ডুবল না বাচ্চাটা। সাঁতরে আসতে লাগল
আবার বোটের দিকে। তবে উঠতে পারল না। বোটের গা ঘেঁষে ঘুরে গিয়ে ডাঙায়
উঠল। ঢুকে পড়ল ঘাসের ভেতরে।

ওবার কথা বিশ্বাস করতে শুরু করল বব। এতটুকুন বাচ্চাও বড়গুলোর চেয়ে
কম পাইজি নয়। পারবে। ওগুলো খুন করতে পারবে কিশোর আর মুসাকে।

গা কাঁপছে তখনও ববের। কেবিনে এসে ঢুকল। খিদে পেয়েছে। কিছুক্ষণ
বসে থেকে জিরিয়ে নিয়ে খাবার বের করল। কোনমতে কিছু কুখাদ্য গিয়ে নিয়ে
ইয়া বড় এক আম বের করল। ভাগিয়স এটা ছিল, নইলে কি যে হত! আম থেয়ে
বমি ঠেকাল সে।

থেয়েদেয়ে শান্ত হয়ে ডিমের থলেটা নিয়ে তীরে নামল সে। বনের ভেতর
দিয়ে চলল আইল্যান্ডেন গায়ে। কিছুদূর এগিয়ে সরে এল নদীর কিনারে।
শর্টকাট একটা পথ খুঁজে বের করেছে সে। সেটা ধরে এগোল। চেনা হয়ে গেছে
পথ। অঙ্ককারেও চিনে চিনে চলে যেতে পারবে এখন গায়ে।

আকাশে ক্ষয়া ঘোলাটে চাঁদ। আবছা আলোয় পথ দেখে দেখে এগোল সে।
গায়ে এসে যখন ঢুকল সমস্ত গ্রাম তখন ঘুমিয়ে। কি আর করবে লোকে? রাতে
কিছুই করার নেই এখানে। সময় কাটানোর কোনও উপায় নেই। তাই সঙ্গে হলেই
থেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

জাহাজটাও অঙ্ককার। মনে হয় না কেউ জেগে আছে। তবু সাবধান রইল
বব। পা টিপে টিপে চলল। এসে দাঁড়াল পানির কিনারে। ভাল করে তাকিয়ে
দেখল নলখাগড়ার ভেতরে কুমির লুকিয়ে আছে কিনা। মনে মনে গাল দিল
হতচ্ছাড়া জানোয়ারগুলোকে। শয়তামগুলোর জ্বালায় পানিতেও নামা যায় না
নিশ্চিন্তে। দেখা গেল না একটাকেও। পানিতে পা দিল। বরফের মত ঠাণ্ডা।
খিঁচড়ে গেল মেজাজ। ভাবল-লোকে যদি জানত, খুন করা কত কঠিন কাজ,
তাহলে কিছুটা হলেও সদয় হত খুনীর প্রতি।

কিছুদূর হেঁটে এগোল সে। বেশি পানিতে এসে সাঁতরাতে শুরু করল। থলেটা
তুলে রেখেছে ওপরে। ধীরে ধীরে শব্দ না করে সাঁতরাচ্ছে।

জাহাজের কাছে পৌছে কান পাতল শোনার জন্যে। আগের মতই নীরব।
ঘুমিয়ে আছে সবাই। যাক, ভালই হয়েছে, ভাবল সে।

থলের মুখ খুলল। এখন ছুঁড়ে দিলেই ডেকের ওপর পড়বে ওটা। ডিমগুলো
ভেঁড়ে বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। কম করে হলেও চল্লিশটা ডিম রয়েছে ভেতরে।
এতগুলো বাচ্চা বেরোলে সারা জাহাজে ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেগুলোর পায়ের নিচে
পড়বেই। ক্যাপ্টেমেরও। কামড় থেয়ে মরবে সবগুলো।

তারপর, এই স্কুনারের মালিক হয়ে বসবে বব। সোজা এটা নিয়ে চলে যাবে
থার্সডে আইল্যান্ডে। ওখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। ওদের সহযোগিতায়
মুক্তো ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে চোরাচালান চালিয়ে যেতে পারবে অস্ট্রেলিয়ার উপকূল
থেকে বিভিন্ন দ্বীপে। ওখানে মদের খুব চাহিদা। আদিবাসীদের, কাছে মদ বিক্রি

কর্তা বেআইনী। অনেক দিন আগে যখন এখানে এসেছিল বব, চুটিয়ে মদের ব্যবসা করেছিল।

আকাশ কুসুম কল্পনা করতে করতে থলেটা ছুঁড়তে যাবে এই সময় তাকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল হাইসেল। নিচয় নজর রেখেছেন ক্যাপ্টেন। অঙ্ককারে জাহাজের দিকে মানুষ সাঁতরে যেতে দেখে সাবধান করে দিয়েছেন ছেলেগুলোকে।

ততো হয়ে গেল ববের মন। ওঝার মন্ত্রে কোনও কাজ হয়নি। অথবা বিচ্ছুট চামড়ার সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে। সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারছে না ওটা।

কহ, থলে ছোঁড়া আর হলো না। তীরের দিকে রওনা হতে যাবে, এই সময় আবার বেজে উঠল বাঁশি। শেষ হলো বিচ্ছি একটা কঁক শব্দ দিয়ে। ও, এই ব্যাপার। এতক্ষণে চিনতে পারল বব। রার্ড অভ প্যারাডাইজ। একজন আদিবাসী একটা পাখি দিয়ে গেছে গোয়েন্দাদেরকে। জাহাজে খাঁচায় বসে সেটাই ডাকছে। তীক্ষ্ণ বাঁশির মত ডাক।

হাঁপ ছাড়ল বব। তবু, আর ডেকে থলে ছোঁড়ার বুদ্ধিটা ভাল লাগল না। শব্দ হলে যে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে দেখার জন্যে। যা করার নিঃশব্দে করতে হবে। ডেক ছাড়া আর কোথায় ফেলা যায় খুঁজতে শুরু করল সে। একটা কেবিনের পোর্টহোল দেখতে পেল। সাঁতরে কাছে চলে এল ওটার। এক হাত বাড়িয়ে ধার খামচে ধরে শুধু হাতের সাহায্যে উঁচু করল শরীরটা। ভেতরে উঁকি দিল। একটা কেবিন। ডেকে বেরোনোর দরজাটা বন্ধ। ভেরি গুড। থলেটা এখানে ফেললেই বোধহয় ভাল হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে। কেউ ঢুকলেই কামড়ে দেবে। তারপর খোলা দরজা দিয়ে ডেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত জাহাজ। প্রতিটি মানুষকে খুন করবে।

আর দ্বিধা করল না বব। থলেটা ভেতরে ঢুকিয়ে ছুঁড়ে মারল। বোধহয় দেয়ালে লেগেই বাড়ি খেয়ে ডিমের খোসা ভাঙার মড়মড় শব্দ হলো। চিৎকার করে উঠল একটা কর্ণ, ‘কে?’

কিছুই দেখার প্রয়োজন বোধ করল না আর বব। তাড়াতাড়ি সাঁতরে চলল তীরের দিকে। ভাঙায় উঠে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে। ভাবল, পরে আবার ফিরে আসবে এখানে। জঙ্গীদের সাথে মিলে কবর দেবে লাশগুলোকে, মায়াকান্না কান্দবে। নিজের অজান্তেই মুচকি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

*

চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। ‘কি হলো?’

‘আজ আবার কিছু ঘটেছে,’ জবাব দিল মুসা।

‘কাগুটা শুরু হলো কি!’ রবিন বলল।

‘পোর্টহোল দিয়ে কি যেন ঢুকল মনে হলো। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ভাঙল,’ নানা বলল।

‘শ্বন্ন না তো?’ রবিনের প্রশ্ন।

‘উহ। জেগে ছিলাম। প্রথমে পাখিটা চিৎকার করে উঠল। একটু পরেই পার্টহোল দিয়ে কেবিনে এসে পড়ল কি যেন।’

‘বাদুড়-টাদুড় হতে পারে। তুল করে তুকে পড়েছে। ঘুমাও।’

‘বাদুড় ওভাবে তুকতেই পারে না।’ ঘুমাল না কিশোর। ‘বরং আলো জ্বর্ণে দেখল। চেচিয়ে উঠল, ‘সর্বনাশ! কিলবিল করছে সাপের বাচ্চা।’

সামান্য তন্দ্রা যা-ও বা ছিল মুসা আর রবিনের, দূর হয়ে গেল। পুরোপুরি জেগে গেছে। লাফিয়ে উঠে বসতে গিয়ে কেবিনের ছাতে বাড়ি লাগল মুসার মাথা। ওপরের বাংকে রয়েছে সে। নিচে তাকিয়ে দেখল মেঝেতে শুধু সাপ আর সাপ।

বাংক থেকে ঘুমজড়িত কঢ়ে ক্যাপ্টেন বললেন, ‘কি বললে? সাপ?’ নিচে তাকালেন। ‘ও, বাচ্চা সাপ। কিছু করবে না।’

কিন্তু কিশোর চিনতে পেরেছে বাচ্চাগুলোকে। আসার আগে চিড়িয়াখানায় অকারণে যাতায়াত করেনি। ফণা তুলে রেখেছে কয়েকটা বাচ্চা। মারাত্মক বিষাক্ত কালকেউটের বাচ্চা, চিনতে অসুবিধে হলো তার।

‘কেউটে!’ বলল সে। ‘ছোট বটে। কিন্তু ওরকম একটাই আপনাকে খুন করে ফেলার জন্যে যথেষ্ট।’

দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে ফাস্ট-এইড কিটটা। হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিল সেটা। ‘কামড় খাওয়ার আগেই তৈরি হয়ে যাওয়া ভাল।’

সিরিঞ্জে অ্যানিটটক্সিন ভরে প্রথমে মুসাকে ইনজেকশন দিল সে। তারপর রবিন আর ক্যাপ্টেনকে। সব শেষে নিজেও নিল।

দরজার দিকটা দেখিয়ে মুসা বলল, ‘ভয় দেখিয়ে হয়তো বের করে দেয়া যাবে।’

‘খবরদার,’ বাধা দিল কিশোর। ‘খুলো না। জানোয়ারগুলোকে কামড়ে মেরে ফেলবে।’

‘না বের করলে তো আমাদেরকে মারবে। অ্যানিটটক্সিন যে কাজ করবেই, শিওর হয়ে বলতে পারো না।’

‘করবে। আর কামড় খেতে যাবই বা কেন আমরা। সতর্ক থাকব। নড়বে না। চুপ করে শুয়ে থাকো।’

শ্বেক গ্লাভস পরল কিশোর। একটা ব্যাগ বের করল। বলল, ‘যে-ই ছুঁড়ে দিয়ে থাকুক, একটা মস্ত উপকার করেছে আমাদের।’

হাঁ হয়ে গেছেন ক্যাপ্টেন। ‘খুব ঠাণ্ডা মাথার ছেলে তুমি। এ রকম সময়ে সাপের বাচ্চা ধরতে যাচ্ছ।’

হেসে উঠল কিশোর। ‘ধরার এটাই সবচেয়ে ভাল সময়।’

মোটা দস্তানায় হাত ঢাকা। সাপের দাঁত ওটা ভেদ করে চামড়ায় তুকতে পারবে না। পায়ে পরেছে ভারি বুট। সেখানেও কামড় বসাতে পারবে না সাপ। সব রকমে তৈরি হয়েই সাবধানে এগোল বাচ্চাগুলোর দিকে। খপ করে একটা বাচ্চার ঘাড় চেপে ধরে থলেতে ঢোকাল।

‘আমি আসি?’ মুসা বলল। ‘তোমাকে সাহায্য করব।’ হাত নিশপিশ করছে তার।

রবিনও সাহায্য করতে চাইল।

‘চূণ করে বসে থাকো,’ দু’জনকেই বলল কিশোর। ‘সবাই মিলে কামড় গান্ধারা দণ্ডকার নেই।’

গান্ধা ততক্ষণে বুট পরতে শুরু করেছে মুসা। অনেক শয়ে থেকেছে। কিছু গান্ধা ন্যাতে চায়। নেমে পড়ল মেঝেতে। সবত্র ছড়িয়ে রয়েছে সাপ। সেগুলোর মানাখানা দিয়ে চলার সময় রীতিমত জংলী-নৃত্য নাচতে হলো তাকে। সে-ও হাতে দশানা পরে নিয়েছে। দু’হাতে দুটো বাচ্চা ধরে থলেতে ঢোকাল। কিশোরের চেয়ে খাল ন্যাতে পারছে সে। ছোবল মারার চেষ্টা করছে সাপ। বট করে হাত সরিয়ে ন্যাতে মুসা। পরক্ষণে আরেক হাত দিয়ে ঘাড় চেপে ধরছে।

গান্ধা ধরে ছড়িয়ে পড়ছে সাপের বাচ্চা। বাংকে বসে তাকিয়ে আছে রবিন। গান্ধারা আর মুসাকে মাহায করার জন্যে নামবে কিনা বুঝতে পারছে না। দ্বিধা ন্যাতে ন্যাতে শেষে মুসার মত বুট পরে ন্যাতে পড়ল।

গান্ধেটেনের মনে হলো, ভারি কিছু দিয়ে শরীরটাকে টেকে ফেলাই বুদ্ধিমানের ন্যাত। এখন দিয়ে আপাদমস্তক টেকে ফেললেন তিনি। অথবা শরীর খোলা রেখে ন্যাতে গুরুক নেয়ার কোনও মানে হয় না।

গান্ধা বেয়ে উঠে পড়ল একটা বাচ্চা। হঠাৎ ক্যাপ্টেনের বুকে শিরশির করে দশল ন্যাত মেন। আতঙ্কে চিৎকার করে এক টানে কম্বল সরিয়ে বুকে থাবা মারলেন। গান্ধা। ধরেন মাঝখানে উড়ে গিয়ে পড়ল সাপের বাচ্চা। এমন জোরে চেঁচাতে শান্তেন মেন মেরে ফেলা হচ্ছে তাঁকে। জুলন্ত দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে ন্যাত। গান্ধা শাসালেন, ‘আর কোনদিন যদি তোমাদের মত পাগলকে জাহাজ ভাড়া দেওয়া আমার নাম বাউয়েন নয়! ’

গান্ধা কথা যেন কানেই চুকল না তিন গোয়েন্দার। সাপ কুড়াতে ব্যস্ত ওরা।

গান্ধেয়ে যে ক’টা সাপ চোখে পড়ল ওদের সব তুলে থলেতে ভরল ওরা। ন্যাতে ন্যাতে খেপানোর জন্যেই কিশোর বলল আরেক দিকে তাকিয়ে, ‘যা পেলাম না দেশলাম। কিন্তু দু’তিনটে যে বাংকের তলায় চুকে গেছে ওগুলোর কি করিব। ’

‘ন্যাতু করার দরকার নেই!’ ফেটে পড়লেন বাউয়েন। ‘ওগুলো ওগুলোর আগন্ধায থাক। খোঁচাতে হবে না। ঘুমোতে দাও আমাকে। কয়েকটা বাচ্চা সাপ, ন্যাতে আনার এত কাণ্ড...’

‘ন্যাতেন্টা বাচ্চার দাম কত জানেন? কম ক’র ইলেও পাঁচ হাজার ডলার।’ ন্যাতেন মুখ বন্দ করতে করতে কিশোর বলল। তারপর যেন নিজেকেই বোঝাল, ন্যাত। ন্যাত। বাগের মধ্যেই থাক। কাল খাঁচায় ঢোকাব। ’

*

ন্যাত। ন্যাতু আর উভেজনার মধ্যে কাটাল বব। ভাল ঘুম হলো না। ভোর ন্যাতেন্ট ন্যাতে এল বিদেশীদের কবর দেয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। কিন্তু গাছের ন্যাত। ন্যাতে জাহাজের দিকে তাকিয়েই বোকা হয়ে গেল সে। কালো হয়ে গেল ন্যাত। ন্যাতে টেবিল চেয়ার পেতে নাস্তা করতে বসেছে তিন গোয়েন্দা আর ন্যাতেন।

চোল্দ

আবার জন্ম-জানোয়ার ধরতে বেরোল দলটা। তিন গোয়েন্দাৰ সঙ্গে ডিয়া আৱ নগোও চলল। কমবেশি সুস্থ হয়ে গেছে সবাই। বনেৱ ভেতৱ দিয়ে চলত্বে চলতে ধৰার মত জানোয়াৰ খুঁজতে লাগল ওৱা, একমাত্ৰ ডিয়া বাদে। নিচৰে দিকে তাকিয়ে পথ চলছে সে। জানোয়াৰেৱ কথা একবাৱও ভাবছে না। সে খুঁজছে মাথা। একটা মাথা ইতিমধ্যেই পেয়েছে, তবে তত ভাল নহি। ভাল জিনিস চায় সে।

‘বেৰোনোৱ পৱ থেকে একটা কথাও বলোনি।’ মুসা জিজেস কৱল, ‘কি হয়েছে?’

‘মুখ তুলে তাকাল ডিয়াঁ। বাদামী মুখে উৎকৃষ্টার ছাপ। ‘না, তেমন কিছু না।’

‘তেমন কিছু তো বটেই। কি হয়েছে? বলো?’

‘লোকেৱো...আমাকে নিয়ে মজা কৱে।’

‘কেন?’

‘আমি কোনও মাথা জোগাড় কৱতে পাৱিনি বলে।’

‘কিসেৱ মাথা?’

‘মানুষেৱ,’ হাতেৱটা দেখাল ডিয়া। ‘এ রকম।’

‘কি দৱকার?’

‘বড় মানুষ হওয়াৱ জন্যে। যতদিন একটা মাথা জোগাড় কৱতে না পাৱব ততদিন বড় হলেও বড় ধৰা হবে না আমাকে, পুৱৰ্ষ বলা হবে না। কেন, তোমাদেৱ দেশে কাৱও মাথা কাটতে হয় না?’

‘আমাদেৱ দেশে একটা মাথা কাটলেই জেলে যেতে হবে।’

‘জেল কি সেটা বোৰাতে অন্তৰেক বেগ পেতে হলো মুসাকে।

‘কি বুঝল ডিয়া কে জানে, শেখু বলল, ‘ও। তাহলে টামবাৱানে রাখাৱ জন্যে মাথা পাও কোথায়?’

‘আমাদেৱ দেশে টামবাৱানও নেই।’

‘বলো কি? অবাক কাণ্ড!’

‘হ্যাঁ, তোম্যার কাছে অবাক লাগবে। তোমাদেৱ রীতিনীতি যেমন আমাদেৱ কাছে লাগে।’

‘তাহলে পুৱৰ্ষ যে হয়েছ কি দিয়ে প্ৰমাণ কৱবে?’

‘পুৱৰ্ষেৱ মত আচৰণ কৱব, তাহলেই হবে। ভাল কৱে ভেবে দেখো, কাৱও মাথা কাটলেই পুৱৰ্ষ হওয়া যায় না। ধৰো, এৱ জন্যে কোনও মেয়েলোক কিংবা শিশুৱ মাথা তোমাকে কাটতে হলো। ওৱা তো তোমাকে বাধা দিতে পাৱবে না, গায়েৱ জোৱে পাৱবে না। তাহলে বীৱতুটা দেখালে কোথায়?’

‘অতশ্চ বুঝি না। মাথা একটা দরকার, জোগাড় করতেই হবে। নইলে পুনর হতে পারব না। ছোট মানুষই থেকে যাব।’ পাহাড়ের ওপারের গাঁয়ে যাবে আমার সঙ্গে? শক্রদের গাঁয়ে? বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকব। খেলতে খেলতে কোন উপলেখ্যে চলে এলে ধরে মুণ্টা কেটে নিয়ে চলে আসব।’

‘ওয়া, কাজটা কি ভাল হবে মনে করো?’

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ডিয়া। মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগল। একসময় পানাম করলে, ‘না, তা হবে না। কিন্তু এটাই আমাদের রীতি। আমার একটুও ভাল পাগে না এসব খুনোখুনি। ঘৃণা করি আমি। কি করব, বলো?’

‘না করলেই পাগলা। তুমি বড় হয়েছ। বুদ্ধি হয়েছে। বিবেচনা আছে। নিজের অভিযন্ত্রকে কেন্দ্রবে এ রকম একটা খারাপ কাজ?’

ডিয়ার জন্যে এটা একটা নতুন তত্ত্ব। এমন ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকাল নামা। দেখে, যেন এই প্রথম দেখছে ওকে। ‘কিন্তু আমাদের রীতি?’

‘নদেলে ফেলো। গাঁয়ের সব ছেলেদের নেতা হতে পারো তুমি। ওদেরকে নামা। তেও পারো। ওরা তোমার দলে চলে আসবে। তোমার কথা মেনে নেবে। নামা। খারাপ কাজকে কেউই পছন্দ করতে পারে না। অনেক ভাল ভাল রীতি চালু নামা। পারো তোমাদের গাঁয়ে। খারাপ রীতি বর্জন করাই ভাল মানুষের কাজ।’

ওনাব দিল না ডিয়া। নতুন এক জগতের সন্ধান পেয়েছে যেন। চিন্তিত নাম। নিখিল পদক্ষেপ। যেন ইতিমধ্যেই বড় হয়ে গেছে।

‘ওই যে,’ হাত তুলল সে। ‘ক্যাঙ্করু।’

গোপের ভেতরে তাকাল মুসা। দেখতে পেল না। ‘কই? কোথায়?’

‘গাছের ওপর।’

‘ক্যাঙ্করু গাছ বাইতে পারে না।’

‘আমাদের এখানকারগুলো পারে। দেখোই না। বললে ধরতে পারি।’

মাগে আগে হাঁটছিল কিশোর, রবিন আর নগো। মুসা আর ডিয়াকে দাঁড়িয়ে নামাতে দেখে ফিরে এল।

পাণ্ঠাটাকে দেখে কিশোর বলল, ‘চমৎকার বে। অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙ্করুর চেয়ে আগাম। কি নাম দেয়া যায় এটার? গেছো ক্যাঙ্করু?’

নাম না খুশি দিকগে, তা নিয়ে মাথাব্যৱহাৰ নই ডিয়ার। গাছ বেয়ে উঠতে আগন্তু নামল সে। যেন ওই জীবটার মতই আরেকটা গেছো ক্যাঙ্করু সে। তাকে নামা। দেখে আরও ওপরে উঠে গেল জানোয়ারটা। মাদী জীব। পেটের কাছে নাম। দেখে উকি দিয়ে আছে একটা বাচ্চা। বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে।

নামান্ত ক্যাঙ্করু তার থাবা ব্যবহার করতে পারে না, ছোট আর দুর্বল বলে। নামা। নামাতে থাকতে গেছো ক্যাঙ্করুর থাবা শক্ত হয়ে গেছে। বড় নখও নাম। নামে বাকল আঁকড়ে ধরে চড়ার সুবিধের জন্যে।

‘নামা। তো দেখি শরীরের চেয়ে লম্বা,’ মুসা বলল। ‘বানরের মত লেজে নাম। পাশে নাকি?’

নামা। নামে কিশোর। ‘না। বানরের মত লেজ নয়। আরেকটা পায়ের মতই।’

কাজ করে এটা। দেখো ভাল করে, কিভাবে কাজ করছে।'

ডালের ওপর দিয়ে আরও সরে যাচ্ছে ক্যাঙ্গারুটা। যাতে ডিয়া ধরতে না পারে। ডালে হাঁটা সহজ নয়। লেজটা লম্বা করে দিয়ে আরেকটা ডালে ঠেকিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছে জীবটা, তারপর স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে যাচ্ছে ডাল দিয়ে।

ডাল ধরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ডিয়াও এগোতে থাকল। আটকে গেল ক্যাঙ্গারু। আর এগোনোর জায়গা নেই। সবে তার গায়ে হাত ছুঁইয়েছে ডিয়া, এই সময় লাফ দিল ওটা। চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে।

‘খাইছে!’ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ‘মারা পড়বে তো!'

‘উহু,’ মাথা নাড়ল কিশোর। ‘বুঝেই লাফ দিয়েছে। মরবে না। দেখো।'

কিশোরের অনুমানই ঠিক। এত উঁচু থেকেও আলগে লাফিয়ে নেমে পড়ল ক্যাঙ্গারুটা, কিছুই হলো না। পা তো নায়, যেন ইস্পাতের স্প্রিং। ঝাঁকুনিটা ঠিক হজম করে নিল।

‘ধরো! ধরো!’ বলে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

ছুটে গেল কিশোর আর রবিন। দু’দিক থেকে দুটো থাবা ধরে ফেলল। শরীর মুচড়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল ক্যাঙ্গারুটা। শক্ত করে ধরে রাখল দু’জনে।

এগিয়ে এসে ঘাড় চেপে ধরল মুসা। ‘কামড়াবে না তো?’

‘কি জানি। সরে থাকো। লাথি মারতে পারে। পেছনের পায়ের লাথি থেলে চিত হয়ে যাবে।’

কিষ্ট তণভোজী প্রাণীটা সে-রকম কিছুই করল না। ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে। নিচ গলায় ওটার সঙ্গে কথা বলতে লাগল মুসা, ‘ভয় পাসনে, ক্যাঙ্গারু। কিছু করব না তোকে। মারব না।’

বাচ্চাটাকে দেখতে পেল না। থলের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। আছে। বড় বড় চোখ মেলে থাকা বাচ্চাটা বড়জোর ফুটখানেক লম্বা।

‘এত ছোট,’ মুসা বলল। ‘এইমাত্র জন্মাল নাকি?’

‘আরে না। এ তো অনেক বড় হয়েছে। জন্মের সময় মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা থাকে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা।’

বাচ্চাটাকে আবার থলেতে ছুড়ে দিল কিশোর।

ভাল একটা জানোয়ার পাওয়া গেছে। ওটার গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে এগোল দলটা আবার। খানিক দূর এগিয়েই ওপর দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মুসা। বড় একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের নিচু ডালে যেন একটা খেলনা টের্চি ভালুক ফেলে রেখে গেছে কোনও বাচ্চা মেয়ে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে মুসা, হঠাৎ যেন প্রাণ পেয়ে গেল খেলনা ভালুক। দ্রুত গাছ বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে চায়। ওটাকে ধরে ফেলল মুসা। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল না জীবটা। জুলজুল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যেন জানতে চায়, ‘শক্র, না বন্ধু?’

‘বন্ধু,’ হেসে অভয় দিল যেন জানোয়ারটাকে মুসা। আরও ওরকম জানোয়ারের জন্যে আশপাশের গাছে তাকাতে লাগল।

‘অন্য গাছে তাকিয়ে লাভ নেই,’ কিশোর বলল। ‘ইউক্যালিপ্টাস ছাড়া আব

কোনও গাছের পাতা খায় না কোয়ালা।'

'এত ছোট। আসলেই কি ভালুক?'

'না। ওই দেখতেই যা ভালুকের মত।'

'কোয়ালা মানে কি?'

'যে পানি খায় না।'

'তা কি করে হয়। পানি ছাড়া প্রাণী বাঁচে না।'

'কোয়ালা বাঁচে। শিশির আর ইউক্যালিপ্টাসের' পাতা থেকে যা রস সংগ্রহ করে তাতেই হয়ে যায়। ভালই হয়েছে। খুশি হবেন চিড়িয়াখানার ডিরেষ্টর।'

ক্যাঙ্কারুর দড়িটা বাড়িয়ে দিয়ে মুসা বলল, 'ধরো। আমি ভালুকটাকে কিছু পাতা খাওয়াই।'

বড় বড় কিছু রসাল পাতা ভেঙ্গে কোয়ালার দিকে বাড়িয়ে ধরল মুসা। বন্ধুত্ব হতে দেরি হলো না। গত কয়েকশো বছরে মানুষ কোয়ালার সঙ্গে কোনরকম শাশ্রিতা করেনি, ফলে মানুষকে ভয় পায় না এরা। কয়েকটা পাতা থেয়েই আরাম করে এসে মুসার কাঁধে চেপে বসল ওটা। পালাবে বলে মনে হয় না। তবু নতুন ধরা হয়েছে তো। বলা যায় না। তাই একহাতে ওটাকে ধরে রাখল সে।

আরও কিছু ছোট প্রাণী ধরা হলো। এই যেমন গ্রেট ফ্লাইং ফ্যালাঞ্জার। তবে যেটাকে ধরা হয়েছে সেটা তেমন উড়তে পারে না। কারণ এখনও বাচ্চা। ওড়ার নায়দাটা ভালমত রপ্ত করতে পারেনি। বড় হলে গাছ থেকে গাছে সহজেই উড়ে নেঢ়াতে পারবে উড়ুকু কাঠবিড়ালী কিংবা ফ্লাইং ফল্সের মত। উড়তে গিয়ে ডিয়ার সামনে পড়ে গিয়েছিল। খপ করে ধরে ফেলেছে সে।

নগো ধরল একটা কাসকাস। চমৎকার রোমশ চামড়া। লম্বা লেজ। আর বড় ১৬ চোখ।

খরগোশের আকারের আরেকটা প্রাণী ধরল রবিন। ক্যাঙ্কারু গোষ্ঠীর এই গোটার নাম ব্যানডিকুট। লম্বা শক্তিশালী পা, পিঁপড়েভুকের মত নাক, আর পারাল নখ আছে।

একটা বাচ্চা কেশোয়ারী পাথি ধরা হলো। উড়তে পারে না এরা। উটপাথির মত অনেক বড় হয়।

সব শেষে ধরা হলো একটা ওরাং-উট। যেটা নিউ গিনিতে দুর্লভ।

সেদিনের মত জানোয়ার ধরা শেষ হলো। গাঁয়ে ফিরে চলল মানুষ আর জন্তুর নাচে দলটা।

পনেরো

পর্যাদিন থারাপ সংবাদ নিয়ে এল ডিয়া। ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল তখন মুসা। ছেলেটার চেতাবা দেখেই অনুমতি করল কিছু হয়েছে। কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গেছে চোখ।

‘কি হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল মুসা।

‘আমার বোন...মারা গেছে।’

বেরিয়ে এল কিশোর। ‘কে মারা গেছে?’

‘আমার বোন। নদীতে গোসল করতে নেমেছিল। হাঙরে মেরেছে।’

‘কি করে বুঝলে?’

‘যে মেরেছে সেটার সারা গা সদা। পিঠে একটা উঁচু পাখনা, সেটা কালো। অনেক বড়। প্রায় এই জাহাজটার সমান। মুখটা দরজার সমান বড়।’

‘বাড়িয়ে বলছে,’ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। ‘তবে শুনে মনে হচ্ছে সাদা হাঙর। ভয়াবহ খুন্নী। হাঙর পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। সেজন্যেই এর নাম রাখা হয়েছে দা হোয়াইট ডেথ বা শ্বেত মৃত্যু।’ ডিয়ার কিকে ফিরে বলল, ‘চলো, তোমার বোনকে দেখি। সত্যিই মারা গেছে, না শুধু বেহশ হয়েছে। কোথায় ও?’

‘চলে গেছে।’

‘কই গেল?’

‘হাঙরের ভেতরে।’

ক্যাপ্টেন বাউয়েনও শুনছিলেন। বললেন, ‘বানিয়ে বলছে। অন্য কিছু হবে। হাঙর থাকে সাগরে। নদীতে আসে না।’

‘আমি বিশ্বাস করছি,’ কিশোর বলল। ‘আপনি সাগর চেনেন, ক্যাপ্টেন, কিন্তু নদী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন না, বুঝতে পারছি। হাঙরেরা নদীতেও চুকে পড়ে। আমাজনের দু’হাজার মাইল ভেতরেও হাঙর পাওয়া গেছে। এমনকি লেক নিকারাণ্যার মিষ্টি পানিতেও হাঙর বাস করে।’

‘দূর,’ হাত নেড়ে কিশোরের কথা উড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। ‘আমি বিশ্বাস করি না।’

‘করবেন, এখনই।’ রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিশোর। ‘দেখে যান।’

ডেকের কিনারে এসে নিচে তাকালেন বাউয়েন। সাবমেরিনের সমান বিরাট একটা প্রাণী সাঁতার কাটছে। তিন কোনা কালো পাখনা বেরিয়ে রয়েছে পানির ওপরে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থেকে কিশোরের দিকে ফিরলেন তিনি, ‘ঠিকই বলেছ। হাঙরটাই। হোয়াইট ডেথ। যা সাইজ দেখছি, তিন টনের কম হবে না। কিন্তু আস্ত একটা মেয়েকে খেল করে?’

‘শ্বেত হাঙর আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলেছে বলে শোনা যায়,’ কিশোর বলল। ‘ওই দেখুন, কামড়ে এখন আপনার জাহাজটাকেও খেয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।’

‘আরি! ভীষণ ত্যাদড় তো! ব্যাটাকে শায়েস্তা করা দরকার।’ দৌড়ে নিচে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। উঠে এলেন রাইফেল নিয়ে। গুলি করলেন। হাঙরের গায়ে লেগে পিছলে গেল বুলেট, গাছে লাগলে অনেক সময় যেমন হয়, তেমনি বিহং করে চলে গেল গাঁয়ের ভেতর।

‘বাদ দিন,’ কিশোর বলল। ‘পারবেন না। রৱং পিছলে গিয়ে মানুষের গায়ে গুলি লাগতে পারে ডেথ নীডল নিয়ে আসি।’

যে যন্ত্রটার নাম দেখ নীডল, ওটা অনেকটা ইঞ্জিকশনের সিরিজের মতই দেখতে, তবে অনেক বড়। ভেতরে স্ট্রিকনিন নাইট্রেট ভরা থাকে। ফায়ার করা থ্যাংকুকের সাহায্যে। হাঙরের পুরু চামড়াতেও ঢুকে যায় সুচ, ভেতরের বিষ ছাড়িয়ে পড়ে রক্তে। অনেক বড় মাছকেও মেরে ফেলে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে।

দেখ নীডল ছুঁড়ল কিশোর। হাঙরের চামড়ায় ঢুকলও। কিন্তু তিরিশ সেকেন্ড পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কিছু ঘটল না। এক মিনিট গেল...পাঁচ...দশ...

নাহ, কিছুই তো হচ্ছে না!

নদীর পাড়ে এসে জমা হয়েছে গায়ের লোক। অনেকের হাতে তীর-ধনুক। একবাক তীর উড়ে এল হাঙরটার দিকে। কিছু তীর চামড়ায় লেগে পিছলে চলে গেল, কিছু কিছু বিধল, বড় জোর একাধি ইঞ্চি। বিধে রইল শজারুর কাঁটার মত। পাতাই দিল না হাঙরটা।

টারু নামে একটা লোক এগিয়ে এল। গায়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ সে। পায় সাত ফুট লম্বা। পেটানো স্বাস্থ্য। যেন একটা দৈত্য। চোখা বল্লম হাতে পানির কিনারে এসে দাঁড়াল সে। হংকেড় করে উঠল জনতা। হ্যাঁ, কেউ যদি শায়েস্তা করতে পারে হাঙরটাকে, টারুই পারবে, ওদের ধারণা।

তীরে থেকে বল্লম ছুঁড়ল না টারু। নেমে গেল পানিতে। দানবটার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে। বল্লম তুলল সে। বাদামী চামড়ার নিচে কিলবিল করে ফুলে উঠল পেশী। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাঙরের কপাল সই করে বল্লম ছুঁড়ল। মাংসের অনেক গভীরে ঢুকে গেল ফলা। কিন্তু সামান্যতম কাঁপল না হাঙরটা। কিছুই হলো না। ওটার। কপালের ওপর বল্লম বিধে রইল পুরাকথার ইউনিকর্নের শিং-এর মত।

তীরের দিকে ফিরে আসছে টারু। বুঝতে পারেনি হাঙরটা তাকে আক্রমণ করবে। লেজের প্রচণ্ড এক বাড়ি দিয়ে তাকে চিত করে ফেলল ওটা। কামড়ে ধরল মামরের কাছটায়। বড় বড় তিন কোনা দাঁতগুলো বসে গেল মাংসে। চিৎকার করে উঠল টারু।

খেপে গেল ডিয়া। শয়তানটা তার বোনকে খেয়েছে। এখন তারই আরেক গামকাসীকে খেতে চলেছে। দানবটাকে ঠেকানো এখন তার কর্তব্য।

‘দেখি, তোমার কুড়ালটা দাও তো,’ জরুরী কণ্ঠে কিশোরকে বলল সে। গোন কুড়ালের কথা বলছে বুঝতে পারল কিশোর। সাংঘাতিক ধারাল ইস্পাতের তাৎক্ষণ্যে কুড়ালটার কথা বলছে।

‘কি করবে?’

‘খুন করব শয়তানটাকে।’

‘পাগল। তোমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা যা পারেনি, তুমি একটা তাৎক্ষণ্যে কুড়াল দিয়ে তা পারবে?’

‘চেষ্টা তো করতে হবে।’

টারুকে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে হাঙরটা।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, ‘কিছুই করতে পারবে না। তাম কোপাবে আর ওটা চুপ করে থাকবে মনে করেছ?’

‘এত কথা শুনতে চাই না। কুড়ালটা দেবে কিনা বলো?’

টারুর আর কোনও আশা নেই, বুঝে গেছে কিশোর। কিছুই করার নেই আর। তবে ডিয়ার সাহসকে মনে মনে শুন্দি জানাল সে। এনে দিল কুড়ালটা।

‘বড় দেখে একটুকরো মাংস দাও,’ কুড়ালের ধার পরিষ করতে করতে বলল ডিয়া।

বেহেশ হয়ে গেছে টারু। কিংবা মরেও গিয়ে থাকতে পারে। ছটফটও করছে না আর। নির্বিবাদেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে যাচ্ছে হাঙরটা।

গরুর রানের একটা বড় অংশ এনে দিল কিশোর। তারপর অবাক হয়ে দেখতে লাগল ডিয়া কি করে।

দেখতে দেখতে টারুকে শেষ করে ফেলল দানবটা। তারপরেও যেন খিদে মেটেনি ওটার। ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে শুই জায়গাতেই। আরও শিকারের আশায়। তার কাছে গেল না ডিয়া। নদীর উজানের কাছে পানিতে একটা পাথর উঁচু হয়ে আছে। হেঁটে ওখানটায় গিয়ে সাঁতরে উঠল পাথরটাতে। হাঁটুপানিতে দেবে রয়েছে পাথরের কিনারা, সেখানে চলে এল সে। তারপর গোশতের টুকরো এক হাতে, আর আরেক হাতে কুড়াল নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

*

গাঁয়ের কাছে আসার আগে খাড়িতে ঢুকেছিল হাঙরটা। খাবারের গন্ধে আকৃষ্ণ হয়ে। গন্ধ আসছিল বোটের ভেতর থেকে। কাজেই টুঁ মেরে বোট ভেঙে খাবার জোগাড়ের চেষ্টা চালিয়েছিল ওটা। বোটের তলায় একটা ফোকর করে ফেলেছে।

ডায়ারি লেখার অভ্যেস আছে ববের। বসে বসে লিখছিল। কাঠ ভাঙার শব্দে চমকে গিয়ে ডায়ারি লেখা বন্ধ করে খাতাটা ব্রীফকেসে ঢুকিয়ে দেখতে গেল কি হচ্ছে। হাঙরটাকে দেখে একটা লাঠি দিয়ে ওটাকে পেটাতে শুরু করল সে।

কেয়ারই করল না হাঙর। সে তখন কিছু হাঁড়ি-পাতিল খুঁজে পেয়েছে। তাতে খাবারের গন্ধ। ওগুলোই টপাটপ গিলতে শুরু করল। হাঙরের খাবারের বাঁধাধরা কোনও নিয়ম নেই। যা পায় তাই গিলতে থাকে।

ববের চেঁচামেচিতেই তার প্রতি আকৃষ্ণ হলো হাঙরটা। ফোকরের ভেতন থেকে মাথা বের করল দেখার জন্যে কে তাকে বিরক্ত করছে। সঙ্গে সঙ্গে হড়মুু করে পানি ঢুকে পড়ল বোটের ভেতরে। তলিয়ে যেতে লাগল দ্রুত। চোয়ালেন নাগালে ববকে পেল না বটে হাঙর, তবে লেজ দিয়ে ঠিকই পেল। মারল এক ঝাপটা। উড়ে গিয়ে তীরে পড়ল বব, তার ভাগ্য ভালই বলতে হবে। কারণ পানিতে পড়লে তাকে থেয়ে ফেলত হাঙরটা।

বেহেশ হয়ে গেল বব। পড়ে রইল মরার মত।

ডুবে গেল বোট। গেলার মত অনেক জিনিস পেল হাঙর। গিলল সেগুলো। এমনকি ব্রীফকেসটাও। তারপর ধীর গতিতে রওনা হলো গাঁয়ের দিকে। এসে পেয়ে গেল ডিয়ার বোনকে। গিলল তাকেও। আরও খাবারের আশায় ঘুরখুন করতে থাকল। আর বোকার মত এসে তার চোয়ালে ধরা দিল টারু নামেন গ্রামবাসী লোকটা।

*

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ডিয়াকে।

হাঙরের আগশকি খুবই তীক্ষ্ণ। রক্তমাংসের গন্ধ পেয়ে চলে এল মদীর উজানে।

কিশোর আর মুসাও বসে নেই। ডিঙিতে করে চলে এসেছে পাথরের চড়াটার কাছে। দ্রুত উঠে পড়ল তাতে। ডিয়াকে সাহায্য করার জন্যে।

হাঙরটা যতই কাছে এল পিছিয়ে যেতে লাগল ডিয়া। মাংসের টুকরোটা নাড়ছে। মাঝে মাঝে পানিতে চুবাচ্ছে। হাঙরের নাকে গন্ধ বেশি যাওয়ার জন্যে।

আচমকা পানিতে তোলপাড় তুলে তৈরি গতিতে ছুটে এল হাঙর। মাংস খাওয়ার জন্যে হাঁ করে রেখেছে মুখ। কিন্তু ধরতে পারল না। তার আগেই নিরাপদ জায়গায় সরে গেছে ডিয়া। ধেয়ে আসায় গতি থামাতে পারেনি হাঙরটা, শরীরের সামনের দিকটা উঠে পড়ল চড়ায়। নামানোর চেষ্টা করতে গিয়ে লেজের বাড়ি মেরে পানিতে ফেনা তুলে লাগল। কিন্তু ভারি শরীর নামিয়ে আনতে পারছে না কিছুতেই। বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তৈরি হলো ডিয়া। এইবার বাগে পেয়েছে খুনীটাকে।

‘বুদ্ধি আছে,’ প্রশংসা করল কিশোর। ‘গায়ের জোরে কাজ হবে না বুঝতে পেরে মগজ খাটিয়েছে। খুব ভাল।’

‘তাকে সাহায্য করতে পারি না কোনভাবে?’ মুসার প্রশ্ন।

‘দরকার হলে তো করবই। দেখা যাক একা একা কতখানি কি করতে পারে। নাজেকে পুরুষ প্রমাণ করার জন্যে মানুষের মাথা খুঁজছিল সে। মানুষ খুন না করে এখন অন্যভাবে প্রমাণ করুক সে-বড় হয়েছে।’

‘তা ঠিক,’ একমত হয়ে মাথা দোলাল রবিন। ‘খুনে হাঙরের মাথাই কাটুক! কিন্তু ওইটুকুন কুড়াল দিয়ে কি পারবে?’

‘দেখা যাক।’

এগিয়ে গেল ডিয়া। গায়ের জোরে কোপ মারল হাঙরের ঘাড়ে। বসল না। মাঝে এল কুড়ালের ফলা।

‘দেখলে তো,’ মুসা বলল। ‘আগেই বলেছিলাম, হবে না।’

‘দেখাই যাক,’ আবার বলল কিশোর।

থামল না ডিয়া। হাঙরটা নেমে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সময় পেলে হয়তো গাবেও। কিন্তু নামতে দিল না সে। কুপিয়ে চলল। অবশ্যে কেটে গেল চামড়া।

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। দুই সহকারীর দিকে তাকাল। ‘কি বুঝলে?’

‘গালই। তবে এখনও অনেক বাকি। চামড়া কাটতেই এত কষ্ট, হাড় কাটবে না গাবে?’

‘হাঙরের ঘাড়ে হাড় নেই। শুধুই কার্টিলেজ। কোমলাস্থির মত এক ধরনের আণাদা, হাড়ের চেয়ে অনেক নরম।’

ডিয়ার বিরাম নেই। সে তার কাজ করেই চলেছে। চামড়ার চেয়ে নরম মাংস। কেটে যাচ্ছে সহজেই। অবশ্যে সত্যি সত্যি ধড় থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে গেল।

‘মেরেছে!’ চিংকার করে উঠল মুসা। ‘মেরে ফেলেছে!’

‘মারেছে কিনা এখনও শিওর না,’ কিশোর বলল।

‘মানে? মঠথা আলাদা করে ফেলল, তারপরেও মরেনি?’

জবাব না দিয়ে ডিয়ার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, ‘খবরদার, মুখের কাছে যাবে না!’

‘তার আশঙ্কাই ঠিক হলো। হাঁ হয়ে গেল হাঙরের মুখ, তারপর ওপরের চোয়াল ঝপ করে নেমে এল এত জোরে, ভাটিতে থেকে গায়ের লোকেরাও শুনতে পেল সে-শব্দ।

‘এ কি করে সম্ভব!’ মুসা তো ভীষণ অবাক।

‘কেন, আমাজানের পিরানহাদের কথা ভুলে গেছ? একই কাণ্ড করে ওই মাছ। মাথা কেটে ফেললেও বার বার চোয়াল ফাঁক করতে থাকে। কেটে ফেলার পরেও আরও আধগঢ়া জীবিত থাকে। টিকটিকির লেজ কেটে ফেললে যেমন্ত নাচতে থাকে। সাপকে মেরে ফেললে মোচড়াতে থাক্কে।’

গায়ের দিক থেকে দৌড়ে এল নগো। উত্তেজিত কঢ়ে বলতে লাগল, ‘একটা মানুষকে পেয়েছি। বেহঁশ হয়ে আছে। নদীর কিনারে। তোমাদের মত বিদেশী। তাই তাকে এনে জাহাজের ঘরে ভরে দিয়েছি। তাকে ওষুধ দেয়া দরকার। তোমাদের ওষুধ পেলেই বেঁচে উঠবে।’

হাঙরের চোয়াল খোলা আর বন্ধ করা চলতেই থাকল। দাঁতের কাছাকাছি না গিয়ে ওটাকে বয়ে আনতে সাহায্য করল ডিয়াকে গায়ের লোকে। ধড়াস করে এনে ফেলল উঠানে। আনন্দে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল ছেলে, বুড়ো, মেয়েরা। নাচতে লাগল মাথাটাকে ঘিরে। এত বড় একটা দানবকে যখন হত্যা করতে পেরেছে ডিয়া, মানুষ মারার আর দরকার নেই। সে পুরুষ হয়েছে একথা একবাক্যে মেনে নিল সবাই।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল তিন গোয়েন্দ। ডিয়াকে স্বাগত জানাল। ক্যাপ্টেন বাউয়েনও এসে হাজির হলেন। অনেক প্রশংসা করলেন তার।

তাঁকে একধারে টেনে নিল কিশোর, কথা বলার জন্যে। জিজ্ঞেস করল, ‘কেবিনে নাকি একজন লোককে রেখে আসা হয়েছে?’

‘কি বলছ? আমি কিছু জানি না। নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে হাঙরের সঙ্গে ডিয়ার লড়াই দেখছিলাম।’

‘তাই নাকি? তাহলে এখনি জাহাজে যাওয়া দরকার। বোধহয় অ্যাঞ্জিলেন্ট করেছে লোকটা। নহলে নদীর পাড়ে বেহঁশ হয়ে পড়ে থাকবে কেন? নগো বলল, ওরা নাকি তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে এসেছে। চলুন। লোকটার চিকিৎসা লাগবে মনে হচ্ছে।’



ষোলো

নড়ে উঠল বব। চোখ মেলল। গোঙাল। সমস্ত শরীর ব্যথা করছে। কি হয়েছে

ওর? আবছা ভাবে মনে পড়ল একটা হাঙ্গর হামলা চালিয়েছিল ওর ওপর।

কিন্তু এখানে এল কি করে? অপরিচিত লাগছে জায়গাটা। মনে হচ্ছে সাইক্লনের কেবিনে এনে ঢোকানো হয়েছে তাকে। একেবারে তার শক্তদের গুহায়।

দরজা খুলে গেল। ভেতরে চুকল তিন গোয়েন্দা আর ক্যাপ্টেন। ওদের আসতে দেখেই কম্বল মুড়ি দিয়ে ফেলেছিল বব। এগিয়ে এসে সেটা টেনে সরাল কিশোর। ধীরে ধীরে ঘূরল অন্য দু'জনের দিকে। ‘দেখলে বিশ্বাস করবে না! বব অ্যাঞ্জেল!’

আবার গুঙ্গিয়ে উঠল বব।

‘দেখি তো কি হলো? গোঁড়ায় কেন?’ কিশোর বলল। বেহঁশ হওয়ার ভান করে রইল বব। তার শাটের বোতাম খুলল সে। কালচে নীল হয়ে আছে পুরো বুকটা। টিপেটুপে দেখল পাঁজর ভেঙেছে কিনা।

‘ভাঙ্গেনি,’ দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। ‘তবে ব্যথা ভালই পেয়েছে। রবিন, ফাস্ট এইড কিটটা দাও তো।’

‘দাঁড়াও,’ বাধা দিলেন ক্যাপ্টেন। ‘এই লোকটা খুন করতে চেয়েছিল আমাদেরকে। ধরা যখন পড়েছে, আর ছাড়া উচিত হবে না। সেবা করার দরকার নেই। মরুক। ফেলে দাও পানিতে। কে আর দেখতে আসছে? ও যেমন শয়তান, তেমনি শাস্তি হওয়া উচিত ওর।’

আর চুপ থাকতে পারল না বব। ককিয়ে উঠল, ‘না, না, মারতে চাইনি! বিশ্বাস করো! তোমাদেরকে আমি মারতে চাইনি।’

‘জেল থেকে বেরোলেন কি করে?’ জিজ্ঞেস করল কিশোর।

‘ভাল আচরণের জন্যে প্যারোলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে আমাকে।’

‘আপনার ভাল আচরণ?’ মুখ বাঁকাল মুসা। ‘বিশ্বাস করতে বলেনন?’

‘কেন? আমি কি মানুষ নই? জেল যে একজন মানুষকে কিভাবে বদলে দেয় বুঝবে না,’ খাঁটি দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল বব। ‘জেলে অফুরন্ট সময়। ভাবনাচিন্তা করা যায়। নতুন মানুষ বানিয়ে দেয় মানুষকে। আমার বাবা ছিলেন পাত্রী। ছোটবেলায় ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন আমাকে। এতদিন সেটা কাজে লাগাইনি। জেলে গিয়ে আর কিছু করার ছিল না। বাইবেল আঁকড়ে ধরলাম। ঈশ্বরের কথা শোনাতে লাগলাম অন্য কয়েদীদেরকে। ঈশ্বরই আমাকে সাহায্য করেছেন জেল থেকে বেরিয়ে আসতে।’

‘এখানে এসেছেন কেন?’ প্রশ্ন করল কিশোর। ‘আমদের পিছু না নিলে?’

‘এমনি এসেছি। তোমাদের পিছু নেব কেন? তোমাদেরকে মাপ করে দিয়েছি আমি। একসময় এখানে বাস করে গেছি আমি। জেল থেকে বেরিয়েই আসার ইচ্ছেটা বড় হয়ে উঠল। এখন আর কারও ওপরই রাগ নেই আমার। একটাই কথা সব সময় বলি এখন-ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন।’

‘ইচ্ছে হলো, আর চলে এলেন?’ ববকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয় মুসা।

‘একসময় মুজ্জোর ব্যবসা করেছি আমি এই এলাকায়...’

‘নাকি স্মাগলিং করেছেন?’

‘তওবা, তওবা! কি যে বলো! অনেক বড় মুক্তির ব্যবসায়ী ছিলাম আমি। অস্ট্রেলিয়ার উপকূল আর নিউগিনি খুব ভালমতই চিনি। এখানকার জংলী লোকেরা ঈশ্বরের নাম শোনেনি। তাদের ভাল ভাল কথা শোনাতে এসেছি আমি। ডাকাত বব অ্যাঞ্জেলকে ভুলে যাও তোমরা। এখন আমি মিশনারি।’

‘তাই নাকি?’ ক্যাপ্টেনও বিশ্বাস করতে পারছেন না ববের কথা। খল চরিত্র জীবনে অনেক দেখেছেন তিনি। ‘ভাল ভাল কথা শোনাতে, নাকি আমাদেরকে স্বর্গে পাঠাতে?’

তাঁর কথা যেন কানেই যায়নি ববের। কিশোরদের দিকে তাকিয়ে গো-গো করে বলল, ‘তোমরা এসেছ কি করে জানব আমি?’

‘জানাটা কোন ব্যাপার হলো নাকি?’ কিশোর বলল। ‘পত্রিকা দেখেছেন। বন্দরে খোঁজ নিলেই কোন জাহাজ কোথায় গেছে, জেনে ফেলা যায়। সব রেকর্ড করা থাকে। আপনার মত লোকের জন্যে জানাটা কিছুই না। আমাদের পিছু নিয়ে চলে এসেছেন এখানে। ছায়ার মত পেছনে পেছনে থেকেছেন। মুসার পিঠে আপনিই তীর মেরেছেন। ডাল ফেলে মারতে চেয়েছো আমাকে। নগোকে বিষ খাইয়েছেন।’

নিরীহ কঠে বলল বব, ‘এসব কথা ভাবছ কি করে তাই বুঝতে পারছি না। এতটা ছোটলোক নই আমি। তা ছাড়া বললামই তো ভাল হয়ে গেছি। আমাকে দিয়ে আর ওসব খুন্টুন সন্তুষ্ট নয়।’

‘তাই নাকি?’ ব্যঙ্গ করে বলল মুসা। ‘এতটাই বদলে গেলেন?’

‘হ্যাঁ। অপরাধ এখন আমার জন্যে অতীত। বহু জেল খেটেছি সারা জীবনে। আর কত? জেল আর বাইবেল পুরোপুরি বদলে দিয়েছে আমাকে। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই বুঝি না আমি এখন। অহেতুক দোষারোপ করছ আমাকে। কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। দেশে ফিরে গিয়ে আমার নামে বদনাম করার চেষ্টা করলে তোমাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠুকে দেব আমি, মনে রেখো।’ শেষের বাক্যটা ভুক্তির সুরে বলল সে।

দরজায় দেখা দিল ডিয়া। ‘দেখো তো, এটা কি? হাঙরের পেট কেটে পেয়েছি।’ একটা ব্রীফকেস উঁচু করে ধরল সে। ‘চিনতে পারিনি। তাই নিয়ে এসেছি।’

‘দেখি, দাও,’ হাত বাড়াল বব। ‘ওটা আমার।’

‘নেয়ার জন্যে বেশি অস্ত্র মনে হয়!’ সন্দেহ ফুটল কিশোরের কঠে। ‘ব্যাপারটা কি? দেখা দরকার।’

প্রতিবাদের সুরে বব বলল, ‘দেখো, ওর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত জিনিস আছে। ওগুলো খোলার কোনও অধিকার নেই তোমার।’ বুকের ব্যথা অগ্রাহ্য করে উঠে বসে ব্রীফকেসটা নেয়ার চেষ্টা করল সে। ঠেলে আবার তাকে শুইয়ে দিল কিশোর। মরিয়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করল বব। পারল না।

মুসা আর বাউয়েন এসে ধরলেন। নড়তে দিলেন না ববকে।

শক্তিশালী লোক বব। এত সহজে হয়তো তাকে আটকানো যেত না। কিন্তু

হাতোনা কাঠে করে দিয়েছে তাকে ।

নামকেস্টা খুলল কিশোর । দেখার জন্যে কাত হয়ে এল রবিন । ভেতরে নামা শাতা ছাড়া আর কিছুই নেই ।

‘দেখশে তো?’ বব বলল । ‘তোমার কোনই কাজে লাগবে না । ওটা আমার গানগতি জিনিস । দেখি, দাও ।’

শাতাটা ধরল না কিশোর । ব্রীফকেস্টা আবার বন্ধ করতে যাচ্ছে, হাত নাড়ল নাপন, ‘দাঢ়াও দাঢ়াও, নোটবুকের মত লাগছে । ডায়ারিও হতে পারে । খুললে গান দেখেই দিই ।’

হ্যাঁ, ডায়ারিই । চকচক করে উঠল রবিনের চোখ । খুলে জোরে জোরে সনাইকে শুনিয়ে পড়তে শুরু করল:

‘মনে হয় আজকে পেয়েছি কালো হারামজাদাটাকে, মুসা আমান । পিস্তল ধাকলে ভাল হত, আরও শিংওর হতে পারতাম । তবে জংলীদের তীর-ধনুকও কম না, বিশেষ করে ওঝার কাছ থেকে যেটা নিয়েছি । একটা কমোডো ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই করছিল ব্যাটা, এই সময় সুযোগ বুঝে তীরটা মেরেছি । পিঠে বিঁধেছে পড়ে যেতে দেখলাম তাকে । হয়তো মরে গিয়েছে তখুনি, ঠিক বুঝতে পারিনি ।’

‘দারুণ তো,’ মুচকি হাসল রবিন । ‘তাহলে এই কাণ্ড ।’

আরেকটা পাতা পড়ল সে:

‘পালের গোদাটাকে খুন করার জন্যে চমৎকার একটা বুদ্ধি করেছি । ভারি একটা ডাল দিয়ে ফাঁদ পেতেছি । ওরকম ভারি ডাল মাথায় পড়লে আর বাঁচতে হবে না বাছাধনকে । লতা দিয়ে বানিয়েছি ট্রিগার । হাঁটার সময় পায়ে লাগলেই টান পড়বে, আর মাথায় পড়বে ডাল, ঘিলু বেরিয়ে যাবে...’

পরের পাতাটা ওল্টাল সে:

‘হলো না । কাজ হলো না । লতাটা নগোর পায়ে বেঁধে তার মাথায় পড়তে যাচ্ছিল ডালটা । ছেলেটা লাফ দিয়ে পড়ে তাকে সরিয়ে দিল । নিজেও বেঁচে গেল, মোড়লটাকেও বাঁচিয়ে দিল । কুছ পরোয়া নেই । যাবে কোথায়? আবার চেষ্টা করব । পরের বার খতম না করে ছাড়ব না । কালোটার কি হলো বুঝতে পারছি না । সেই যে জাহাজে নিয়ে গিয়ে তোলা হলো আৱ দেখা নেই । মরেই গেল? নাকি মরার মত হয়ে আছে, বেরোতে পারছে না কেবিন থেকে? নাকি রাতের বেলায় লাশটা ফেলে দেয়া হয়েছে জাহাজ থেকে? তা তো করার কথা নয় । ওরা মুসলমান । কবর দেয়ার কথা । কিন্তু নতুন কোনও কবর তো চোখে পড়ল না গায়ের আশপাশে । তবে কি লাশ রেখে দেয়া হয়েছে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে? না, তা-ও নয় । তাহলে বাকি দুটো এত শান্তিতে থাকতে পারত না । বাদুড় ধরতে যেতে পারত না ।’

আরও পাতা ওল্টাল রবিন । নগোর নাম লেখা রয়েছে যে পাতাটায় সেখানে এসে থামল । পড়তে লাগল:

‘আজকে একটা কাজের কাজ করেছি । আইল্যান্ডেন গায়ের মোড়লের নাম নগো । ওই ব্যাটাই বিছু ছেলেগুলোকে সামলে রেখেছে, আশ্রয় দিয়েছে । নইলে হয়তো এতদিনে শেষ করে ফেলত নরখাদকের দল । আমাকে আৱ কষ্ট করতে

হত না। যাই হোক, ওটাকে শেষ করার ব্যবস্থা করেছি। পা টিপে টিপে তুকে পড়লাম তার কুঁড়েতে। কাছাকাছি তখন কোনও লোক ছিল না। তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। এই জংলীগুলোর জন্ম বড় শক্ত। কিছুতেই মরতে চায় না। তবে অনেক বেশি মিশিয়েছি। দু'জন মানুষকে মেরে ফেলার জন্মে যথেষ্ট। এখনও কালো ছেলেটাকে দেখছি না। কি যে হলো তার বুরাতে পারছি না। জীবিত থাকলেও অবস্থা খুব খারাপ। কারণ একবারের জন্মেও কেবিন থেকে বেরোতে দেখিনি। তবে ক্যাপ্টেন বাউয়েনকে মাঝে মাঝেই দেখি। তাকেও শেষ করতে হবে। নইলে ফিরে গিয়ে সব বলে দেবে। পুলিস ধরে নিয়ে গিয়ে আবার গারদে ঢোকাবে আমাকে।

আরও কয়েক পাতা পর:

‘যাক, করে এসেছি কাজ। এবার আরাম করে বসে থাকতে পারি। নিরাপদ। ব্যবস্থা হয়ে গেছে আজ রাতে। আমার ওকা বন্ধু এক থলে গোখরা সাপের ডিম দিয়েছে আমাকে। চল্লিশটার কম হবে না। মারাত্মক বিষাক্ত সাপ। বাচ্চাগুলোও কম না। কামড়ালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মরে যায় মানুষ। থলের মুখ খুলে কেবিনের ভেতরে ছুঁড়ে দিয়েছি। দেয়ালে বাড়ি লেগে ডিমের খোসা ভাঙ্গার শব্দ শুনেছি। তার মানে বাচ্চা বেরোতে সময় লাগবে না। আর ছোট একটা কেবিনে চল্লিশটা মারাত্মক বাচ্চা কিলবিল করতে থাকলে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না। বিছু ছেলেগুলো। ক্যাপ্টেনটাও মরবে। আমি এখন মুক্ত। স্কুনারটা চালিয়ে নিয়ে চলে যাব থার্সডে আইল্যান্ডে। ছদ্মবেশ ধরব। নাম পাল্টে ফেলে আবার সেই পুরানো ব্যবসা শুরু করব। এখন আর ওসব করতে ভাল লাগে না। কিন্তু কি করব, বাঁচতে তো হবে।...’

ডায়ারি থেকে মুখ তুলল রবিন।

কিশোর বলল, ‘হলো না, বব, আপনার কোনও আশাই পূর্ণ হলো না। প্রমাণ চেয়েছিলেন না তখন। পাওয়া গেছে। একেবারে আপনার নিজের হাতে লেখা স্বীকারোক্তি। আশা করি কোন বিচারকই এটাকে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। আপনার কি মনে হয়?’

‘যা-ই হোক,’ ওটা আমার জিনিস। জোর করে ছিনিয়ে নেয়ার কোনও অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা পুলিস নও।’

‘তা নই। তবে পুলিসের হাতে যদি তুলে দিই খুশিই হবে ওরা। আপনার কাছ থেকে জোর করে নেয়ার জন্মে আর আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে না।’

‘এটা কেউটোর চেয়েও ভয়ঙ্কর,’ বাউয়েন বললেন। ‘কোথায় রাখি? বিগে ভরব?’

বিগ-হলো একধরনের খাঁচা; আগের দিনে কোন নাবিক কথা না শুনলে শাস্তি দেয়ার জন্মে তাকে ভরে রাখা হত তাতে। আজকাল আর বিগ নেই। বাউয়েনের স্কুনারেও নেই। বিগ বলতে জন্ম-জানোয়ারের খাঁচার কথা বলেছেন তিনি।

প্রতিবাদ করল না বব। জানে, করেও লাভ নেই। কেউ শুনবে না তার কথা। তবে জানোয়ারের পাশাপাশি খাঁচায় আটক থাকার কথা ভাবতে তেতো হয়ে গেল

মন।

‘বিগেই ঢোকাব,’ কিশোর ধণ্ডল। ‘এখন মোটাশে কো মানুষ আঁচাও না
অবস্থা হয়েছে। কিসে করল?’ ববকে জিজ্ঞেস করল বব।

চোখ জুলছে ববের। জবাব দিল না।

‘চিকিৎসা করবে নাকি?’ কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন কাশেন।

‘হ্যাঁ, করব।’

‘তুমি একটা বোকা। এরকম একটা জানোয়ারের চিকিৎসা করে শায় খাই,
ও না তোমাকে খুন্দ করতে চেয়েছিল?’

‘চেয়েছিল। ধরে নিলাম ও পাগলা কুকুর।’

‘কিন্তু পাগলা কুকুরকেও তো গুলি করে মারে মানুষ।’

জবাব দিল না কিশোর। ববের চিকিৎসার ব্যবস্থা করল।



সতেরো

বব কিছুটা সুস্থ হলে তাকে কেবিন থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ডেকের নিচে
জানোয়ারের খাচায় ভরা হলো। লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল সে,
‘আমাকে কি করবে?’

‘তোমার জন্যেই বিসর্বেনে যেতে হবে আমাদেরকে,’ কিশোর বলল।
‘পুলিসের হাতে তুলে দেব। তারপর আমাদের পথে আমরা চলে যাব।’

হেসে উঠল বব। ‘সবখানেই একটা না একটা ফাঁক থাকে, বুঝলে। আমি
বেরিয়ে যাবই। কিছুতেই ওই জেলে আরেকবার ঢোকাতে পারবে না আমাকে।’

‘কি করে পালাবেন, শুনি তো?’

‘এখনও জানি না। তবে উপায় একটা বেরিয়ে যাবেই।’

ববের কথাবার্তা শুনে অস্তির হয়ে উঠেছেন ক্যাপ্টেন বাউয়েন। অভিযোগের
সূরে কিশোরকে বললেন, ‘জাহাজ তো বোঝাই করে ফেললে জন্ম-জানোয়ার
দিয়ে। যা করেছ তাতে তিনটে সার্কাস চালানো যাবে। আর কত? বাড়ি রওনা হব
কবে?’

‘হয়ে গেছে,’ কিশোর বলল। ‘যা যা দরকার ছিল সবই ধরেছি। একটাই
জিনিস বাকি এখন। নরখাদকের খুলি।’

‘কোথায় পাবে? গাঁয়ে গিয়ে কয়েকটা মুও কেটে নিয়ে আসবে নাকি?’

‘না। ওই টামবারানেই অনেক আছে। ওখান থেকে নিলেই হবে।’

‘ওরা তোমাকে নিতে দেবে মনে করেছ? ভুলে যেও না, ওখানকার প্রতিটি
খুলিতে একটা করে প্রেত বাস করে। মরেনি কেউ। কেবল রূপ বদল করেছে।
বাস করছে এখন খুলির ভেতর। না দেয়ার সেটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ,
আদিবাসীরা বিশ্বাস করে, প্রেতকে বিরক্ত করলে বেরিয়ে। এসে ওদের মারাত্মক

ক্ষতি করতে পারে।'

'সবই জানি। নেয়াটা অত সহজ হবে না। তবু, নগোর সঙ্গে আলাপ করব।'

দুই সহকারীকে নিয়ে নেমে, গেল কিশোর। বিশাল কুঁড়েটার দিকে এগোল, যেটাতে শত শত বছরের পুরানো প্রেতও রয়েছে। দরজা খোলাই রয়েছে। ভেতরে চুকল দু'জনে। তাকে তাকে সাজানো রয়েছে অসংখ্য খুলি। কালো অক্ষিকোটিরগুলো যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে। যেন জেনে গেছে ওদেরকে সরানোর মতলব করছে কিশোররা। বেড়ার একধারে স্তূপ করে রাখা হয়েছে মানুষের হাড়।

'চুকলেই জানি কেমন লাগে!' শিউরে উঠল মুসা। 'জংলী যে জংলীই। নইলে এভাবে রেখে দেয় কেউ? এজন্যেই বলা হয় অসভ্য।'

'অথা গালাগাল করছো ওদের,' হেসে বলল কিশোর। 'ওরা তো শিক্ষণের আলোই পায়নি। ইংল্যান্ড আমেরিকার মত জায়গাতেও যদি আজও এসব কাণ্ড করে লোকে, তাহলে এদের আর দোষ কি।'

'আমেরিকায়?'

'কেন ওসোয়ারির কথা শোনোনি?'

'ওসোয়ারি?'

'মৃতের হাড়গোড় ভরা ভল্ট। আমেরিকাতেই আছে। আর ইংল্যান্ডের হাইথে একটা গির্জা আছে। ওটার মাটির নিচে ঘরে সাজানো রয়েছে মানুষের খুলি আর হাড়। পৃথিবীতে এত বড় সংগ্রহ আর কোথাও নেই। দু'হাজারের বেশি খুলি আছে, আর আট হাজারের বেশি উরুর হাড়। গির্জার পাশের গোরস্থানে যখন আর জায়গা থাকে না তখন মাটি খুঁড়ে হাড়গোর সব তুলে এনে জমা করা হয় ওই মাটির তলার ঘরে। নতুন কবর দেয়ার জন্যে জায়গা করে দেয়া হয়। শহরের প্রতিটি লোক বিশ্বাস করে, খুলিগুলোতে ভৃতের বাস। মার্বীরাতের পর গির্জার কাছে গেলেই নাকি দেখা যাবে মিছিল করে গির্জার চারপাশে ঘূরছে ভৃতেরা। আসলে, কিছু কিছু ব্যাপারে মানুষের মানসিকতা আজও সেই আদিমই রয়ে গেছে, তা সে শিক্ষিতই হোক কিংবা অশিক্ষিত।'

জীবিত একটা মানুষকে হেঁটে আসতে দেখে চমকে গেল মুসা। ঘরের ওই ভূতড়ে পরিবেশে আবছা আলোতে তার মনে হলো কোনও একটা মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠে এসেছে। তয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

হেসে উঠল কিশোর। 'ভয় পেয়েছ? ও তো নগো।'

আরও কাছে এল মোড়ল।

'নগো,' কিশোর বলল। 'তোমাকেই খুঁজছিলুম। কয়েকটা মানুষের খুলি দরকার ছিল আমাদের। ব্যবস্থা করা যায়?' ●

চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল নগো। তারপর ওদেরকে নিয়ে চলে এল টামবারানের আরেক প্রান্তে। একটা তাকে রয়েছে কয়েকটা খুলি, মানুষের মাথার চেয়ে দুই-তিনগুণ বড়।

'এন্ত বড়!' অবাক হয়ে বলল মুসা। 'দৈত্য ছিল নাকি?'

ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল খুলিগুলো কিশোর। 'এগুলো তো শয়োরের

খুলি। মানুষের চাইছি।'

মাথা নাড়ল নগো। বুঝিয়ে বলল, 'ওয়োরের খুলিই ভাল। এতে যে প্রেণ্ট, থাকে তারা ছোট, বেশি ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু মানুষের প্রেতের অনেক ক্ষমতা। খুব ক্ষতি করে দিতে পারে। জেনেওনে তোমাদেরকে ওই খুলি দিতে পারি না আমরা। তাহলে প্রেতেরা রেগে যাবে। বেরিয়ে এসে সর্বনাশ করে দেবে আমাদের। তোমাদেরকেও ছাড়বে না।'

'কিন্তু ওদেরকে অনেক আদর করে রাখব আমরা,' কিশোর বলল। 'হয়তো আমাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুশিই হবে ওরা। নতুন দেশ, নতুন জিনিস দেখতে পাবে। যা কখনও দেখেনি। ক্ষতি না করে আমাদের উপকারই করতে চাইবে তখন।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল নগো। 'তা মন্দ বলোনি। টামবারান থেকে কিছু মাথা সরিয়ে ফেলতে চাইছি এমনিতেও আমরা, ভয়ে পারছি না। বেশি হয়ে গেছে এখানে। আর জায়গাই নেই।' নতুনদেরকে রাখব কোথায়? নতুন দেশে যদি ভাল লাগে তাহলে হয়তো রাগবে না প্রেতেরা। তবে, আমাদের গাঁয়ের কাউকে দেয়া যাবে না। তাদেরকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে অসম্মান করতে পারব না আমরা। শত্রুদের কিছু খুলি হয়তো দেয়া যায়। একা কিছু করতে পারব না আমি। তোমরা দাঁড়াও। আমি চট করে গিয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

আধ ঘণ্টা পরে হাসিমুখে ফিরে এল সে। 'রাজি হয়েছে। এক শর্তে। নাচে অংশ নিতে হবে তোমাদের।'

'কিসের নাচ?' মুসা জানতে চাইল।

'প্রেতদেরকে শুভ বিদায় জানতে হবে। নাচের পর ভালমত খাওয়াতে হবে ওদের, যাতে তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার সুব্যবস্থা থিদেয় কষ্ট না পায়।'

নিতে দেয়া হবে জ্ঞানার পর পরই গিয়ে বাছতে আরম্ভ করল কিশোর। কোন খুলি নিলে ভাল হয়, দেখতে লাগল। তাকে সাহায্য করল রবিন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। সে এ সব জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করার সাহস পাচ্ছে না।

রবিন বলে উঠল হঠাৎ, 'কিশোর, দেখো দেখো, একটা দৈত্যের খুলি!'

খুলিটা তুলতে গেল রবিন। বেজায় ভারী।

'মানুষের তো না। কিসের খুলি?'

কাছে এসে আগ্রহ নিয়ে দেখল কিশোর। 'ঠিকই বলেছ, দৈত্যই। মানুষ নয়। প্রাগৈতিহাসিক হাতি। ম্যামথ কিংবা ম্যাসটোডন হবে। পেল কোথায় এরা! যদি দিয়ে দিত, ভাল হত। যে কোনও মিউজিয়ামকে দিলে লুফে নেবে।'

রবিন তো একা তুলতে পারলই না, কিশোর, মুসা আর নগো হাত লাগানোর পরেও পারল না।

'এত ভারী কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'পাথর আছে। একটা অংশ পাথরেরই বলা যায়।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা। 'জানোয়ারের হাড়ে পাথর থাকে কি করে?'

'হাড় নিরেট নয়। অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। মাটিতে পড়ে থাকলে

তাতে পানি ঢোকে। মাটির নিচে দিয়ে বয় সেই পানি, সেজন্যে তাতে মেশানো থাকে লোহা, চুন, কোয়ার্জ, ফ্রিন্ট, অ্যাগাট। এ সব আটকে যেতে থাকে হাড়ের ছিদ্রতে। ভারী হয়ে ওঠে। দীর্ঘ দিন মাটির নিচে পড়ে থাকতে থাকতে ফসিল পরিণত হয় হাড়। এটাও ফসিল। অ্যারিজোনার প্রেট্রিফাইভ ফরেস্টে গেলে ফসিল হয়ে যাওয়া গাছ দেখতে পাবে। কাঠ বলে আর কিছু নেই ওগুলোতে। সব পাথর হয়ে গেছে। হাড়ের মত এত ফাঁক নেই গাছের তেতরে। কাঠেরই যদি এই অবস্থা হয় হাড়ের কি হবে বুঝতেই পারছ।' নগোর দিকে ফিরে বলল, 'এটা কি আমাদের নিয়ে যেতে দেবে? মানুষের নয় যেহেতু, এর প্রেতটাও নিশ্চয় খুব ছোট।'

রাজি হয়ে গেল মোড়ল। এত বড় একটা জিনিস সরিয়ে ফেললে ভালই হয়। অনেক মানুষের খুলি রাখার জায়গা হয়ে যাবে। কয়েকজন লোককে ডেকে নিয়ে এল সে। সবাই মিলে ধরাধরি করে বের করল হাতির খুলিটা।

গাঁয়ের লোকের খুলিতে রঙ করা আছে। কিন্তু শক্রদের মাথাকে অতটা সম্মান দেখানোর প্রয়োজন মনে করে না এরা। তাই তাতে রং করেনি। সহজেই বোঝা যায় কোনটা শক্র আর কোনটা নিজেদের। কিশোর বুঝিয়ে বলল, তার দেশের লোকেরা নিউ গিনির লোকের রঙ করা জিনিস দেখতে পছন্দ করবে। রঙ করে দিতে অনুরোধ করল সে। গাঁয়ের আর্টিস্টকে ডেকে আনতে লোক পাঠাল নগো।

খুশি হয়েই কাজটা করতে বসল আর্টিস্ট। ঝকঝকে উজ্জুল রঙ দিয়ে রঙ করে দিতে লাগল।

আগ্রহের সঙ্গে তার কাজ দেখতে লাগল কিশোর মুসা। কারখানায় বানানো রঙ আসে না এই সুন্দর দুর্গম বুনো এলাকায়। সব কিছু নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয় আর্টিস্টকে। এক ধরনের গাছের ফুলের কুঁড়ি দিয়ে লাল রঙ তৈরি করেছে সে। সাদা রঙ পেয়েছে চুনাপাথর থেকে। হলদে রঙ এক ধরনের মাটি থেকে। কালো রঙ তৈরি করেছে কয়লার গুঁড়ের সঙ্গে এক ধরনের গাছের পাতার রস মিশিয়ে। তার সঙ্গে যুক্ত করেছে নিজের থুথু আর লালা। তুলি হলো ইমু পাখির পালক।

চমৎকার হলো রং। এত সুন্দর করে এঁকে দিল আর্টিস্ট, দেখে মনে হচ্ছে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে খুলিগুলো। নিউ গিনির যোদ্ধারা যে সাজে সেজে যুদ্ধে যায়, সে-রকম করে দিয়েছে। অফিকোর্টেরগুলোতে গোল নুড়ি চুকিয়ে দিয়েছে, ফলে লাগছে আসল চোখের মতই। ভয়ঙ্কর দেখতে। দেখেই শক্র পালাতে পথ পাবে না। উইডো স্পাইডার নামে এক ধরনের মারাত্মক বিষাক্ত মাকড়সা ধরে তার কৃৎসিত কালো পা ছিঁড়ে ছিঁড়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ভুরু তৈরি করে দেয়া হয়েছে।

এরপর নাচের পালা। শুভ বিদায় জানাতে হবে প্রেতকে। যারা যারা নাচবে তাদের সবাইকে চিত্রিত করে দেয়া হলো খুলিগুলোর মত করেই। মাথায় পরতে হলো বার্ড অভ প্যারাডাইজ পাখির উজ্জুল রঙের পালকের মুকুট। দুই তিন ফুট উঁচু। বিকট শব্দে বেজে উঠল ঢাক। নলখাগড়া দিয়ে তৈরি বাঁশি যেন ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল তীক্ষ্ণ সুরে। এক ধরনের গিটারও তৈরি করা হয়েছে। কুমিরের

শক্ত চামড়া কেটে তৈরি হয়েছে ওই বাদ্যযন্ত্রের তার। বিষণ্ণ টিয়াও টিয়াও আওয়াজ করতে লাগল ওগুলো। সেই সঙ্গে মিলিত হলো গানের নামে গলা ফাটানো বেসুরো চিৎকার। তাতে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হলো কিশোর, মুসা আর রবিনকে।

শুরু হলো নাচ।

কাণ্ড দেখে প্রোয়েন্দাদের মনে হলো, অত্যন্ত খুশি হয়েই এখান থেকে বিদায় নিতে চাইবে খুলির প্রেত; জীবনে আর এমুখো হওয়ার কথা ভাবতে চাইবে না।

নাচের পর খাবার পালা। আমেরিকা আর ইউরোপের নাম শুনেছে গাঁয়ের লোকে কিশোরদের মুখে। ওরা জানে ওসব 'গ্রাম' দেখতে কেমন। আরও একটা ব্যাপার বুঝে গেছে এতদিনে, ওখানকার মানুষেরা এতই 'দুর্বল', শীত থেকে বাঁচার জন্যে তাদেরকে কাপড় পরতে হয়। আর তা পরতে পরতে উজ্জ্বল বাদামীর পরিবর্তে তাদের রং হয়ে গেছে কেমন যেন ফ্যাকাসে, সাদাটে। ওরকম বাজে জায়গায় ভাল খাবার পাওয়ার কোনও বন্দোবস্ত হবে না, বুঝতেই পারছে গ্রামবাসীরা, না খেয়ে খেয়ে অভিশাপ দিতে থাকবে প্রেতেরা। আর যাই হোক, খাবার কষ্ট সহ্য করতে পারে না কেউ। কাজেই বিদায় দেয়ার আগে ভাল করে খাইয়ে তো দিতেই হবে তাদেরকে। নিয়ে আসা হলো বোৰা বোৰা খাবার। গোবরে পোকা, মাকড়সা, বিচ্ছু, বোলুতা, নানা রকমের শুঁয়াপোকা আর শামুকের স্তূপ এনে রেখে দেয়া হলো খুলিগুলোর সামনে। সময় দেয়া হলো, যাতে খাবারের আত্মাগুলোকে হজম করে ফেলতে পারে ওরা। মাংস খায় না প্রেতেরা, শুধুই আত্মা। অবশিষ্ট মাংসগুলো ফেলে দেয়ার কোনও মানে হয় না। সেরিয়ে এনে গোঘাসে গিলতে শুরু করল গ্রামবাসীরা।

নানা রকম ভান-ভণিতা করে অনেক কষ্টে সে-সব খাওয়ার জোর অনুরোধ ঠেকাল কিশোরুরা তিনজনে। মুখ ঘুরিয়ে রঞ্জিল আরেক দিকে।

খাওয়ার পরে নারকেলের ফুল থেকে তৈরি এক ধরনের মদ প্রচুর গিলল গ্রামবাসীরা। ঢুলুচুলু হয়ে এল চোখ। টলতে টলতে যার যার ঘরে ফিরে গেল ওরা। নগো, ডিয়া আর অল্ল কয়েকজন রয়ে গেল ওখানে। খুলিগুলোকে জাহাজে তুলতে সাহায্য করল ওরা। ওদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল দুই গোয়েন্দা। বলল সারাজীবন মনে থাকবে ওদের কথা।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজ ছাড়া হলো। নদীর যে পথ দিয়ে ঢুকেছিল সাইক্লন, সে-পথেই আবার বেরিয়ে যেতে লাগল সাগরের দিকে।

আঠারো

খাবার সময় হলো। চেঁচামেচি শুরু করল বুনো প্রাণীগুলো। ওগুলোকে খাবার দিতে গেল কিশোর আর মুসা।

খাঁচার দরজা খুলে ববকেও খাবার দিল কিশোর। তারপর দরজাটা আবার

ଖାପିଯେ ତାଳା ଆଟକେ ଦିଲ ।

‘ଏକେବାରେ ଜାନୋଯାରଟୁ ବାନିଯେ ଫେଲଲେ ଆମାକେ?’ ବବ ବଲଲ । ‘ସେ-ଭାବେଇ ଖାରାର ଦିଚ୍ଛ । ହାତ ଦିଯେ ଥେତେ-ହୟ । ଦୁ’ଏକଟା ଚାମଚ ଦିଲେଓ ତୋ ପାରୋ । ନାକି ତାରଓ ଯୋଗ୍ୟ ନଇ ଆମି?’

‘ଜାନୋଯାରେର ସଙ୍ଗେ ନିଜେକେ ମେଶାଲେ, ଜାନୋଯାରଗୁଲୋକେ ଅପ୍ରମାନ କରବେନ । ଠିକ ଆଛେ, ଦିଚ୍ଛ ଏନେ ଚାମଚ,’ କିଶୋର ବଲଲ ।

ଏକଟା କାଟା ଚାମଚ ଏନେ ଶିକେର ଫାଁକ ଦିଯେ ବାଡ଼ିଯେ ଦିଲ ସେ ।

‘ଆମାକେ ଜାନୋଯାର ବଲେଛ,’ ଶୁଯୋରେର ମତ ଘୋଁ-ଘୋଁ କରଲ ବବ । ‘ମନେ ଥାକବେ ଆମାର ।’

‘ନା, ଜାନୋଯାର ବଲିନି,’ ଶୁଧରେ ଦିଲ କିଶୋର । ‘ବଲେଛି ଓଗୁଲୋର ଚୟେ ଖାରାପ । ଆପନାର ଚୟେ ଅନେକ ଭାଲ ଓରା । ଓରା ସ୍ବ, ଆପନି ତା ନନ । ଓରା ଭାନ କରେ ନା-ଆପନାର ମତ, ଛନ୍ଦବେଶ ଧରାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା । ଆପନି ଏକଟା ନିଷ୍ଠାର ଖୁନୀ, ଅର୍ଥଚ ଭାନ କରଛେନ ମିଶନାରିର । ଖାବାର ପ୍ରୋଜନ ନା ଥାକଲେ କାଉକେ ମାରେ ନା ଓରା ; କିନ୍ତୁ ଆପନି? ଖୁନ କରେନ ଆନନ୍ଦ ପାଓଯାର ଜନ୍ୟେ । ଓଦେରକେଇ ଖାଚାଯ ଆଟକେ ରାଖତେ କଷ୍ଟ ହଚେ ଆମାର । ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ହଚେ ନା ।’

‘ଇଚ୍ଛେ କରଲେ ଯେ ଏଥାନ ଥେକେ ବେରିଯେ ଯେତେ ପାରି ଭେବେଛ ଏକବାରଓ? ତଥନ ତୋମାଦେର କି ଅବଶ୍ୟା କରତେ ପାରି, ଏ ସବ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାର ବଦଲା ନିତେ ପାରି, ଭେବେ ଦେବେଇଁ?’

‘ତା ଆର ପାରବେନ ବଲେ ମନେ ହୟ ନା । ଆର ଯଦି ପାରେନଇ, ତାତେ ଭାଲଟା କି ହବେ ଶୁଣି? ତୀର ଏଥାନ ଥେକେ ଦଶ ମାଇଲ ଦୂରେ । କୋଥାଯ ରଯେଛି ଜାନେନ? ଯେଥାନ ଥେକେ ମାଇକେଲ ରକଫେଲାର ଡିଙ୍ଗ ଥେକେ ନେମେ ସାତରାନୋ ଶୁରୁ କରେଛିଲ । ତୀରେ ପୌଛତେ ପାରେନି ସେ । କେବ ପାରେନି କେଉ ବଲତେ ପାରେ ନା । କୁମିରେ ଥେଯେ ଫେଲେଛେ ହୟତୋ । ଆପନି କତଟା ଭାଲ ସାତାର ଜାନି ନା । ତବେ ପାଲାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରବେନ ନା । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାରା ପଢ଼ବେନ ।’

‘ପରାମର୍ଶେର ଜନ୍ୟେ ଧନ୍ୟବାଦ । କିନ୍ତୁ ମାଇକେଲଟା ଛିଲ ଏକଟା ଗାଧା । ଆମି ଓର ମତ ବୋକା ନଇ । ଜାନୋ, ଅସ୍ଟ୍ରେଲିୟାର ଓଇ ଜେଲ ଥେକେ ଏକମାତ୍ର ଆମିଇ ପାଲାତେ ପେରେଛି । ତାର ମାନେ ଅନ୍ୟଗୁଲୋର ଚୟେ ଆମାର ବୁଦ୍ଧି ବେଶି । ନଇଲେ ଏକ ଡଜନ ବନ୍ଦୁକଧାରୀ ଗାର୍ଡର ଚୋଥେର ସାମନେ ଦିଯେ ବେରିଯେ ଚଲେ ଏଲାମ, କିଛୁଇ କରଲ ନା ଓରା । ଆର ତୁମି ହାନ୍ଦାରାମ ଭାବଚ ସାମନ୍ୟ ଏକଟା ଖାଚାଯ ଭରେ ଆଟିକେ ରାଖତେ ପାରବେ ଆମାକେ । ଦ୍ଵାଦଶ, ଆବାର ପାଲାବ ଆମି । ତୋମାଦେର ତିନଜନକେ ଶେଷ ନା କର୍ଣ୍ଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମାର ଶୀତି ନେଇ ।’

‘ସଥନ କରତେ ପାରବେନ ତଥନ ବିଶ୍ୱାସ କରବ ।’

କେବିନେ ଫିରେ ଏଲ କିଶୋର । ମୁସା ଆର ରବିନ ଶୁମିଯେ ପଡ଼େଛେ ।

ଜାହାଜ ଚାଲାତେ ଚାଲାତେ ତୋରେର ଦିକେ ଝାଙ୍କି ହୟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନେରେ ଏକଟୁ ତନ୍ଦ୍ରାମତ ଏସେଛିଲ । ଛୁଟେ ଗେଲ ଧୋୟାର ଗଞ୍ଜେ । ଚୋଥ ମେଲେ ଦେଖଲେନ ଆଣ୍ଟି ଲେଗେଛେ ଜାହାଜେ । ପ୍ରଚ୍ଛ ଚେଚାମେଚି ଶୁରୁ କରେଛେ ଜାନୋଯାରଗୁଲୋ ।

କିଶୋରରାଓ ଜେଗେ ଗେଛେ । ତାଡାତାଡ଼ି କମ୍ବଲ ସରିଯେ ଛୁଟଲ୍ କି ହୟେଛେ ଦେଖାର ଜନ୍ୟେ ।

‘...নোনা ১০৮ থেকে উঠছে ধোয়ার কুণ্ডলী। ফোরপিকে আগুন জুলছে। রাতে
নাশ্বান ছিল না বলে প্রধান পালটা নামিয়ে রাখা হয়েছিল। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি খাচার কাছে ছুটে গেল কিশোর। বব যেটাতে ছিল ওটার দরজা
শোলা। দরজার কাছেই পড়ে রয়েছে একটা কাঁটাচামচ। ইচ্ছে করেই ফেলে রেখে
১০৮ সে, যেন ওদেরকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই। ওই চামচ দিয়েই তালা খুলে
পালয়েছে বব।

পালটা তো শেষই। ওটাকে আর বাঁচানোর চেষ্টা করল না ওরা। বালতি
গার্ভাত পানি তুলে এনে ঢালতে শুরু করল আশপাশে আর নিচে যেখানে আগুন
লেগেছে সে-সব জায়গায়। কিন্তু কমার লক্ষণ নেই, আরও যেন বাড়েই আগুন।

থামল না ওরা। চেষ্টা চালিয়েই গেল।

কিশোর বলল, ‘জলদি ওর খৌজ করা দরকার। সাঁতরে তীরে যাওয়ার চেষ্টা
করছে নিশ্চয়। কুমিরের খাবার হয়ে যাবে।’

‘মরুকগে না,’ ক্যাপ্টেন বললেন। ‘খাক কুমিরে। ওকে নিয়ে এত ভাবছ
কেন?’

‘জেনেশনে তা করতে পারি না। হাজার হোক, মানুষ তো। আপনারা দু’জন
আগুন নেভান। আমি ডিঙ্গিটা নিয়ে যাচ্ছি।’

ছুটল সে। কিন্তু ডিঙ্গিটা যেখানে রাখা ছিল সেখানে নেই। ‘হায় হায়, ডিঙ্গি
শ্বে নিয়ে চলে গেছে! অবস্থা তো এখন আমাদেরই খারাপ হয়ে গেল দেখছি।
আগুন নেভানে না পারলে নৌকা নিয়ে যে ভেসে পড়ব তারও উপায় রইল না!
মেরে তো রেখে গেল আমাদেরকেই! তার প্রতিজ্ঞা সে রেখেছে।’

আর কিছু করার নেই। আবার আগুন নেভানোয় মন দিল চারজনে। প্রাণপণে
চেষ্টা করতে লাগল। কাঠ পোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। সে-সব শৌকারও যেন
সময় নেই। পার্নি ছিটিয়ে চলেছে ওরা। অবশেষে পরাজিত হতে আরম্ভ করল
আগুন।

ঠিকই বলেছে বব। আসলেই সে চালাক। বুদ্ধি আছে মাথায়। পালিয়ে গেল
শেষ পর্যন্ত। তার প্রতিজ্ঞা সে রেখেছে।

ক্যাপ্টেনের কাছে এসে বলল কিশোর, ‘জাহাজ নিয়ে খুঁজব নাকি?’

‘কি দরকার?’ রেগেই গেলেন ক্যাপ্টেন। ‘তোমার জন্যেই এ রুকম হলো।
তখনি বলেছিলাম, দাও পানিতে ফেলে। মরুক। না, সেবায়তু করে বাঁচালে।
এখন আরেকটু হলে আমরাই মরেছিলাম। পালটাও শেষ করে দিয়ে গেল।’

‘ইঞ্জিনটা তো আছে,’ গলায় জোর নেই কিশোরের। আসলেই আছে কিনা,
না সেটাও নষ্ট করে দিয়ে গেছে জানে না। তাড়াতাড়ি দৌড় দিল। চলে এল
ইঞ্জিন রুমে। স্টার্ট দিতে পিয়ে লক্ষ করল, ওটাকেও খারাপ করার চেষ্টা করেছিল
বব, কিন্তু ততটা সময় পায়নি। তবু যা করেছে, সেটুকু মেরামত করতেই দেড়
দণ্টা ব্যয় হয়ে গেল।

পালের ওপর ভরসা করেই চলে এসব কুনার জাতের জাহাজ। স্টো শেষ।
ঠিকনের জোরে সুবিধে হয় না তেমন। ধুকতে ধুকতে চলল। একটাই ভরসা,
দামবে না, কোনমতে পৌছে যেতে পারবে কোনও বন্দরে। সেখান থেকে পাল

জোগাড় করে নিলেই ঠিকমত চলা যাবে আবার।

জাহাজ চলছে। সামনের অবারিত জলরাশির দিকে তাকিয়ে এক মণ॥
বিড়বিড় করল কিশোর, 'মরবে ও। ওই ডিঙি নিয়ে আর কদূর। ঝঙ্গশের দিকে
গেলে ধরবে নরখাদকেরা, আর অস্ট্রেলিয়ার দিকে গেলে পুলিস। বাঁচতে পারবে
না।'

'ওর জন্যে কষ্ট হচ্ছে মনে হয় তোমার?' ক্যাপ্টেন জিঞ্জেস করলেন।

'তা কিছুটা যে হচ্ছে না তা নয়,' স্বীকার করল কিশোর।

'আশ্চর্য ছেলে তো! বার বার মেরে ফেলতে চাইল যে লোক তার জন্যেও
কথাটা শেষ করলেন না বাউয়েন।

কিশোরও জবাব দিল না। তাকিয়ে রয়েছে পানির দিকে। ভাবছে, বেঁচে ॥॥
যায় বব অ্যাঞ্জেল, আবার দেখা হবে। প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না লোকটা।
আবার আসবে! আসবেই!